প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬০

প্রচ্ছদ : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

প্রকাশক : রিসার্চ ইণ্ডিয়া পাব্লিকেশনস্,
২৮ গিরিশচন্দ্র বসু রোড,
কলকাতা—৭০০০১৪—এর পক্ষে
শ্রীমতী দীপিকা ঘোষ

মুদ্রক : এশিয়ান প্রিন্টার্স,
পি-১২, সি. আই. টি. রোড,
স্কিম-৫২, কলকাতা-৭০০০১৪—এর পক্ষে
শ্রীসলিল বসু

বাঁধাই : বর্মন বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১ কালিদাস সিংহ লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

বটুক-বিজ্ঞন-বিনয়ের কথা মনে করে
আজকের দিনের তরুণ সংস্কৃতিকর্মীদের উদ্দেশ্যে

সংকলন প্রসঙ্গে

গোড়ায় যে লেখাটির নামে এ-সংকলনের নামকরণ সেটি লেখা হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। তা'তে আলোচ্য গোটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই নয়, তবে তার মেজাজের কিছুটা হয়তো পরিচয় মিলবে—এই আশায় ঐ নামকরণ।

ঐ লেখাটি বাদ দিলে প্রথমার্ধের বাকি সব লেখাগুলি সাজানো হয়েছে অনেকটাই প্রকাশের কালানুক্রমিক ভাবে। ফলে আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের পূর্বা-পর বেশ কিছু তথ্য, আশা করি, তা'তে পাওয়া যাবে। তবে সে-কারণেই গোড়ার দিকের বেশ কিছু লেখায় স্বল্প তথ্যের ভিত্তির উপর ঢালাও সিদ্ধান্ত টানার ঝোঁকে, নির্বিচারে বিলিতি ছক ও বাঁধা বুলি ব্যবহারের এবং কিছুটা ফাঁকা বাগাড়ম্বরেরও পরিচয় পাওয়া যাবে। এমন কি কয়েকটি লেখায় (যেমন ৬৯-৭২ পৃষ্ঠার 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' প্রবন্ধে) তো যে মত প্রকাশিত হয়েছে তাকে আজ আমি ভ্রান্ত ও আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকারক মনে করি।

তবু সে লেখাগুলিকেও বানান ভুল শোধরানো ছাড়া আর কোন পরিবর্তন না করে শুধু প্রকাশের সাল তারিখ দিয়ে এখানে পুনঃপ্রকাশ করা হল এই আশায় যে তা'তে আন্দোলনের গোড়ার দিন থেকে জড়িত একজন সাধারণ কর্মী প্রাথমিক স্তরের যেসব ভুল ভ্রান্তি, ক্ষতিকারক ঝোঁক ও নৈরাশ্যের স্তরের ভিতর দিয়ে এগিয়েছে, তার দৃষ্টান্ত একালের কর্মীদের হয়তো কিছুটা সাহায্য করবে তাদের পথ হাতড়ানির সময়ে। দেখতে পাচ্ছি, সে পথ-হাতড়ানির কাল এখনোও অতিক্রান্ত হয়নি।

তবে এত ঠিক যে মার্কসবাদীর পথ চলার শেষ নেই। পথের একটা বড় বাঁকে পৌঁছে চূড়ান্ত অভ্রান্ততার দাবি নিশ্চয়ই মূঢ়তা। শুধু এই মুহূর্তে চড়াগলায় আসলে মানব প্রগতিতে অবিশ্বাস ও চরম নৈরাশ্য প্রচারের যে মারাত্মক ঝোঁক আমাদের আজ পেয়ে বসেছে তাকে অতিক্রম করে যাতে আমরা অবিচল প্রত্যয় নিয়ে নতুন দিনের, নতুন সমস্যার

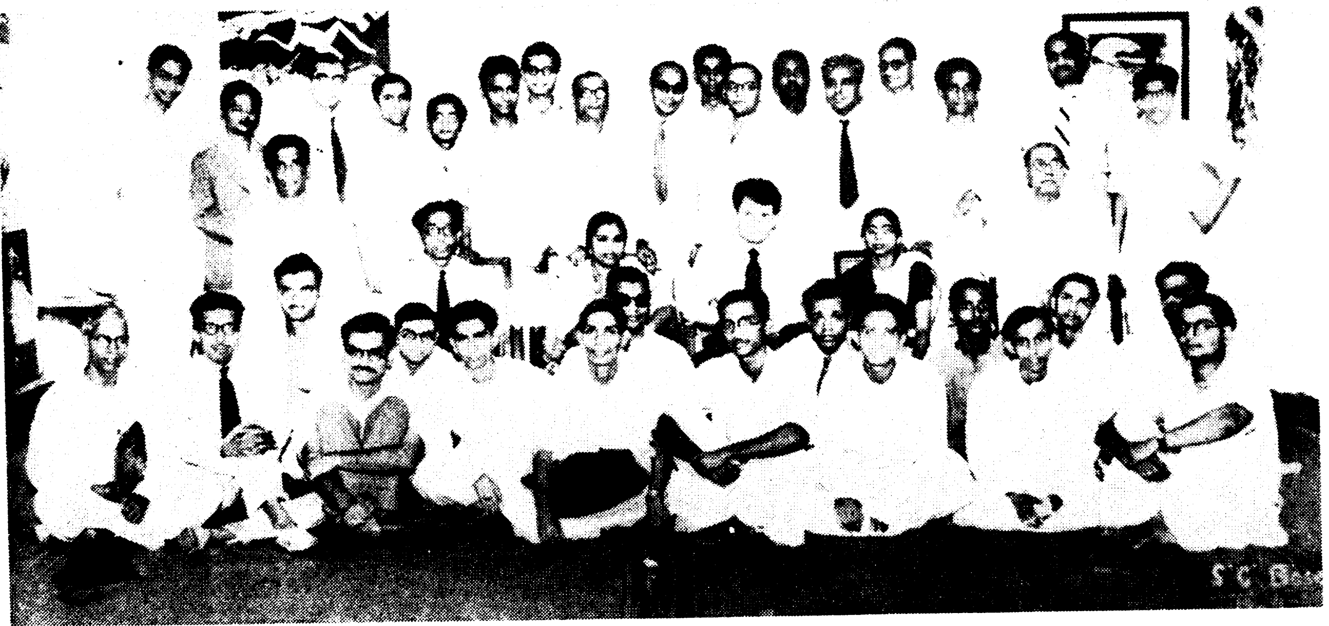
মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি, তারই জন্য এই প্রয়াস।

দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের আন্দোলনের যে-সব কুশীলবদের কথা পরের পর বলা হয়েছে তাঁদের তালিকায় জীবিতদের ধরা হয়নি। যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের মধ্যেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য নাম—সুশোভন সরকার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণ কুমার সান্যাল ও বিষ্ণু দে—বাদ দিতে হল। কারণ এত অল্প পরিসরে আমার পক্ষে এঁদের সম্পর্কে আলাদা করে কিছু লেখা সম্ভব নয়।

সূচী

১

২



চিত্র নং—১



চিত্র নং—২

চিত্র-পরিচিতি

চিত্র নং—১

পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে বাঁ থেকে ডাইনে ঃ বিষ্ণু দে, পঙ্কজ দাশগুপ্ত, অজিতনাথ রায়, জ্যোতি বসু, ডাঃ মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস, সত্যব্রত চ্যাটার্জী, সুমন সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য্যচৌধুরী, গিরীন্দ্র চক্রবর্তী, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, ভূপেশ গুপ্ত, ডাঃ বিমল উকিল, সজল রায়চৌধুরী

মাঝে, চেয়ারে ঃ অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, অণু গুপ্ত, গ্ল্যাডিশেভ, অলকা উকিল, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

মাটিতে বসে ঃ আবদুল্লাহ রসুল, ডাঃ সমর রায়চৌধুরী, ডাঃ নিরোদ বিজলী রায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, জলি কাউল, অরুণ মিত্র, গোপাল হালদার, (পিছনে) সাধন গুপ্ত, বিনয় রায়, (?), অনিলকুমার সিংহ, ডঃ মহাদেব প্রসাদ সাহা, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য, (পিছনে) ? চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, (পিছনে) ডাঃ জ্যোতির্ময় সাহা

চিত্র নং—২

৪৬ নং-এর ছাদে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের' কয়েকজন ঃ

বাঁ দিক থেকে ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী ঃ অমল ভট্টাচার্য্য, বিজন ভট্টাচার্য্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার গুপ্ত, (পিছনে) অনিল কুমার সিংহ, অরুণ মিত্র, (পিছনে) রবীন্দ্র মজুমদার, (সামনে) চিন্মোহন সেহানবীশ, শম্ভু মিত্র, বিনয় রায়, রণজিৎ দাশগুপ্ত

৪৬ নং

একটু সড়গড় হতে না হতেই অন্তরঙ্গ ডাক শোনা যায়—'আসছেনতো আজ ছেচল্লিশে ?......বাবু আসবেন আলাপ জমাতে।'

ছেচল্লিশ'' অর্থাৎ ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের চারতলায় ছোটবড় গুটিচারেক ঘর। 'আন্তর্জাতিকের' পাঠক ও শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে কৌতূহলীরা জানেন ঐ পত্রিকার তথা 'আন্তর্জাতিক' যার মুখপত্র সেই পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের ঠিকানা ওটি। আবার নাট্যামোদীমহলে এর পরিচয় গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয়, পশ্চিমবঙ্গ ও কলিকাতা শাখার দপ্তর হিসেবেই। সদস্যেরা নিতান্ত সুজন বলেই বোধ করি ছেচল্লিশের তেঁতুলপাতায় ঠাসাঠাসি ঠাঁই মিলেছে এতগুলি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের।

কিন্তু এতো হল নেহাৎই হালের, বড় জোর গত বছর পাঁচ ছয়ের কথা। আসলে ষোলো সতেরো বছর ধরে (অবশ্য তা'ও নিশ্চয়ই খুব একটা দীর্ঘকাল নয়) ৪৬নং এমন সব ভাবনা ও প্রয়াসের আধার হিসেবে সক্রিয় যার অন্তত কিছুটা ছাপ পড়েছে সমকালীন বাঙালী মনের উপরে—আমার বিশ্বাস এ দাবি মোটেই অসঙ্গত নয়। যাঁরা এ ধরনের প্রভাবের ক্ষেত্রে তত্ত্বতল্লাসী চালান তাঁদের পক্ষে এ প্রসঙ্গের যথাযথ বিচার তাই অপরিহার্য।

আমি কিন্তু এখানে ৪৬নং-এর ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচনার বা তার সার্থকতা যাচাই-এর চেষ্টা করব না। মোটের উপর কি ভাবনা বা কোন্ ধরনের প্রয়াসের আলোড়নে ৪৬নং চঞ্চল হয়েছে এবং সে চাঞ্চল্য কতকটা সঞ্চারিত করেছে অন্তরঙ্গ মহলের বাইরেও, তার সামান্য হদিশই হয়ত মিলবে এ লেখায়। তবে এখানে যেসব সহৃদয়, বুদ্ধিদীপ্ত ও সম্ভাবনাময় আলোচনা বা বিতর্কের আসর জমেছে, যে কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছে এবং তারই সূত্র ধরে ৪৬নং-এ দেশ-বিদেশের যে সব জ্ঞানীগুণীদের আনাগোনা ঘটেছে, তারই কিছুটা বৃত্তান্ত বলার চেষ্টা করব ঢিলেঢালাভাবে। তাতে কালানুক্রম হয়ত কিছুটা ব্যাহত হবে

কিন্তু কাহিনীর সূত্রে ছেদ পড়বে না অসঙ্গতভাবে। আর একটি কথা। ৪৬নং-এর যে সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলাম তাদের প্রতি যদি পক্ষপাত কিছুটা ঘটে তবে সেটা স্বাভাবিক বলেই মার্জনীয় হবে আশা করি।

বৃত্তান্ত শুরু করা যেতে পারে **Y. C. I.** বা 'ইয়ুথস্ কালচারাল ইনষ্টিটিউট' -এর কাহিনী দিয়ে। ১৯৪১ সনের গোড়ার দিকে মিশন রো থেকে উঠে এসে এঁরা আস্তানা গাড়েন ৪৬নং-এ—চারতলায় নয় দোতালার একটি লম্বাধরনের ঘরে।

নামেই প্রকাশ **Y. C. I.** ছিল তরুণদের সংস্কৃতি সংঘ। কিন্তু ওটি নিছক নাচগানের আড্ডা মাত্র ছিল না যদিও নাচগান যথেষ্টই ছিল, আর আড্ডাতো ছিলই প্রচুর মাত্রায়। তার কারণ সময়টা ছিল মহাযুদ্ধের তান্ডবে যখন পৃথিবী তোলপাড় আর উদ্যোক্তারা তরুণ হলেও যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিভীষিকা এবং ঐ দুই-এর নাড়ির যোগ সম্পর্কে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল ছিলেন অথচ ঐ সব ভয়াবহতা সত্ত্বেও তাঁরা মানবপ্রগতির সম্ভাবনায় আস্থা হারাননি। তাই **Y. C. I.**-এর কাজকর্মের ভিতর দিয়ে মানবিক দৃষ্টি সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও সতেজ রাখার জন্য তাঁরা তৎপর ছিলেন বরাবরই। সদস্যেরা অনেকেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র বলে মোটের উপরে ছাত্রমহলেই এঁদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল এবং সমস্ত কাজকর্মই চলত বেশ একটা ছাত্রশোভন আনন্দ ও ফূর্তির আবহাওয়ায়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বেশ কিছু কৃতি ছাত্র থাকায় তাঁদের মারফৎ প্রগতিশীল ভাবধারা সাধারণ ছাত্রসমাজ ও তরুণমহলেও চারিয়ে যেত অনেকখানি।

Y. C. I.-এর একটি কাজ ছিল পণ্ডিতদের দিয়ে নানা বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (দুর্ভাগ্য-ক্রমে কিছুদিনের মধ্যেই অকালমৃত্যু এঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়), বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডঃ ফ্রেডরিক লেভি, অধ্যাপক সুশোভন সরকার, অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু (এঁর নৃতত্ত্ববিষয়ক চমৎকার বক্তৃতার প্রসঙ্গ ছিল **'Human Geography'**), অধ্যাপক শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দি, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও আরো অনেকে। বিতর্ক সভাগুলিও বিশেষ-ভাবেই জমে উঠত। কারণ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার ভট্টাচার্য, জন কেলাস, হুমায়ুন কবীর, নির্মলকুমার বসু, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকেরা এতে যোগ দিতেন সোৎসাহে। 'সংস্কৃতি সংকট' বিষয়ে যে পোষ্টার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় মহাবোধি সোসাইটি হলে, সেটিও দৃষ্টিভঙ্গী

ও বক্তব্যের নতুনত্বের দরুণ বেশ সাড়া জাগায় দর্শকদের মধ্যে। সত্যজিৎ রায় খুব চমৎকার কয়েকটি পোস্টার এঁকেছিলেন মনে পড়ে।

Y.C.I-এর সাহিত্যসভাগুলিও বেশ সরগরম হয়ে উঠত। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, সুবোধ ঘোষ (এঁর ফসিল গল্পটি 'অঞ্জনগড়' নাম দিয়ে **Y.C.I.** অভিনয়ও করে ওভারটুন হলে), হিরণকুমার সান্যাল, বিনয় ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতি এতে যোগ দিতেন উৎসাহভরে কিন্তু মুখ্যত আলোচনা চালাতেন তরুণ সদস্যরাই। ২২শে শ্রাবণের (১৩৪৮) অল্পদিন পরেই যে স্মৃতিসভার আয়োজন হয়, মনে পড়ছে তাতে রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করেন ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, অমল হোম ও ডঃ রাম অধিকারী। আর একটি আসরে বিখ্যাত ওলন্দাজ সঙ্গীতজ্ঞ এবং রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডঃ বাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনান। নির্ভুল সুরে অথচ ঘোর বিদেশী উচ্চারণে সেই সঙ্গীত পরিবেশন আমার কাণে অদ্ভুত ঠেকেছিল কিছুটা। এছাড়া হিরণকুমার সান্যালের **'Eating Places of Calcutta'**-বিষয়ক অতি চিত্তাকর্ষক আলোচনার কথা মনে পড়লে রসনা রসসিক্ত হয়ে ওঠে এতদিন পরেও। ও ব্যাপারে সান্যাল মহাশয়ের বিশেষজ্ঞতার দাবি সর্বজনস্বীকৃত। তাই বেশি কিছু আর বলার নেই। তবে অত্যন্ত উপাদেয় বিষয়টাকে আরো প্রাঞ্জল করার জন্য সেদিন তিনি তাঁর বক্তব্য বাস্তবপন্থায় **illustrate** করার যে প্রস্তাব করেছিলেন, আমরা তা রাখতে পারিনি মনে পড়ছে। এখানেই আর একটি আসরে বিখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী শম্ভু সাহা তাঁর তোলা 'শান্তিনিকেতনে গান্ধীজী' ফিল্মটি দেখিয়ে আমাদের মনোরঞ্জন করেন। সবশেষে মনে পড়ছে **Y. C. I.**এর একটি অভিনয় উৎসবের শেষে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস ভাষণ প্রসঙ্গে কিভাবে অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে **prompter**-কেও তাঁর কর্তব্য একটু অতিরিক্ত উৎসাহভরে করার জন্য (দর্শকেরা সবই শুনতে পারছিলেন) তারিফ করেছিলেন প্রাণখুলে।

একটি ব্যাপার এসব থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—**Y. C. I.**এর উদ্যোক্তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও বিষয় বা বক্তা নির্বাচনে তাঁরা কোন গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেননি কোনদিন। এমন একটি প্রগতিশীল ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কি আজ ফুরিয়ে গেছে একেবারে?

৪৬নং এর বৃত্তান্তের সঙ্গে **Y. C. I.** কাহিনীর যোগ কিছুটা আলগা। আজ যাঁরা ছেচল্লিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তাঁদের মধ্যে অনেকে হয়ত **Y. C. I.**এর নামই

জানেন না। ৪৬ নং বলতে আজকে লোকে যা বোঝে তার কাহিনী শুরু হয় আরো কয়েক মাস পরে। ঐ বছরের ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলার বাহিনীর তড়িৎ অভিযান ও তার প্রায় ছ'মাস পরে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাপানীদের অতর্কিত আক্রমণ দুনিয়ার ঘোরালো অবস্থাকে জটিলতর করে তোলে। ফ্যাসিজমের বিশ্বজয়ের সম্ভাবনায় এবং পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশের বিপর্যয়ের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন অধিকাংশ মানুষ। সে উদ্বেগ যে ভারতবর্ষের তথা সমস্ত পরাধীন দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সুবিধা অসুবিধা বিচারের নিরিখেই তা বলাই বাহুল্য। তবু দেশের বুকে বৃটিশ আধিপত্যের নিদারুণ জগদ্দল পাষাণ চেপে থাকায় আমাদের দেশবাসীর আশ্চর্য সুস্থ অনাবিল জাতীয় চেতনাও যে সেদিন পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালায় দিগভ্রান্ত হয়েছিল অনেকখানি, এমন কি ফ্যাসিজমের বিপদকে ছোট করে দেখার ঝোঁকও যে দেখা গিয়েছিল কিছুটা—একথা অস্বীকার করার জো নেই। সেই জটিল পরিস্থিতিতে বিভ্রান্তি অপসারণ ও সুস্থ জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় প্রথমে (১৯৪১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে) 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' ও পরে (১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ) 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ' (মাঝে অনেকদিন পর্যন্ত 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ' ও ১৯৪৫-এর পরে সর্বভারতীয় সংঘের সঙ্গে মিলিয়ে এরই নতুন নামকরণ হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ')—এই দুটি প্রতিষ্ঠান। এদের দপ্তর স্থাপিত হল ৪৬ নং-এর চারতলার সুপরিচিত ঘরগুলিতে—আজ যেখানে 'অন্তর্জাতিক', শান্তিসংসদ ও গণনাট্য সংঘের অফিস চালু রয়েছে। ৪৬নং-এর ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের ঐখানেই শুরু।

গোড়াতেই সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির কথা বলি। সোভিয়েত সভ্যতা, তার আদর্শ ও কর্মকান্ডের সঙ্গে বাঙলা দেশের মানুষের তখনও পর্যন্ত পরিচয় ছিল যৎসামান্য। **Sea Customs** আইনের সতর্ক প্রহরা পেরিয়ে আসল খবর খুব অল্পই পেঁছিত এ-দেশে। সাধারণ পাঠকের উপযোগী মালমশলার একান্ত অভাব ছিল। সরকারী বিধিনিষেধের বেড়াজাল এড়িয়ে যে দু'চারটি বই বা পুস্তিকা এ-দেশে প্রকাশিত হত তাতে খবর থাকত সামান্যই—হাজারো বিকৃতি ও কুৎসার তোড়ে তারা ভেসে যেত অনেকখানি। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠিতে'ই বোধ হয় সাধারণ বাঙালি সর্বপ্রথম সোভিয়েত সভ্যতার একটি দরদী ছবি দেখলেন আর তারও প্রায় এক দশক পরে হাতে এল সুরেন ঠাকুরের 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ'।

একে এই বিপুল অপরিচয় তার উপর তখনকার যথেষ্ট বিরূপ আবহাওয়ার মুখে সেদিন 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' বাঙলা দেশের মানুষের কাছে সোভিয়েতের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার পণ নিয়ে কাজে নামে। এই কাজের গুরুত্বের অনুপাতে ঠিক কতটা সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছিল সেদিন তার নির্ভুল হিসেব কষা আমার সাধ্য নয়। তবু অসংশয়ে এটা বলতে পারি যে ছোটখাটো ঘরোয়া বৈঠক থেকে শুরু করে বড় বড় জনসভায় সোভিয়েত প্রসঙ্গের অবতারণা, গ্রন্থপুস্তিকা, নানারকম সংকলন ও পত্রিকাদি প্রকাশ, সোভিয়েত জীবন বিষয়ক পোস্টার বা ফিল্ম প্রদর্শনী প্রভৃতির মারফৎ সমিতি সেদিন যে নির্ভীক পথিকৃতের কাজ চালায় আজ ভারতব্যাপী 'হিন্দী-রুশী ভাই ভাই' এবং ভারত ও সোভিয়েতের মধ্যে অনবরত প্রতিনিধি চলাচলের যুগে সে কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণীয়। বলা বাহুল্য এ কাজের প্রয়োজন মোটেই ফুরোয়নি। আনন্দের কথা 'ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সংঘের' প্রশস্ততর পরিসরে অতি প্রয়োজনীয় এই কাজের ধারাটি অব্যাহত রয়েছে।

সেদিনকার জটিল অবস্থাতেও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি সমাজের বিভিন্ন স্তরে বেশ কিছুটা দাগ কাটতে পেরেছিল তার কারণ একদিকে ভারতবাসীর গভীর গণতান্ত্রিক চেতনা ও অন্যদিকে কিছু মহাপ্রাণ নেতা ও কর্মীর অশ্রান্ত, আন্তরিক প্রচেষ্টা। এঁদের মধ্যে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রথমেই স্মরণ করি ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়দের নাম। মনোরঞ্জনবাবুর কথা গণনাট্য প্রসঙ্গেই বিশেষ করে বলব। শুধু এই সূত্রে তাঁর অকৃত্রিম সোভিয়েত সৌহার্দের প্রতি আর একবার শ্রদ্ধা জানিয়ে এই কথাটি বলে রাখি যে তাঁকে হারিয়ে সোভিয়েত সুহৃদ আন্দোলন তার গোড়ার যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নেতার নায়কতা ও সুপরামর্শ লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ক'দিন আগে কাগজে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ৭৯তম জন্মদিন পালনের খবর দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেল পনেরো বছর আগের একটি সন্ধ্যার কথা। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি তার প্রিয় নেতার ঘোর প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সেদিন আয়োজন করেছিল ডঃ দত্তের ৬৪-তম জন্মদিন উদ্যাপনের। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সদস্যেরা ছাড়াও ঐ সভায় সাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন অধ্যাপক বিনয় সরকার এবং ডঃ দত্তের বহু স্বদেশী ও অগ্নিযুগের গুণমুগ্ধ সহকর্মীগণ—দেখতে দেখতে তাঁদের আলোচনার খেই ধরে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর এক পরিবেশে। নিবেদিতা, অরবিন্দ, ওকাকুরা, বিপিন পাল, রবি ঠাকুরের স্বদেশী গান আর তারই সঙ্গে সেকালের তরুণদের মন্ত্রগুপ্তি ও জীবনপণ লড়াইএর অমর কাহিনী আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সেই মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণদেরই কয়েকজনের টুকরো' টুকরো কথাবার্তায়। তবে সেই আলোচনার সময়ে তাঁরা আর তরুণ ছিলেন না—বার্ধক্যের সীমানায় ছিল তাঁদের অবস্থিতি।

আর স্বদেশী ও অগ্নিযুগের তাঁদেরই এক সহকর্মী, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বার্ধক্যের পিছুটান হেলায় উপেক্ষা করে তখন শুধু জনসভায় নয়, পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন ফ্যাসিজম-বিরোধী ও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির বাণী নিয়ে। জ্বলন্ত দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিকতা ও সোভিয়েত সৌহার্দ্যের পরম মিলন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর সেদিনকার তৎপরতায়।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের (আমাদের অনেকেরই প্রিয় 'সত্যেনদা') কথাও এ প্রসঙ্গে বিশেষ করেই মনে পড়ছে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে প্রভাবশালী মহলে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি দেশবন্ধুর সময় থেকেই। তিনি সেদিন ঐ প্রতিপত্তি হারাবার কিছুমাত্র চিন্তা না করে ঝাঁপ দিয়েছিলেন স্রোতের বিরুদ্ধে। তার জন্য তাঁকে শুধু যে অন্তঃসারশূন্য, নগণ্য মানুষের তুচ্ছ ও ইতর নিন্দাবাণী সহ্য করতে হয়েছিল তাই নয়, ক্ষুণ্ণ করতে হয়েছিল বহুদিনের একটানা রাজনৈতিক জীবন, এমনকি চরম ক্ষতিগ্রস্তও হতে হয়েছিল বৈষয়িক দিক দিয়ে। কিন্তু সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির আসরে তাঁকে দেখলে এই সংগ্রামের কথা বোঝা যেত না। মজলিসী হাস্য কৌতুকের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে সেখানে তিনি তাঁর অন্তরের গভীরতার দিকটি লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখবার জন্যই যেন সচেষ্ট থাকতেন সর্বদা। তবু মাঝে মাঝে তাঁর হৃদয়ের জ্বালা শানিত তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ মন্তব্যে ঝিলিক দিয়ে যেত অন্তরঙ্গদের সঙ্গে কথাবার্তায়। তাঁর মৃত্যুও সোভিয়েত মৈত্রী আন্দোলনের পক্ষে এক দুঃসহ ক্ষতি। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি সোভিয়েত দেশ দেখে এসে তাঁর মূল্যবান ও সরস বৃত্তান্তটি লিখে গেছেন তাঁর অবিচল সোভিয়েত সৌহার্দ্যের শেষ স্বাক্ষর হিসেবে।

আর যাঁকে বাদ দিয়ে সেদিনকার সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি বা ৪৬ নং-এর কথা কল্পনা করা যায় না তিনি হলেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি যে সমিতির সম্পাদক হিসেবে আন্দোলনের সাংগঠনিক কর্ণধার ছিলেন তাই

শুধু নয়। সমিতির জন্য তাঁকে সেদিন একাধারে বক্তা, সংগঠক, লেখক ও সাধারণ কর্মীর কাজ করতে হত অবিশ্রাম। লোকসভা বা জনসভার অসামান্য বক্তা অথবা চিন্তাশীল লেখক হিসেবেই আজ যাঁরা তাঁকে জানেন তাঁরা হয়ত ভাবতেই পারবেন না হীরেনবাবু সেদিন সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির (লেখক সংঘেরও—কারণ ঐ সংঘের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ঐ সময়ে) খুঁটিনাটি কাজেও কিভাবে হাত লাগাতেন সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে একযোগে। এমন কি গানের দলে ঘাটতি থাকলে তিনি মাঝে মাঝে গলাও মেলাতেন কোন জাতীয় সঙ্গীত বা 'ইন্টারন্যাশনাল' বা 'সোভিয়েতভূমি' অথবা আমাদেরই কারো লেখা অন্য কোন গণসঙ্গীতের সুরে! *

গানের কথায় মনে পড়ে গেল **Y. C. I.**এর শেষ পর্বে **Community Song** বা সমবেত সঙ্গীতের রেওয়াজ শুরু হয়েছিল ৪৬নংএ। তবে সাধারণত বালিগঞ্জে এক বন্ধুর বাড়ির ছাতে বন্ধুবর দেবব্রত (জর্জ) বিশ্বাসের পরিচালনায় তখন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের দেশাত্মবোধক গানই গাওয়া হত সকলে মিলে। একেবারে শেষের দিকে নিজেদের লেখা দু'একটি গান গাওয়াও শুরু হয়েছিল। কিন্তু সর্বসাধারণের সামনে, জনসভার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে স্বরচিত দেশাত্মবোধক ও ফ্যাসিস্টবিরোধী (তখনকার জটিল অবস্থায় ঐ দুই সমার্থক ছিল—এই ছিল উদ্যোক্তাদের ধারণা) গান গাওয়ার রেওয়াজ প্রবর্তন করে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি। ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলের একটি মস্ত জনসভার কথা বিশেষ করেই মনে পড়ছে। উপলক্ষ ঠিক মনে নেই—তবে সভাপতি ছিলেন বাঙলা সরকারের তখনকার অর্থসচিব শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বন্ধুবর বিনয় রায়ের বলিষ্ঠ ও সুরেলা কণ্ঠ এবং তাঁরই পরিচালনায় আরো দশ বারোটি গলা সেদিন আশ্চর্য উদ্দীপনা এনেছিল উপস্থিত সকলের মনে। বিনয় সেদিন সত্যই সুরের আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের প্রাণে।

সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে। শুধু জনসভায় নয়, শুরু হল পথেঘাটে, ট্রামেবাসে (আর তারও পরে পল্লী অঞ্চলের বাজার হাটেও) গান গাওয়ার পালা। সম্বল সুভাষের (কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়) 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ' ও

---

* 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গড়ার কাজে হীরেনবাবুর সঙ্গেই সর্বপ্রথম যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতি বসু, স্নেহাংশু আচার্য্য, ভূপেশ গুপ্ত, রাধারমণ মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি।

আরো দু'চারটি আমাদেরই কারও লেখা গান। সে গান অবশ্য সব সময়েই যে শোনার মত হত এমন নয়—কথা, সুর বা গাওয়ার উৎকর্ষ কোন দিক দিয়েই, তবে মার খেতে হয়নি কোনদিন এইটাই শুধু বলা চলে। আর বিনয় বা দেবব্রত বা জ্যোতিরিন্দ্র (কবি ও সুগায়ক বন্ধুবর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) থাকলে ব্যস্ত পথচারীরাও ভীড় করে আসতেন মনে পড়ে। পরে গান ও অভিনয়ের ভার প্রথমে 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক সংঘ, ও তারপর 'গণনাট্য সংঘে'র উপরে বর্তায়।

'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক সংঘে'র জন্ম ১৯৪২ সালে। এর আগেও অবশ্য 'ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘে'র একটি শাখা ছিল বাঙলা দেশে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতাতেই 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনে'র দ্বিতীয় অধিবেশন হয় সাড়ম্বরে। কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতার দরুণ ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠানটি নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল একেবারেই। যে ঘটনাটিকে উপলক্ষ করে তার পুনরুজ্জীবন ঘটল সেটি হচ্ছে দেশী ফ্যাসিস্ট ঘাতকদের হাতে ঢাকার তরুণ লেখক সোমেন চন্দের অপমৃত্যু (৮ই মার্চ, ১৯৪২)। ঐ মৃত্যু সেদিন গভীরভাবেই নাড়া দিয়েছিল বাঙালী লেখকদের। ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ ২৮শে মার্চ তারিখে যে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল তাতে যোগ দিলেন বহু বাঙালি লেখক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন আর যাঁরা এতে যোগ দেন তার মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী, আবু সঈদ আইয়ুব প্রভৃতির নাম মনে পড়ছে। আর গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল প্রভৃতি যাঁরা এর আগের থেকেই প্রগতি লেখক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁরাতো ছিলেনই সম্মেলনে। এই সম্মেলন থেকেই জন্ম হল 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের।'

লেখক সংঘের কথায় অনেক স্মৃতি ভীড় করে আসে মনের আগল ঠেলে। তাই রাশ না টেনে উপায় নেই। তবু কয়েকটি প্রসঙ্গ কিছুটা এলোমেলো ভাবেই বলব, মনের মনিকোঠায় আজও যা জ্বলজ্বল করছে অনির্বাণ।'

মনে আসে সাহিত্য বৈঠকগুলির কথা। পরে নিয়মিত প্রতি বুধবারে বসত বলে আমরা এর নাম দিই 'বুধবারের বৈঠক।' সেখানে সবার আগে মনে পড়ে তারাশঙ্করবাবু ও মানিকবাবুর কথা। লেখক সংঘের খুঁটিনাটি কাজ, এমন কি

হিসেবপত্রের মত নীরস ব্যাপারেও তারাশঙ্করবাবুর কাছ থেকে তখন সৎপরামর্শ আসত অজস্র। সভাপতি হিসেবে পরে শৈলজানন্দবাবু বা প্রেমেনবাবুর কাছ থেকেও নিশ্চয়ই সাহায্য পাওয়া গেছে কিছুটা। কিন্তু এক মানিকবাবু বাদে তারাশঙ্করবাবুর মত অমন সক্রিয় সভাপতি আর আমাদের কপালে জোটেনি। তবে স্বভাবতই ওঁদের সত্যকার পরিচয় মিলত সাহিত্য সভাগুলিতেই। সাহিত্য আলোচনার বৈঠকগুলির কথাই গোড়ায় বলি। সত্যই জমজমাট হত তখনকার আলোচনা সভা। ঘরভরা আসরে কোন তরুণ সদস্যের অর্বাচীন ও অসতর্ক অভিমত খণ্ডন করতে উঠে মানিকবাবু হয়তো শেষ পর্যন্ত সায় দিয়ে বসতেন বেশ বেপরোয়া সিদ্ধান্তে, গভীর হৃদয়াবেগের জোয়ারে উদ্বেল হয়ে উঠত কখনো তারাশঙ্করবাবুর প্রাজ্ঞ বক্তব্য, নারায়ণ গাঙ্গুলীর ধীর ও সবিনয় প্রস্তাবে অবস্থার মোড় ফেরার উপক্রম হত, এমন সময়ে নীরেনবাবুর তীক্ষ্ণ ও অটল মন্তব্যে হয়ত বিচলিত হয়ে উঠতেন হীরেনবাবু, এমন কি ক্ষোভে আসনও ছাড়তেন বুদ্ধদেববাবু, কিন্তু হিরণ সান্যাল মহাশয়ের তরফ থেকে তীক্ষ্ণতর প্রত্যুত্তর আসতে দেরী হত না, আশপাশ থেকে ছেলে ছোকরাও টিপ্পনী কাটতে ছাড়ত না, জ্যোতির্ময় রায়ের বাছাবাছা, চোখাচোখা যুক্তিবান হয়ত ব্যর্থ হত গোপালবাবুর অবিচল চারিত্র্যের বর্মে ঠেকে, মানুষের যুক্তিহীন বাচালতায় অধৈর্য হয়ে উঠতেন রাধারমণ মিত্র, প্রতিপক্ষের বুকে শেলের মত বিঁধত বিষ্ণুবাবুর পরিপাটি ও ধারালো কথাগুলি। অবস্থা যখন সত্যই ঘোরালো হয়ে দাঁড়াত হঠাৎ তখন বিজন ভট্টাচার্য্যের লঘু মন্তব্যে হয়ত হাল্কা হয়ে যেত গুমোট, সবাই হাঁফ ছেড়ে নিশ্চিন্ত মনে নড়েচড়ে বসতেন —শেষ পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্র বা বিনয়ের ডাক পড়ত সুরের মধু দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানার জন্য। এর ব্যতিক্রমও যে ছিল না এমন নয়। উত্তেজিত বিতর্কের জের মাঝে মাঝে দুঃসহ ভারের মত চেপে বসত সকলের বুকে। তবু মিঠেকড়া টক-ঝাল কোনটাই যেন বেমানান ঠেকত না ঐ প্রাণোচ্ছল দিনগুলিতে। শেষ পর্যন্ত অব্যাহতই থাকত জীবনধারা।

যে সব জিজ্ঞাসা নিয়ে এত কাণ্ড, এত উত্তেজনা তার উত্তর হয়ত এখনও মেলেনি পরিষ্কারভাবে, অত সহজে মেলা সম্ভব বলে আমি মনে করিনা। কিন্তু উত্তর পরিষ্কার না মিললেও জিজ্ঞাসার জটিল চরিত্র ও নিহিতার্থ পরিষ্কার হয়েছে অনেকখানিই ঐ 'বিতর্কের মারফৎ। আর সদুত্তর মেলারতো সেটাই প্রাথমিক অপরিহার্য ধাপ। সেদিনকার আলোচনার সার্থকতা তাই সে দিক দিয়েই

বিচার্য। দ্বিতীয়ত এ সবের ফলে নিশ্চয়ই আরো পরিণত হয়েছে তরুণ লেখকদের সাহিত্যবোধ। কবিতায় বা আরো সাধারণভাবে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে সামাজিক বক্তব্য কিভাবে প্রকাশ পায়, এর বিচারে যান্ত্রিকতার বিপদ কতখানি ও কোথায়, কবিতায় আধুনিকতার লক্ষণ কি, আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য কি না বা কেন (মনে আছে এই আলোচনার সময়ে সুধীন্দ্র দত্ত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন আসরে কিন্তু মুখ খোলেননি বহু অনুরোধ সত্ত্বেও), সাহিত্যে বা শিল্পে মতাদর্শের, বিশেষ করে মার্কসবাদী মতাদর্শের স্থান কোথায়, সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে কোন পার্টিনির্দিষ্ট 'লাইন' থাকা সম্ভব বা উচিত কি না, বাঙলা সাহিত্য বা সংস্কৃতির অগ্রগতি সম্ভব কোন পথে—এই সব মৌল ও জরুরী প্রশ্নই সেদিন ভাবিত করেছিল ৪৬নং-কে। আর এ সবের আলোচনা হয়েছিল বাঙলা দেশ বাঙালী সমাজ ও বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপটেই।

সাহিত্য আলোচনার বৈঠক বাদেও ছিল নতুন লেখা পড়ার আসর। অবশ্য আলোচনা সে ক্ষেত্রেও উঠত গল্প বা কবিতাপাঠের পর। কিন্তু সরাসরি রস উপভোগের সুযোগ ছিল এগুলিতে অনেক বেশী। তারই জন্য ঐ আসরগুলির স্মৃতি মনের অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে এখনও। মানিকবাবু যে 'বুধবারের বৈঠকে' 'হারানের নাতজামাই' গল্পটি পড়ে শোনান তার কথা কি উপস্থিত কারো পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব? মানিকবাবু গল্প পড়তেন ঠেকে ঠেকে, একেবারে ঘরোয়াভাবে—বাচনভঙ্গীর নাটকীয়তায় শ্রোতাদের মন পাওয়ার সস্তা কারসাজি (?) প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি নির্লোভ ছিলেন যথার্থই। তবু সেই ধীর, নিরুত্তাপ ও অবিচল শব্দসমষ্টি দেখতে দেখতে আমাদের বিহ্বল চোখের সামনে সেদিন খাড়া করে তুলেছিল বাঙলা দেশের এক আশ্চর্য কিষাণ নারী—ময়নার মা-কে।

আর সেই অপরূপ মুহূর্তটি আমার মনে অক্ষয় হয়ে গাঁথা রয়েছে বালক সুকান্ত যখন ৪৬নং-এর আসরে তার সদ্যরচা 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' থেকে কাঁপা কাঁপা নরম গলায় পড়তে লাগল—

এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।

কে জানত কয়েক বছরের মধ্যে ঐ ৪৬নং-এই এবার আমাদেরই পড়তে হবে তারই লেখা থেকে ঃ

আমার মৃত্যুর পরে কেটে গেছে বৎসর বৎসর।

আমাদের প্রিয়তম ও সর্বকনিষ্ঠ লেখকের অকালমৃত্যু কি আঘাতই না দিয়েছিল সেদিন ৪৬নং-কে !

এই বুধবারের বৈঠকেই ননী ভৌমিক, গোলাম কুদ্দুস, সুলেখা সান্যাল প্রভৃতি অনেকে তাঁদের নতুন লেখা পড়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রবীন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন মহাশয় থেকে শুরু করে বিমলচন্দ্র ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী ও নরেন মিত্রের মত মাঝারিরা এবং অমল দাশগুপ্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসুর মত তরুণেরা অনেকেই তখন নিয়মিত যোগ দিতেন এই আসরে। আর বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুণ', 'জবানবন্দী' ও সুপরিচিত 'নবান্ন' নাটক এবং তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্ভু মিত্রের তিনটি নাটকের প্রাথমিক খসড়া (যথাক্রমে 'দুঃখীর ইমান', 'মোকাবেলা' ও 'উলুখাগড়া') পড়া হয় ৪৬নং-এই। বলা বাহুল্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাঠক ছিলেন নাট্যকারেরাই। এর মধ্যে বিজনের নাটক পড়ার কথা বিশেষ করেই মনে পড়ে কারণ প্রত্যেকটি চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ার যাদু তিনি জানতেন। আর আমরা হাঁ করে শুনতাম নাটকীয় উৎকণ্ঠায় উৎকর্ণ হয়ে।

আর একটি খুবই জরুরী কাজে ৪৬নং কিছুটা হাত দেয়—লোকসঙ্গীতকার ও লোককবিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা। সেই সূত্র ধরেই ১৯৪৫ সালের লেখক সম্মেলনে কলিকাতার শহুরে মানুষের সামনে উপস্থিত হন বাঙলা দেশের দুই বিখ্যাত কবিয়াল—শেখ গোমহানি ও রমেশ শীল। এঁদের কবির লড়াই সেদিন এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা বোধ হয়েছিল আমাদের কাছে। টগর অধিকারী নামে একজন অন্ধ দোতারাবাদকও ঐ সম্মেলনে দোতারা শুনিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেন। আর একজন লোক কবি, নিবারণ পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গেও ৪৬নং-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে ঐ সময়ে। সুধী প্রধান অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন লোককবিদের বিষয়ে। গণনাট্য সংঘও এঁদের কবিসমিতি গড়ার ব্যাপারে কিছুটা সাফল্যলাভ করে।

অন্য দেশের বা অন্য ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রতিও ৪৬নং নারাজ ছিল না মোটেই। গর্কি, রলাঁ, বারবুস, লু-সুন, প্রেমচন্দ, ইকবাল প্রভৃতি সপর্কে আলোচনা ও তাঁদের রচনা পাঠ হয়েছে বহুবার। এর মধ্যে 'লু-সুন ও আধুনিক চীনা সাহিত্য' সম্পর্কে চমৎকার আলোচনাটি করেন 'চায়না রিকনস্ট্রাকটস্' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সহ-সভাপতি, অধ্যাপক চেন হান-সেং।

উর্দু সাহিত্যিকেরা যে বরাবরই ৪৬নং-কে আপন মনে করতেন সে কথা বোঝা যায় এখানে তাঁদের আনাগোনার বহর থেকে। এর মধ্যে জোশ মালিহাবাদী, সাগর নিজামী, পারভেজ শাহেদি, মখদুম মহিউদ্দীন, ডঃ আলিম, আলি সর্দার জাফরি, কাইফি আজমি, সাজ্জাদ জহীর প্রভৃতির নাম মনে পড়ছে। খাজা আহ্‌মদ আব্বাস, মুলকরাজ আনন্দ ও আহ্‌মেদ আলীর (পরে ইনি মহাচীনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন কিছুকাল) মতো যাঁরা সাধারণত ইংরেজীতেই সাহিত্য রচনা করে থাকেন এবং পাঞ্জাবী সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল, 'প্রীতলরি' পত্রিকার সম্পাদক গুরুবক্স সিং-ও এখানে বক্তৃতা করেছেন অথবা আলোচনায় যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। ৪৬নং-এ খুবই আনাগোনা ছিল কিন্তু পরে পাকিস্তানের অধিবাসী হন এমন কয়েকজনার নামও মনে পড়ছে—আবুল মনসুর আহমেদ, হবিবুল্লা বাহার (এঁরা দু'জন পরে পাকিস্তানের মন্ত্রী ছিলেন কিছুকাল), গল্প-লেখক ওয়ালিউল্লাহ সাহেব, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান প্রভৃতি। কবি জসীমুদ্দীনও কয়েকবার এসেছেন এখানে। কবি ফররুখ আহ্‌মেদ ও গল্প লেখক আবুল কালাম শামসুদ্দীন আসতেন কিনা মনে নেই তবে চিঠিপত্রে ৪৬নং-এর সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল যথেষ্টই।

একটি বিকেলের ছবি বিশেষ করেই মনে পড়ছে। ৪৬নং-এর বড় ঘরটি ভর্তি হয়ে তরুণদের ভীড় উপচে পড়েছে সিঁড়ি অবধি। মস্ত আসর জাঁকিয়ে সম্রাটের মতই বসেছেন উর্দু সাহিত্যজগতের কবি-সম্রাট জোশ মালিহাবাদি। তাঁর দু'দিকে আরো দু'জন বিখ্যাত কবি সাগর নিজামী ও বন্ধুবর পারভেজ শাহেদী। একাধারে বিরাট পুরুষ ও অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলো জোশ। যাঁরা তাঁকে দু'দণ্ড দেখেছেন তাঁরাই জানেন তাঁর দরবারী অথচ মজলিসী মেজাজের কথা। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল মুশায়রা। ভরাট অথচ সুমিষ্ট গলায় সুর করে কবিতার প্রথম চরণটি আবৃত্তি করে জোশ দম নিতে থামলেন। অমনই দু'পাশ থেকে নিজামী ও পারভেজ সাহেব সুর মিলিয়ে শুরু করলেন তারই পুনরাবৃত্তি। জোশ ইতিমধ্যে বেশ নিশ্চিন্ত মনে মৃদু মৃদু হাসলেন, নিচু গলায় আলাপ করলেন আশেপাশের গুণমুগ্ধদের সঙ্গে, ডিবে খুলে মুখে পানও ফেললেন দু'চারটে আর তারপর হঠাৎ দোহারদের থামিয়ে দিয়ে ফের শুরু করলেন দ্বিতীয় চরণের আবৃত্তি। শুরু করলেন কিন্তু শেষ আর তাঁকে করতে হল না কারণ শেষ শব্দটিতে পৌঁছবার আগেই আসরশুদ্ধ উল্লাস ধ্বনি

দিয়ে বলে উঠল প্রথম চরণের সঙ্গে মিলের সেই অনিবার্য শেষ শব্দটি। তারপর হাততালি, বাহবাধ্বনি, পিঠ চাপড়ানির সে কি ধুম! সে মত্ততা সত্যই সংক্রামক। উর্দু ভালো বুঝিনা, অনেক কিছুই ধরতে পারছিলাম না। শুধু মনে হয়েছিল উর্দু মুশায়রা শুধু শোনার নয়, দেখারও বটে। আর কবি ও শ্রোতার (পাঠকের নয়) অমন প্রত্যক্ষ নিবিড় সম্পর্ক আর কোথায়ও দেখিনি।

আর ঠিক এর উল্টো বোধ হয়েছিল ৪৬ নং-এ আধুনিক ইংরেজী কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি লুই ম্যাকনীসের স্বরচিত কবিতা পাঠ। উর্দু কবিতা দূরে থাক, বাঙলা কবিতা, এমন কি আধুনিক বাঙলা কবিতা পড়ার সময়েও যেটুকু সুরের আমেজ এসে পড়ে ততটুকুও ছিল না ম্যাকনীসের কণ্ঠে। কথাবার্তার সময়ে ভাববৈচিত্র্যের তাগিদে যতটুকু গলা নামে ওঠে বড় জোর ততটুকু ওঠানামাই লক্ষ্য করা গেল। তবু আমার অনভ্যস্ত কানেও মন্দ লাগেনি সে কবিতাপাঠ—আধুনিক কবিতার মেজাজের সঙ্গে যেন খাপ খেয়ে যায় ঐ ধরনটি।

সাহিত্য বাদে ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীতবিদ্যা বিষয়ক আলোচনাও ৪৬নং-এ যথেষ্ট হয়েছে। বক্তা বা আলোচকদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ডঃ মহম্মদ আস্রফ, অধ্যাপক সুকুমার সেন, সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের নাম মনে পড়ছে। কয়েক-বছর আগে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মরিস ডব্‌ও এখানে বক্তৃতা করে গেছেন। আর রাধারমণ মিত্র মহাশয় 'প্রাক-মুসলিম বাঙলা' সম্পর্কে ছ'দিন ধরে যে তথ্যসমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন তাতে যোগদানের জন্য দর্শনীর ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রতিদিনই ঘর ভরে যেত পুরোপুরি। আর তিন, সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে সবাই উদগ্রীব হয়ে শুনতেন রাধারমণবাবুর বক্তৃতা।

'পরিচয়ের' কথা বলে সাহিত্য প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে। ১৩৫১ সালের শ্রাবণ মাস (১৯৪৪ সনের জুলাই-অগাষ্ট নাগাদ) থেকে 'পরিচয়' পত্রিকার দপ্তর ৪৬ নং-এ উঠে আসে এবং প্রায় বছর তিনেক এইখান থেকেই প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে তখন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার ও রবীন্দ্র মজুমদার।

৪৬নং-এ অধিষ্ঠান 'পরিচয়' পরিচালনার নীতি পরিবর্তনের সূচনা করে। সে পরিবর্তনের সার্থকতা সম্পর্কে আলোচনার স্থান এটা নয়। তবে পুরাতনের সঙ্গে

যোগ একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়নি এর ফলে। পুরোনো 'পরিচয়ে'র একটি প্রায় অপরিহার্য আনুষঙ্গিক—তার শুক্রবাসরীয় আড্ডার ব্যবস্থাটিতে নতুনেরা আত্মসাৎ করেন বিনা দ্বিধায়। এই আড্ডাগুলি কিন্তু অধিকাংশ সময়েই জমত ৪৬নং-এ নয়, পালা করে 'পরিচয়ে'র চার আদিপর্বের সদস্য সুধীন দত্ত, সুশোভন সরকার, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ও গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের বাড়িতে। তাই ৪৬নং প্রসঙ্গে ঐ আড্ডার বৃত্তান্ত কিছুটা অবান্তর। এইটেই শুধু বলে রাখি যে 'পরিচয়' পরিচালকবৃন্দ ও তার আদিপর্বের বিশিষ্টরা ছাড়াও এগুলিতে জড়ো হতেন অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, বিষ্ণু দে, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, বিজন ভট্টাচার্য, অনিল সিংহ, ননী ভৌমিক মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অমল দাশগুপ্ত প্রভৃতি 'পরিচয়ে'র বহু পুরানো ও নতুন লেখক। যুদ্ধের সময়ে মাঝে মাঝে কিছু বিদেশী বন্ধুরাও 'পরিচয়ে'র আড্ডায় আসতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই তখন ছিলেন সৈনিক যদিও যুদ্ধপূর্বের বেসামরিক জীবনে তাঁদের কেউ ছিলেন সাংবাদিক বা লেখক বা চিকিৎসক অথবা ঐ ধরনের অন্য কিছু। এই সব মার্কিন ও ইংরেজ বন্ধুদের মধ্যে মনে পড়ছে হাওয়ার্ড ফাস্ট, ক্লাইভ ব্র্যানসন ও এডওয়ার্ড স্ট্রং-এর নাম। ফাস্ট একদিন মাত্র এসেছিলেন 'পরিচয়ে'র আড্ডায়। তার বৃত্তান্ত নিয়ে পরে তিনি একটি নক্সা লেখেন, 'ম্যাসেস এণ্ড মেনস্ট্রিম' পত্রিকায়। ইংরেজ সাম্যবাদী সাংবাদিক ও কবি, ক্লাইভ ব্র্যানসনের কথা গোপাল হালদার মহাশয় সবিস্তারে 'পরিচয়ে' লিখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে। এই মহাপ্রাণ ইংরেজ এ দেশের মানুষকে ভালবেসেছিলেন সমস্ত অন্তর দিয়ে। তাঁর সংকল্প ছিল যুদ্ধ শেষে ভারতবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালানোর। কিন্তু ঐ যুদ্ধেই তাঁকে প্রাণ দিতে হল বর্মায়। ভারতবর্ষ, তথা সমস্ত পরাধীন দেশ যে যুদ্ধের পরে মুক্তি অর্জন করবেই, এ বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস ছিল সুগভীর। আর মার্কিন দেশের নিগ্রো সাম্যবাদী নেতা, এডওয়ার্ড স্ট্রং-এর কথা উঠলেই মনে পড়ে তাঁর অটল চারিত্র্য, ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভালো করে খুঁটিয়ে জানবার বিপুল আগ্রহ ও নিগ্রোজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর অবিচল আস্থা। দুর্ভাগ্যক্রমে ইনিও কিছুদিন আগে মারা গেছেন বহুদিন রোগভোগের পর।

যুদ্ধের কথায় মনে পড়ে গেল বাঙলা দেশে যুদ্ধের তাণ্ডব প্রধানত যে মর্মান্তিক রূপে আবির্ভূত হয়েছিল সেই পঞ্চাশের মন্বন্তর পর্বের কথা। সেই দেশব্যাপী বিভীষিকার দুর্দিনে মন্বন্তরের বিরুদ্ধে তার সমগ্র শক্তি একাগ্র

করে ৪৬নং সেদিন সত্যই এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছিল তার ইতিবৃত্তে।

মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে নিশ্চেষ্টতা ও অবসাদ দূর করার সেই প্রচেষ্টা ছিল বহুমুখী। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারাশঙ্করবাবুর 'মন্বন্তর' এবং তাঁর ও মানিকবাবুর অসংখ্য জ্বলন্ত গল্প, বিষ্ণুবাবু, সুভাষ, সুকান্ত, অবন্তী সান্যালের বহু কবিতা, গোপালবাবুর সুবৃহৎ তিনখণ্ড উপন্যাস, বিজন ভট্টাচার্য্য, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির শক্তিশালী নাটক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, সোমনাথ লাহিড়ীর বহু তীক্ষ্ণ গল্পের পিছনে তখনকার প্রচণ্ড ভয়াবহ বাস্তবের পরেই অন্য যে শক্তিটি সক্রিয় ছিল তা হচ্ছে ঐ দুঃসহ বাস্তবের বিরুদ্ধে ৪৬নং-এর নির্ভীক সংগ্রামের প্রেরণা। তেমনই আবার জয়নুল আবেদীন, গোপাল ঘোষ, নীরোদ মজুমদার, রথীন মৈত্র, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোড় প্রমুখ শিল্পীর তুলিতে এবং সুনীল জানার মত আলোকচিত্র-শিল্পীর ক্যামেরায় সেদিনের যে ভয়ঙ্কর রূপ চিরকালের মত ধরা পড়ে গেছে তার পিছনেও ছিল ঐ একই প্রভাব। মনে পড়ে ৪৬নং-এ তখন বহু তরুণ শিল্পীর আঁকা ছবির যে প্রদর্শনী হয়েছিল তাতে উপস্থিত থেকে তরুণদের উৎসাহ যুগিয়ে ছিলেন যামিনী রায়, অতুল বসুর মত প্রবীন ও প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীরা।

কিন্তু মন্বন্তরের বিরুদ্ধে ৪৬নং-এর প্রাণপাত সংগ্রামের যে দিকটি সেদিন দেশের লোকের মন সব থেকে বেশী টানে সেটি হচ্ছে 'গণনাট্য সংঘে'র কাজ। গণনাট্যের উন্মেষ ও জন্মের কাহিনী আগেই বলেছি। কিন্তু তার সত্যকার স্ফুরণ হয় এই পর্বে, মন্বন্তরের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে। ধ্বংসকারিতার দিক থেকে বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গেই যার তুলনা তার সঙ্গে নাচগান অভিনয়ের লড়াই হয়ত মেশিনগানের সামনে যুঁই ফুলের গান গাইবার প্রস্তাবের মতো মনে হতে পারে। কিন্তু দেশের নেতারা যখন কারান্তরালে, হতাশার পাঁকে পড়ে দেশবাসীর অবসাদ যখন চরমে পৌঁছেচে তখন সামাজিক বিবেককে জাগ্রত করে, মানুষকে যথাসাধ্য কাজে নামানোর চেষ্টার মূল্য ছিল অপরিসীম। 'গণনাট্য সংঘ' সেই দেশপ্রেমিক কাজেই কোমর বেঁধেছিলেন নির্ভীকভাবে। তাঁদের কাজের ফলে দেশের মানুষের কল্যাণ হবে—এই সহজ অথচ প্রবল অনুভূতি সেদিন অনুপ্রাণিত করছিল তার প্রত্যেকটি কর্মীকেই। তাই তাঁরা অজস্র গান বেঁধেছেন, পালা লিখেছেন আর তাই নিয়ে জলকাদা ভেঙ্গে যৎসামান্য

সাজসরঞ্জাম ঘাড়ে করে দেশের লোককে গান শুনিয়েছেন, নাচ ও অভিনয় দেখিয়েছেন মাঠে মাঠে, পথে ঘাটে, হাটেবাজারে—শুধু বাঙলাদেশে নয় সুদূর পাঞ্জাব থেকেও ঐ গণনাট্যের দল সেদিন তুলে আনে লক্ষ টাকা আর্তত্রাণের উদ্দেশ্যে। সে গান বা নাটক প্রত্যেকটিই খুব উঁচু দরের হয়নি নিশ্চয়ই। তবু তাদের বক্তব্য ছিল সহজ অথচ প্রত্যক্ষ ও বলিষ্ঠ। তাই সে আবেদন স্পর্শ করেছে মানুষের মনকে, গণনাট্য সংঘকে ও তার কর্মীদের তাঁরা স্থান দিয়েছেন অন্তরে। আর ছোট বড় শিল্পীরাও মানবতা ও গণসংস্কৃতির এই আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারেননি—তাঁরাও সেদিন গণনাট্য সংঘের দিকে ঝুঁকেছেন দলে দলে।

গানের কথাই প্রথমে বলি। বিনয়, জ্যোতিরিন্দ্র ও দেবব্রতের কথা আগেই বলেছি। এর মধ্যে প্রথম দুজন সুরকারও ছিলেন। মন্বন্তরের সময়ে তাঁরা গান বাঁধলেন অসংখ্য। তারই সঙ্গে এবারে জুটলেন সিলেটের হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ঢাকার সত্যেন সেন ও আরো জনকয়েক (সলিল চৌধুরী আসেন আরও পরে)। গাইয়ের দলও ভারি হল। বিনয়, জ্যোতিরিন্দ্র ও দেবব্রতর সঙ্গে যোগ দিলেন সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নির্মল চৌধুরী, প্রীতি সরকার (বর্তমানে বন্দ্যোপাধ্যায়), সন্তোষ সেনগুপ্তর মত নামকরা তরুণ গাইয়েরা (এঁরা ছাড়াও ৪৬ নং-এ গণনাট্যের আসরে তখন ও তারপরে গান গেয়ে শুনিয়েছেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মণ, সুখেন্দু গোস্বামীর মত প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী—সঙ্গীতের আসর পরিচালনা করেছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের মত গুণী)। মন্বন্তরের বিরুদ্ধে সেদিনকার গানের অভিযান এই সব কিছুরই সম্মিলিত ফল। তবে গান রচনার ক্ষেত্রে এ পর্বের মহত্তম সৃষ্টি বোধ হয় জ্যোতিরিন্দ্রের 'নব জীবনের গান'। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের পাকা গাঁথুনীর উপরেই জ্যোতিরিন্দ্রের সঙ্গীতচর্চার প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্র সঙ্গীতের তিনি একজন নামকরা শিল্পী। আবার সেই সঙ্গে তিনি একজন সুরকার ও আধুনিক কালের বিদগ্ধ কবি। এই সমন্বয়েরই সার্থক রূপায়ন ঘটেছে 'নবজীবনের গানে' (তাঁর পরবর্তী 'মিছিলের গান'ও এক মহৎ সৃষ্টি)। আফশোষ এই যে এ গানের তেমন উপযুক্ত পরিবেশন এখনো পর্যন্ত ঘটেনি জনসমক্ষে।

মন্বন্তর পর্বে গণনাট্য সংঘের যে কীর্তি সব থেকে বেশি দাগ কেটেছিল মানুষের মনে (বিশেষ করে কলিকাতায় ও পরে কিছু মফঃস্বল শহরেও) সেটি

হল 'নবান্ন' অভিনয়। বিজ্ঞ সমালোচকের প্রখর দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই কিছু ফাঁক ও ত্রুটি ধরা পড়ে ঐ নাটকের। কিন্তু সেদিন তার সমস্ত দুর্বলতা ছাপিয়ে সকলের মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল 'নবান্নের' আশ্চর্য অভিনয় সাফল্যের কথা। ছোট বড় প্রত্যেকটি ভূমিকাতেই গণনাট্যের শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সেদিন এবং তারই জন্য একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে শম্ভু মিত্রের নাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল রাতারাতি। স্বয়ং শিশিরকুমারের প্রশংসা অর্জন করেছিল 'নবান্নের' team work। মূল ভূমিকাগুলিতে শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, শোভা সেন, তৃপ্তি মিত্র (তখনও ভাদুড়ী), চারুপ্রকাশ ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু ও সুধী প্রধানের অভিনয় ভুলবার নয়। কিন্তু ছোট ছোট ভূমিকাগুলিতেও নিমাই ঘোষ, কল্যাণী কুমারমঙ্গলম (তখনও মুখোপাধ্যায়) বা সজল রায়চৌধুরীই কি কম আনন্দ দিয়েছিলেন আমাদের? গোপাল হালদার বা মণিকুন্তলা সেনের মত মানুষ সচরাচর যাঁদের আমরা অন্য ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকাতেই দেখতে অভ্যস্ত, তাঁরাও সেদিন 'নবান্নের' অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ছোট দু'টি ভূমিকায় (মনোরঞ্জন বাবু সম্ভবত 'নবান্নের' কোন চরিত্রে অভিনয় করেননি কোনদিন, কিন্তু তিনি বহুবার ছোটবড় ভূমিকায় নেমেছেন গণনাট্য সংঘের তরফ থেকে। 'হোমিওপ্যাথী' নামে তাঁর একটি নাটকও প্রকাশ করেছিল গণনাট্য সংঘ)।

'নবান্ন' অভিনয়ের কথা বলতে মনে পড়ে গেল বন্ধুবর সুধী প্রধান প্রায়ই তখন নালিশ জানাতেন যে প্রথম দৃশ্যে উত্তেজনাবশে বিজন নাকি রোজ তাঁর গলা এত জোরে চেপে ধরেন যে তাঁর মনে হত মঞ্চের উপরেই তাঁর মৃত্যু অবধারিত। সত্যই অভিনয়কালে বিজন তাঁর ভূমিকার মধ্যে এমন ডুবে যেতেন যে তখন আর তাঁর জ্ঞান থাকত না বিচারের। আর ঠিক উল্টো বোধ হত আমার কাছে শম্ভু মিত্রের অভিনয়। তিনি নামতেন দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের চরিত্রে—একদিকে চারিত্র্যবান গ্রাম্য মাতব্বর ও অন্যদিকে ঘৃণ্য নারী-শিকারী দালাল। শম্ভু মিত্র এর কোনটির মধ্যেই ডুব দিয়ে আত্মহারা হতেন না—ভূমিকার উপরে পূর্ণ আধিপত্য বজায় রেখে তিনি ব্যাখ্যা করতেন চরিত্রের নিহিতার্থ। বিজনের প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে ভেসে আমরা কূল হারাতাম তখনকার মতো—শম্ভুর শিল্পজ্ঞান সন্ধান দিত আনন্দময় উপকূলের।

একটি মানুষকে যদি তখনকার অফুরন্ত কর্মতৎপরতার কেন্দ্র বলে বলতে হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়। ৪৬নং প্রসঙ্গে তাঁর

কথা উঠলেই মনে হয় বড় ঘরটা ভরে গেছে গণনাট্য সংঘের অসংখ্য কর্মীতে, লেখক সংঘের লোকেরা নিজেদের কিছুটা অবান্তর বোধ করে সানন্দে জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন অন্যদের, চারিদিকে অজস্র কথার তুফান, এককোনায় কিছুটা হট্টগোলও বেঁধেছে সম্ভবত, আবার সোরগোলের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র বা দেবব্রত হয়ত দু'কলি গান গেয়েও শোনাচ্ছেন কাউকে, একপাশে চলছে নাচের উদ্দাম মহড়া—আর এই সব 'অশান্তির অন্তরে সুমহান শান্তির' মতো বসে সৌম্য-দর্শন, প্রাজ্ঞ নেতা সব কিছুই লক্ষ্য করছেন সস্নেহে ও সকৌতুকে। আর একদিনের কথা মনে পড়ে। ৪৬নং-এ আসর জমেছে সন্ধ্যেবেলায়। সবাই ধরেছে মনোরঞ্জনবাবুকে তাঁর রঙ্গমঞ্চে যোগ দেবার বৃত্তান্ত বলার জন্যে। আশ্চর্য সুমিষ্ট গলায় তিনি বলে চলেছেন—১৯২২ সালে কি রকম তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে। সেখানে বেআইনী সভায় যোগ দিলে, এমন কি সভায় বক্তৃতা করলেও কিছুতেই তাঁকে ধরছিল না পুলিশ। শুধু দু'ঘা মেরে ছেড়ে দিচ্ছিল রোজই, কারণ পুলিশের উপরে না কি নির্দেশ ছিল শুধু সভাপতিকে ধরার। মরিয়া হয়ে তিনি তাই পথে চলতে চলতে একদিন ফন্দী আঁটছিলেন সভাপতি হওয়ার। এমন সময় হঠাৎ গলি থেকে বেরিয়ে কে একজন ক্যাঁক্ করে তাঁকে পাকড়াও করল। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলেন পুলিশ। কিন্তু কপাল নেহাৎই মন্দ—কারণ ঠাওর করে দেখেন পুলিশ নয়, পুরানো এক বন্ধু। তাঁর অবস্থাও প্রায় সমান মরিয়া। কারণ সখের দল নিয়ে 'চন্দ্রশেখর' করার কথা দু'দিন বাদে। এমন সময়ে প্রতাপ হতভাগা পালিয়েছে কেন জানি। মনোরঞ্জনবাবুকে পেয়ে বন্ধু হাতে স্বর্গ পেলেন কারণ সেকেলে লোক বলে তিনি প্রতাপ বাদ দিয়ে চন্দ্রশেখর করার কৌশল জানতেন না। কাজেই অসহযোগ করতে এসে দুরাত্তির পার্ট মুখস্ত করে অগত্যা মনোরঞ্জনবাবুকে নামতে হল প্রতাপের ভূমিকায়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে দু'দিন পরে সভার সভাপতি হিসেবে যখন তিনি ধরা পড়লেন অবশেষে, থানার দারোগা তাঁকে চিনে ফেলল প্রতাপ বলে। এই তাঁর জীবনের প্রথম অভিনয়। তার অনেক পরে কলিকাতায় এসে যোগাযোগ হল শিশিরকুমারের সঙ্গে।

মনোরঞ্জনবাবুর প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব থেকে গণনাট্য সংঘ চিরতরে বঞ্চিত হয়েছে তাও'ত কয়েক বছর হয়ে গেল।

আর একদিনের কথা বলে গণনাট্য প্রসঙ্গ শেষ করি। ৪৬নং-এ এক সন্ধ্যায় জোর মহড়া চলছে নাচের, বোধ হয় 'নবজীবনের গানের' সঙ্গে।

জ্যোতিরিন্দ্র তালিম দিতে দিতে নিজেই নাচতে শুরু করেছেন মেতে উঠে। তাঁর রাশি রাশি বাবড়ি চুল উঠছে পড়ছে নাচের তালে। খুব জমে উঠেছে মহড়া, ঘড়ির দিকে নজর রাখার ফুরসৎ নেই কারো। এমন সময়ে দরজার দিকে একটা চাপা আর্তনাদ শুনে এগিয়ে গেলাম। দেখি ঠিক নিচের তলার বুড়ি মেমসাহেব উঠে এসেছেন 'সুপ প্লেট' হাতে—তাঁর দু'গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে অবিশ্রাম। আমি তাকাতেই প্লেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি অস্ফুটস্বরে কোনমতে শুধু বল্লেন, 'Look, what you have done to our dinner!' প্লেটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সত্যই হৃদয়বিদারক দৃশ্য—সুপের উপরে চুন ও প্লাস্টার খসে পড়েছে গণনাট্যের নটরাজদের দাপটে। বারবার মাপ চেয়ে কোন মতে ঠান্ডা করা গেল মেমসাহেবকে। ৪৬নং-এর বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে তার প্রতিবেশীদের এই ত্যাগস্বীকারের কথা না উল্লেখ করলে অপরাধ হবে নিশ্চয়ই।

সাহিত্য, নাচ, গান, অভিনয় ছাড়া ফিল্ম নিয়েও ৪৬নং কিছুটা মাথা ঘামিয়েছে। 'উদয়ের পথে'কে অভিনন্দন জানানোর জন্য এখানে খুব চমৎকার আলোচনা সভার ব্যবস্থা হয় দু'দিন ধরে। তা ছাড়া বাঙলা দেশে প্রগতিশীল ফিল্ম তোলার সমস্যাও আলোচিত হয় কয়েকটি বৈঠকে। 'ছিন্নমূলে'র পরিচালক নিমাই ঘোষ (তিনি 'নবান্ন'র একটি ছোট ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করতেন) এবং শম্ভু মিত্র তাঁদের ফিল্ম তোলার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন এমনই দুটি আসরে। সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাসগুপ্ত প্রভৃতি যাঁরা পরে 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি' গঠনে উদ্যোগী হন, তাঁরা উপস্থিত থেকে আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন মনে পড়ে। ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনেরও একসময়ে খুবই যাতায়াত ছিল ৪৬নং-এ। ভালো বিদেশী ফিল্ম—বিশেষ করে সোভিয়েত ফিল্ম আনানোর ব্যাপারে বিশেষভাবেই উদ্যোগী ছিল সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি। ১৯৫১ সালে বিখ্যাত ফিল্ম পরিচালক পুডভ্‌কিন ও তাঁর সঙ্গী অভিনেতা চের্‌কাসভকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ৪৬নং। 'অপরাজিত' ফিল্মের স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়কেও তেমনই অভিনন্দন জানানো হয়েছিল কিছুদিন আগে। আর বাঙলা ফিল্মের বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে শোভা সেন, কালি বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, নিবেদিতা দাস প্রভৃতির সঙ্গে ৪৬নং-এর যোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ।

অর্থাৎ প্রকৃত গুণীকে সমাদর জানিয়ে, প্রগতিশীল ফিল্ম তোলার সমস্যা

আলোচনা করে এবং ভালো বিদেশী ফিল্ম আনাবার চেষ্টা করে ৪৬নং এর ক্ষেত্র সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছে কিছুটা।

যুদ্ধের সময়ে ৪৬নং-এ বহু বিদেশীরা আসতেন। অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ অথবা মার্কিন সৈনিক। ক্লাইভ ব্র্যানসন ও নিগ্রো নেতা, এডওয়ার্ড স্ট্রেংয়ের কথা আগেই বলেছি। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির কাছে আরো অনেকে আসতেন যাঁদের নাম আজ মনে নেই। শুধু স্পেনের জগদ্বিখ্যাত 'আন্তর্জাতিক বাহিনী'র এক সৈনিক, ডেভিড ম্যাকেঞ্জির নাম মনে পড়ছে। কিছু অস্ট্রেলিয়ান, ক্যানাডিয়ান ও গ্রীক নাবিকও এসেছিলেন মনে পড়ে। তাঁরা দিব্যি মাটিতে বসে যখন গণনাট্যের গান শুনতেন বা নাচের মহড়া দেখতেন তখন মনে হত না যে কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁদের ডাক আসবে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার। এই তরুণদের দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ ও অনাবিল এবং দুঃসহ বর্তমানের কুজ্ঝটিকা পেরিয়ে তা স্থিরনিবদ্ধ ছিল ভাবীকালের 'পরেই। তাঁদের সকলের নাম মনে নেই, সবাই জীবিত আছেন কি না জানি না—হয়ত অনেকেই নেই। দেশকালের অতীত তাঁদের চিরতারুণ্যের উদ্দেশে প্রণাম জানাই।

যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্বে নানা দেশের, বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সাধারণ মানুষ যে নির্ভীক ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তার টাটকা খবর পৌঁছতে লাগল ৪৬নং-এ। চীন থেকে ফেরার পথে সমাজতান্ত্রিক মহাচীনের আসন্ন অভ্যুদয়ের কথা ঘোষনা করে গেলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক নীডহ্যাম, সাংবাদিক জগতের স্টুয়ার্ট গেলডার এবং চীনের আজন্ম সুহৃদ, এপস্টাইন। মালয় থেকে, বার্মা থেকে জাপবিরোধী গেরিলা বীরেরা আনলেন এশিয়ার নবজাগরণের বাণী। ইন্দোনেশিয়ার তরুণ তরুণীরা (তাঁদের সংঘের নাম 'মারদেকা' অর্থাৎ স্বাধীনতা) এখানকার তরুণসমাজের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় করার জন্যে একটি প্রীতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন ৪৬নং-এ। বিখ্যাত বৃটিশ সাম্যবাদী নেতা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সুপরিচিত 'লেবার মান্থলি' পত্রিকার সম্পাদক, রজনী পাম দত্ত ১৯৪৬ সালে এইখানেই সাংবাদিক সম্মেলনে শোনালেন যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিপুল ভারসাম্য পরিবর্তনের এবং নতুন দুনিয়ায় ভারতবর্ষেরও আশু স্বাধীনতালাভের অনিবার্যতার কথা। সারা পৃথিবীর, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে আমাদের সৌভ্রাত্রবন্ধন আরো নিবিড় হয়ে উঠেছিল সেদিন এ ঘরের মারফৎ।

প্রধানত সাংস্কৃতিক তৎপরতার কেন্দ্র হলেও ৪৬নং রাজনৈতিক সংগ্রামের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেনি কোনদিন। কারণ গণসংস্কৃতিতে বিশ্বাসী বলে জনসাধারণের স্বাধীনতা, সুখসমৃদ্ধি ও শান্তির মৌল আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করা তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি আর সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টাই'ত এ দেশের রাজনীতি। মনে পড়ে তাই '৪৬ সনের নভেম্বর মাসের অগ্নিগর্ভ দিনগুলির কথা। এই ৪৬নং-এর কয়েক গজ মাত্র দূরে, ঐ ধর্মতলা ষ্ট্রীটের উপরেই সেদিন গঠিত হয়েছিল বাঙালী তরুণের অমর প্রতিরোধ। রামেশ্বরকে হত্যা করে, বহু ছাত্রতরুণের রক্ত ঝরিয়েও সে প্রতিরোধকে চূর্ণ করতে পারেনি সাম্রাজ্যবাদীরা। ৪৬নংও তোলপাড় হয়েছে সেই উত্তপ্ত দিনগুলির উত্তেজনায়। এখানকার কর্মীরা দাঁড়িয়েছেন ছাত্রদের পাশে, ছাত্ররা আশ্রয় পেয়েছেন ৪৬নং-এ। মানিকবাবু সেই দিনক'টিকে অবিস্মরণীয় করে গেছেন তাঁর 'চিহ্ন'। আবার প্রবল আন্দোলনের তোড়ে সাম্রাজ্যবাদীরা যখন বাধ্য হয়েছে জেলখানার দরজা খুলতে তখন ৪৬নংই স্বাগত জানিয়েছে বাঙলার, পাঞ্জাবের সদ্যমুক্ত দেশপ্রেমিকদের। তারপর ঐ ১৯৪৬ সালেই সাম্রাজ্যবাদীদের হীন ও কুটিল চক্রান্ত যখন আমাদের অমার্জনীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভ্রাতৃহত্যায় উন্মত্ত করতে পেরেছে এ শহরের মানুষকে তখন সেই দারুণ দুর্যোগের দিনে আবার ৪৬নং নেমে এসেছে রাজপথে। মন্বন্তরের পর্বের মতই আবার শুরু হয়েছে প্রাণপাত সংগ্রাম, মনে পড়ে দাঙ্গার বিরুদ্ধে লেখক ও শিল্পীদের সেই অপূর্ব অভিযান! রাস্তার মোড়ে মোড়ে যখন সে মিছিল পৌঁছচ্ছিল, নিমেষের মধ্যে মিছিলের গাড়িগুলিকে ঘিরে ফেলছিল হাজার হাজার শঙ্কাতুর মানুষ। তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে ট্রাকের উপরে দাঁড়িয়ে সুচিত্রা মিত্র গান ধরলেন 'সার্থক জনম মাগো'। সুচিত্রা বাঙলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী আর তাঁর কণ্ঠে ঐ গান যে কি যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই জানেন। তবু মনে হয় সেই দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলিকাতার শ্রীহীন রাস্তায় সেদিন তিনি মনপ্রাণ ঢেলে যে গান গেয়েছিলেন তার যেন তুলনা নেই। গান থামলে বলতে শুরু করলেন তারাশঙ্করবাবু—প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে। এইভাবে কোথাও হেমন্ত, দেবব্রত, সন্তোষ, বিনয় বা জ্যোতিরিন্দ্র গান গাইলেন আর আবেদন জানালেন মানিকবাবু, গোপাল হালদার, জ্যোতির্ময় রায় বা আর কেউ। মন্বন্তর পর্বের মতই সহজ ও প্রবল সে আবেদন—'এই মুহূর্তে বন্ধ হোক উন্মত্ত হানাহানি।' রবীন্দ্রনাথের নামে,

গান্ধীজীর নামে, সুভাষচন্দ্রের নামে বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সেই আবেদন গভীরভাবে বিচলিত করেছিল কলিকাতা শহরের মানুষকে।

দাঙ্গার বিরুদ্ধে মানবতা ও জাতীয় গৌরবের টানে এই অভিযান পরিচালনার সংকল্প সেদিন এত প্রবল হয়েছিল যে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'ও ('গণনাট্য সংঘ', 'আর্টিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশনে'র মতো প্রতিষ্ঠান'ত ছিলই) যোগ দিয়েছিল এই মিছিলে। সজনীকান্ত দাস, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ উদ্যোগী হয়ে ছিলেন এ ব্যাপারে।

তারপর এল স্বাধীনতা। কংগ্রেস সংঘের সঙ্গে একযোগে ৪৬নং-এ লেখক ও শিল্পীরা সেদিন অধীর আগ্রহেই অনুষ্ঠান করেছিলেন স্বাধীনতা উৎসবের। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই সে আগ্রহ স্তিমিত হয়ে এল কঠিন বাস্তবের চাপে। স্বাধীনতা এল কিন্তু জনশক্তির উদ্বোধন হল কই? দেশজোড়া মানুষের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা, শিক্ষা সংস্কৃতির যথোচিত ব্যবস্থা রাতারাতি প্রত্যাশা করা ঠিক নয়, জানি। কিন্তু প্রশ্ন হল তার আন্তরিক চেষ্টাও কি হচ্ছে যথোপযুক্ত? দেশের মানুষ কি ভরসা পাচ্ছেন যে অতঃপর মুস্কিল আসানের সঠিক পথেই তাঁরা এগোচ্ছেন, সুস্থির গতিতে তাঁদের এবার সত্যিই ডাক পড়েছে নিজের ভাগ্য নিজের হাতে তুলে নেওয়ার? না কি এ ব্যবস্থা এমনই যাতে ধনীরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটে আর নির্ধনেরা নিঃস্ব হন যত দিন যায়? আশাভঙ্গ হল তাই ৪৬নং-এর বহু কর্মীর। রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বরাবরই ছিল বেশ ঘনিষ্ঠ। সেই রাজনীতির সূত্র ধরেই ৪৬নং-এর উপরে নেমে এল দমনের খড়্গ। এখানকার বহু নেতা ও কর্মী—গোপাল হালদার, হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, পারভেজ শাহেদী, নিরঞ্জন সেন, ননী ভৌমিক, দ্বিজেন্দ্র নন্দী আরো অনেককেই বিনাবিচারে আটক থাকতে হল মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ৪৬নং তখনকার মত। বন্ধুবর মনোরঞ্জন বড়াল সেই দুর্দিনে কোনক্রমে জ্বালিয়ে রাখলেন বাতি।

সে অগ্নিপরীক্ষাতেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছে ৪৬নং। ১৯৫১ সাল থেকে কিছুটা নতুন পরিবেশে আবার শুরু হয়েছে তার আধুনিকতম পর্ব। স্বাধীন ভারতবর্ষ—সোভিয়েত ইউনিয়ন, মহাচীনের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশ, এশিয়া আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন বা স্বাধীনতাকামী জাতি এবং পৃথিবীর সব দেশের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে একযোগে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ চক্রান্ত ব্যর্থ করুক, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করুক দেশবাসী মাত্রেরই, অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য আশ্রয়ের

সুব্যবস্থা করে শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির আলো পৌঁছে দিক এদেশের ঘরে ঘরে। প্রত্যেক সাধারণ মানুষের মতোই ৪৬নং-এরও অন্তরের কামনা এই-ই। আর সে কামনাকে তার নিজস্ব ক্ষেত্রে চরিতার্থ করার জন্য আজও সে তৎপর।

এ পর্বে তাই জগদ্বিখ্যাত ফিল্ম পরিচালক পুডভ্কিন্ ও তাঁর সঙ্গী বিখ্যাত অভিনেতা চের্কাশভ, কবি টিখনভ, চিত্রশিল্পী গোরাসিমভ, তাজিক কবি তুরসুন জাদে, আজারবাইজানের গায়ক, রশিদ, বেবুটভ, ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রীমতী বিকোভার মত সংস্কৃতি দূতেরা এখানে এসেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্ব-শান্তি ও মৈত্রীর বাণী নিয়ে। বিশিষ্ট বৃটিশ সাংবাদিক রালফ পার্কারের মুখ থেকে শোনা গেছে সোভিয়েত জীবনের নানা কথা। প্রতিবেশী মহাচীনের সঙ্গে সৌহার্দ্য অক্ষয় করে তোলার জন্য 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির' মতো 'চীন-ভারত মৈত্রী সমিতির'ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে ৪৬নং-এই (পরে ঐ সমিতির দপ্তর স্থানান্তরিত হয় অন্যত্র)। চীনের সংস্কৃতি দূতেদের অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে এখানে। চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ভাষাতাত্ত্বিক ও বাঙলা ভাষায় সুপণ্ডিত, অধ্যাপক দুশান জাবিতেল এখানে এসে জয় করে গেছেন আমাদের চিত্ত।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধ পরাধীন জাতির অপরাজেয় সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে এখানে এসেছেন আলজিরিয়ার মুক্তি ফ্রন্টের এক নেতা, শেরিফ গেলাল এবং তারও আগে বৃটিশ গায়েনার দুই বিশিষ্ট জননেতা, ছেদি জগন ও বার্ণহ্যাম। এশিয়া আফ্রিকার সংহতির, সমস্ত পরাধীন দেশের ঐক্যের সংকল্প আরো সুদৃঢ় হয়েছে তাঁদের জ্বলন্ত ভাষণের ফলে।

আর পারমাণবিক যুগের বৃহত্তম প্রয়াস, বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সরিক ভারতীয় শান্তি সংসদের পশ্চিমবঙ্গ শাখারও দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৪৬নং-এ। তারই সূত্রে বিশ্বশান্তির বাণী বহন করে এখানে এসেছেন বিশ্বশান্তি আন্দোলনের মহান নেতা, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক ও বিজ্ঞানী, অধ্যাপক জোলিও-কুরী স্বয়ং। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন আর এক জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও শান্তি আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, অধ্যাপক বার্ণাল। অধ্যাপক জোলিও-কুরীর সাম্প্রতিক মহাপ্রয়াণ তাই ৪৬নং-এর অন্তরঙ্গমহলে একান্ত প্রিয়জন হারানোর সামিল বোধ হয়েছে। তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে এ উপলক্ষে সেদিন কলিকাতার মেয়রের সভাপতিত্বে যে বিরাট জনসভার আয়োজন করেন, তা'তে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জে, বি, এস হলডেন (অধ্যাপক হলডেন এর আগেও শান্তি সংসদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে

পরীক্ষা চালানোর বিপদ সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যমূলক বক্তৃতা করেছিলেন)। অধ্যাপক বার্ণাল পরেও আর একবার ৪৬নং-এ এসেছিলেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নিপুণ বিশ্লেষণ করে তিনি তখন শান্তি আন্দোলনের গতিপথ চিহ্নিত করেছিলেন শান্তি কর্মীদের কাছে। আরও একজন বৃটিশ বৈজ্ঞানিক ডঃ পিরি-ও পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করে গেছেন ৪৬নং-এ। মাদাম ইসাবেল ব্লুম, মঃ ভিন-এর মত বিশ্বশান্তি আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতারা, আমাদের প্রতিবেশী সিংহলের শান্তি আন্দোলনের নেতা, ভিক্ষু শরণংকর এবং ডোরা রাসেল, জেসি স্ট্রীট, মিস উডকক্ ও বেটি রাইলির মত আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়ারাও বিভিন্ন সময়ে এসে আলোচনা করে গেছেন এখানকার শান্তি কর্মীদের সঙ্গে।

ভারতীয় শান্তি আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে ডঃ সইফুদ্দীন কিচলু, পন্ডিত সুন্দরলাল, পৃথ্বীরাজ কাপুর এসেছেন ৪৬নং-এ। আর পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের সভাপতি, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং ঐ সংসদের বিশিষ্ট নেতা, শচীন সেনগুপ্তের' তো এখানে প্রায় নিত্য আনাগোনা। শচীনবাবুকে শান্তি আন্দোলনের তরফ থেকে অবশ্য একেবারে আত্মসাৎ করা ঠিক হবে না কারণ ৪৬নং-এর অন্য সরিক ও সহযোগী গণনাট্য সংঘের সভাপতি হিসেবে এখানে যাতায়াতের অন্য টানও রয়েছে তাঁর তরফে।

৪৬নং-এর জীবনধারা আজও প্রবহমান কিন্তু তার বৃত্তান্তের আপাতত এইখানেই শেষ। তবু ছেদ টানার আগে কয়েকটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই। যে সব কথা লেখা হল তার থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে আমার মতে ৪৬নং-এর ইতিবৃত্ত শুধু দক্ষতা, ঐক্য, তৎপরতা ও সার্থকতারই কাহিনী। এখানকার খবর যাঁরা কিছুমাত্র রাখেন তাঁরাই জানেন একথা ঠিক নয় আদৌ। অসংখ্য অক্ষমতা, অনৈক্য, নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতার কাঁটা পদে পদে বিঁধেছে এখানকার যাত্রীদের। ইতিবৃত্তের প্রতি অধ্যায়েই আছে তার কোন না কোন স্বাক্ষর। তবু সে সবের আলোচনা বা বিচারের চেষ্টা এখানে করিনি— ৪৬নং কেন, কতটুকু করেছে, বিশেষ করে কি সে করতে চেয়েছে—তাই দেখাতে চেয়েছি সাধ্যমত।

৪৬নং কোন একটি আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানের প্রতীক নয়। বিচিত্র প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে উঠেছে অথবা এখানে আশ্রয় পেয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটির কর্মকেন্দ্র আজও এখানেই রয়েছে, কিছু অন্যত্র উঠে গেছে, বাকীগুলি

বন্ধ করেছে কাজকর্ম। ১৯৫৮-র শেষ দিক থেকে ৪৬নং-এর ঐ ঐতিহাসিক বাড়িটির সঙ্গে এখানে উল্লিখিত সবগুলি প্রতিষ্ঠানেরই যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে কার্যগতিকে। আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জীবনে জোয়ার ভাঁটা এসেছে বারেবারে। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে এইসব প্রতিষ্ঠানের ভিতরে আনুষ্ঠানিক কোন যোগাযোগ নেই—এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা এর প্রত্যেকটির সদস্য হয়ে কাজ করেন এমনও নয়, বরঞ্চ যাঁর যেমন ইচ্ছা তাঁরা পছন্দ করে নেন উপযোগী কাজকর্ম বা প্রতিষ্ঠান। তবু প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হলেও এবং প্রত্যেকে আপন অভিরুচি মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থাকলেও এখানকার সমস্ত ভাবনা ও প্রয়াসের পৃষ্ঠপট হিসেবে রয়েছে একটি সর্বব্যাপী ভাবাকাশ। সে ভাবাকাশের বিভিন্ন অংগের মধ্যে আছে মানব প্রগতি ও বিশ্বশান্তিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস, যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের প্রবল বিরোধিতা, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীনতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত সত্যকার আন্তর্জাতিকতায় গভীর আস্থা, জাতিবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম, শ্রমজীবী ও দুর্গত মানুষের স্বাধিকারে, গণ সংস্কৃতির বিপুল সম্ভাবনায় এবং সমাজতন্ত্রে অটল বিশ্বাস, আর এ সবের ভিত্তি হিসেবে স্বাধীন ভারতবর্ষের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে অবিচল আস্থা। সমস্ত দুর্বলতা ও অক্ষমতা ছাপিয়ে এই ভাবাকাশই ৪৬নং-এর ভাবনা ও প্রয়াসের মধ্যে অনবরত গভীর সংহতির প্রেরণা যোগায়—একাত্ম করে কর্মীদের, বিচিত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভব করে নিবিড় সহযোগ।

এই ভাবাকাশের পরিচয়ই ৪৬নং-এর প্রকৃষ্ট পরিচয়। তাই এই লেখা।

('আন্তর্জাতিক', সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৫৮)

ভারতবর্ষ : সমসাময়িক সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

ভারতবর্ষের অবস্থা পাশ্চাত্য দুনিয়ার থেকে বহুলাংশেই স্বতন্ত্র। নতুন অর্থনীতির পাশাপাশি এখনও পুরানো অর্থনীতিকে জবরদস্তি কায়েম রাখা হয়েছে। মতাদর্শ ও মননশীলতার ক্ষেত্রে এর ফল দাঁড়িয়েছে মারাত্মক। এখানে তাই সনাতন সংস্কৃতির স্থান অধিকার করার মতো কোনো নতুন সংস্কৃতি গড়ে ওঠে নি, বিজ্ঞান ও হাতুড়ে-গিরি, মানবিক আন্তর্জাতিকতাবাদ ও কূপমণ্ডূক সাজাত্যবোধ দুইই চলছে পাশাপাশি। পশ্চিমের সমস্যা যদি হয় সংস্কৃতি রক্ষার, এখানকার সমস্যা হল সংস্কৃতি গড়ে তোলার। কারণ সনাতনের স্থান দখল করতে পারত যে নবীন সংস্কৃতি তাকে গলা টিপে হত্যার চেষ্টা হয়েছে আঁতুড়েই। শিল্পীরা অধিকাংশই সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের প্রসাদভোজী। গ্রাম্য শিল্পী কারিগররা তো প্রায় নিশ্চিহ্ন। শহুরে লেখক শিল্পীরা কেউ কেউ জীবিকা অর্জনের জন্য বৃহৎ সংবাদপত্র, প্রকাশক সংস্থা ও সিনেমা কোম্পানীর দ্বারস্থ। অগভীর, পল্লবগ্রাহী 'পণ্ডিতীয়ানা'; নিরেট ও নিটোল আত্মসন্তুষ্টি বোধ, কৃত্রিম ভঙ্গীসর্বস্ব ঐতিহ্যবিরোধ আর দুঃসহ অবস্থার চাপে গণশিল্প প্রস্ফুরণের অস্ফুট আভাস মাত্র—সমসাময়িক ভারতীয় দৃশ্যপটের মোটামুটি এই হল চেহারা। হিন্দুরাজের স্বপ্নাতুর সনাতনী পুনঃ-প্রতিষ্ঠাবাদ; 'পাকিস্তানের' রণধ্বনী মুখে বিশ্বজোড়া ইসলামী ভাবনা; যোগীর অতি চেতনের ধ্যানমগ্নতা; বিশ্বজনীনতা নিয়ে শিথিল ও অস্পষ্ট কাব্যময় উচ্ছ্বাস আর আপন আত্মবিরোধে জর্জর, দ্বিধাজড়িত জাতীয়তাবাদ—মননশীল ভারতে এ-সব ঝোঁকেরই আজ প্রাধান্য।

[১৯৪১ সালের এ-লেখাটি আসলে কয়েকটি 'পয়েন্টস' মাত্র। 'ইয়ুথস' কালচারাল ইন্‌ষ্টিটিউট' (Y. C. I) ঐ সময়ে 'Crisis in culture' বিষয়ে এক পোষ্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করে স্টুডেন্টস হল্-এ। তা'র পোস্টার যাঁরা এঁকেছিলেন তার মধ্যে সত্যজিত রায় ও দিলীপ রায়ের নাম মনে পড়ে। রাসেল, ফ্রয়েড, লরেন্স, হাক্সলি প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের মননশীলতায়

যে অন্তর্বিরোধ প্রকট ছিল, তার কথাই প্রকাশের চেষ্টা হয়েছিল পোষ্টারগুলিতে।

তারই পাশাপাশি এ-দেশের সমসাময়িক চিন্তা জগতের পরিস্থিতি বিষয়েও পোষ্টার করার কথা ছিল প্রদর্শনীতে। তারই 'পয়েন্টস' নিয়ে এই প্রাথমিক খসড়াটি আমার। মূল খসড়া করেছিলাম ইংরাজীতে। পোস্টার কিন্তু শেষ অবধি হয়ে উঠেনি এ-বিষয়ে।]

(১৯৪১)

সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণে লোককলা

বাংলা দেশে সাম্যবাদ যে শৈশব উত্তীর্ণ হয়েছে অনেক দিক থেকেই তার লক্ষণ দেখা যায়। বুদ্ধিজীবী মার্ক্সবাদীদের ছোট ছোট পাঠচক্রে তত্ত্ব আলোচনা ও মজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অর্থনৈতিক গণ্ডীর সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে সাম্যবাদ আজ অনেক এগিয়ে এসেছে, দেশের ব্যাপকতর রাজনীতিতেও তার প্রভাব ক্রমেই অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে। এমন কি সমাজ-জীবনের মূলে শুধু নয় তার বিচিত্র শাখা প্রশাখায়—সাহিত্য, শিল্প ও চিন্তার ক্ষেত্রেও তার ছাপ ক্রমশই প্রস্ফুট হচ্ছে।

সাম্যবাদীর পক্ষে এটা আনন্দের কথা সন্দেহ নেই কিন্তু চিন্তার কথাও বটে। কারণ সাম্যবাদ শুধু দৃষ্টিকোণ মাত্র' নয় যার সাহায্যে ঘটনা প্রবাহের যথাযথ বিচার সম্ভব। সাম্যবাদীকে যথাযথ কর্মেরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে হয়। এ কাজটার গুরুত্ব স্বভাবতই বেশী। তাই প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদীর দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে যায় কারণ পাঠচক্রের সমালোচনার যাথার্থ্য আজ যাচাই করার প্রয়োজন হচ্ছে কর্মের কষ্টিপাথরে।

সম্প্রতি লোককলা সম্বন্ধে সাম্যবাদীকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। নিছক শিল্পানুরাগ বা মনোধর্মীসুলভ কৌতূহলই কিন্তু এর কারণ নয় যদিও মানুষ হিসাবে সাম্যবাদীরও নিশ্চয়ই এ সব 'বালাই'ও আছে। কাজের মধ্যে পা বাড়িয়ে সাম্যবাদী ক্রমেই বুঝতে পারছেন যে জনসাধারণকে শুধু যুক্তিজাল বিস্তার করে, অর্থাৎ মস্তিষ্কের মারফৎ আবেদন করলেই কাজ হয় না—ভাবাবেগের মধ্যে দিয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করারও প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। আর জনসাধারণকে এইভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে সঠিক কর্মে প্রবৃত্ত করতে হলে তাদের নিজস্ব লোককলাগুলি উপেক্ষা করা চলে না। তাই সাধারণভাবে লোককলা সম্পর্কে পথ নির্দেশের প্রশ্ন আজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে।

সাম্যবাদীদের মধ্যে যাঁরা সংস্কৃতির কাজেই আত্মনিবেশ করেছিলেন তাঁদের কাজ এতদিন প্রধানতঃ কলকাতা বা মফঃস্বল সহরগুলিতেই আবদ্ধ ছিল। কর্মীরাও এসেছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী 'থেকে। তাই তাঁদের 'আন্তরিক' প্রচেষ্টার

মধ্যে 'সহুরে' ছাপটা স্বভাবতই পরিস্ফুট ছিল। আজ যখন জীবনের তাগিদে সাম্যবাদী কর্মীর দৃষ্টি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সহর ছাপিয়ে গ্রামে যাওয়ার উপক্রম করছে, তখন প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে "আমরা কি তবে এতদিন ভুল করছিলাম ?"

আমার মনে হয় এই প্রশ্নের অন্তরালে সংস্কৃতির আন্দোলনের 'সহুরেপনা'র জন্য একটা কুণ্ঠা আত্মগোপন করে আছে। অর্থাৎ কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি বিশেষ করে মধ্যবিত্তের পরিচর্যায় পরিপুষ্ট হয়েছে, তাকে একেবারে অস্বীকার না করলেও ঢিলে ভাবে গ্রহণ করার একটা মনোভাব দেখা দিচ্ছে। এই কুণ্ঠাবোধের কোন কারণ আছে কি ?

দেশের লোককলার সঙ্গে গণজীবনের যোগ প্রত্যক্ষ। কিন্তু মনে রাখতে হবে গণজীবন দুর্দশা ও নিপীড়নের আঘাতে আঘাতে যে পরিমাণে প্রাণ প্রাচুর্য হারিয়েছে ঠিক সেই পরিমাণে লোককলার রঙও হয়েছে ফ্যাকাশে। প্রাণহীন পৌরাণিকতা, সংগ্রাম-বিমুখী আত্মসন্তুষ্টির ঘুমপাড়ানী অধ্যাত্মবাদ, কুসংস্কার এমন কি সমাজদ্রোহও ক্রমেই লোককলার পরে ভর করে বসেছে। তাই 'সহুরে-পনা'র অভিযোগে দিশেহারা হয়ে একেবারে Revivalism বা পুনরাবৃত্তির পথে পা বাড়ালে আজ সর্বনাশ হবে।

কিন্তু যে গণজীবন আজ বাংলার গ্রামে গ্রামে আছে ছড়িয়ে, তার সঙ্গে যোগস্থাপন করতে না পারলে, তাকে প্রভাবিত করতে না পারলে সংস্কৃতির রক্তাল্পতাও দূর হবে না। তাই আমার মনে হয় গ্রাম্য লোককলাগুলির আঙ্গিক মূলত আমাদের গ্রহণ করতেই হবে কারণ সহুরে থিয়েটারের কৌশল, সিনেমার ঢঙের সুর, জটীল ভাব ও ভাষার মারপ্যাঁচের সাহায্যে গ্রামের কথা বললে সে-সুর, সে-সাহিত্য, সে-অভিনয়, তাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারবেনা। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখা যাবে যে লোককলার আঙ্গিক অনেক সময়ই প্রগতি-চিন্তার বাহক হওয়ার উপযোগী হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে নাগরিক সংস্কৃতির উন্নততর আঙ্গিকেরও সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে কাজটা করতে হবে অত্যন্ত সাবধানে ও সুকৌশলে, জোর করে বাইরে থেকে অপরিচিতকে ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য। মূলত গ্রাম্য আঙ্গিক রাখতেই হবে কিন্তু তারই সঙ্গে সাবধানে উন্নততর আঙ্গিক মেলাতে হবে—সর্বদাই এই সাবধানবাণী মনে রেখে যে সে সংমিশ্রণে দুই-এরই খারাপ দিকটা আলগাভাবে জোড়া লাগানোর নাম শিল্প নয়। ধীরে ধীরে গেঁয়ো চোখ বা কান 'সহুরেপনা'র ছোটখাট প্রয়োগগুলি গ্রহণে অভ্যস্ত হবে তখন উন্নততর নাগরিক আঙ্গিক আরও বেশী

পরিমাণে নেওয়া চলতে পারে। সর্বদাই মনে রাখতে হবে চাষী মজুররা বুদ্ধির দিক থেকে খাটো নয়। ধরাবাঁধা অনুশীলনের অভাবে তাদের বুদ্ধি-বৃত্তির সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি না হতে পারে কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় তারা কারুর থেকে কম নয়। তাই সংস্কৃতির নামে তাদের কাছে ছেলেভুলোনো, রঙ্গিন চটকদার রস-চটচটে যা হয় একটা কিছু পরিবেশন করলেই চলবে মনে করলে ভুল হবে। শিক্ষানবীশের অক্লান্ত ধৈর্য্য নিয়ে, সাধকের একাগ্র নিষ্ঠা নিয়ে এ পথে পা বাড়াতে হবে। বাংলা দেশের শিল্পী বা সাহিত্যিকের যথার্থ শিল্পনিষ্ঠার বা সাহিত্যানুরাগের পরীক্ষা হবে এই প্রচেষ্টারই কষ্টিপাথরে।

('অভিবাদন', আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৫০)

রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার

রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে আজ আর বাংলা দেশের কোন সাহিত্যিক মহলেই সংশয় নেই। এমন কি এ প্রসঙ্গে যে সংশয়ের কথা উঠতে পারে, এটাই যেন আজ আমাদের কল্পনাতীত। কিন্তু অস্বীকার করা চলে না যে কয়েক বছর আগেও এ বিষয়ে যথেষ্ট ভিন্ন মতের রেওয়াজ ছিল। বরঞ্চ আশ্চর্য্য এই যে. যে 'শনিবারের চিঠি' রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁকে কি না বলেছে সেই আজ তাঁর মৃত্যুর পরে কি না বলছে তাঁকে—অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে। যে অচিন্ত্যকুমার একদিন "সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর", বলে আক্ষেপ করেছিলেন আজ তাঁরই সহমর্মী কবি বুদ্ধদেব বসুই কবিগুরুকে "আমার প্রথম প্রেম, সর্ব্বশেষ প্রেম তাও তুমি" বলে সম্ভাষণ করছেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতার প্রগতি সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে তাঁর অভিভাষণে রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ছিল অকুণ্ঠ। কিন্তু তারই সঙ্গে ছিল—সে সাহিত্য ধারাকে অক্ষুন্ন রাখা সমাজ-সচেতন প্রগতি সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব কিনা, এমনই একটা প্রশ্নের ইঙ্গিত। আজ কিন্তু তিনি 'সব-পেয়েছির দেশে'র বন্দরে এসে ঠেকেছেন যেখান থেকে 'weary seems the sea, weary the oar'। ১৯৩৪-৩৫ সালে তরুণ মার্ক্সবাদীদের মধ্যে দেখেছি রবীন্দ্র সাহিত্যকে এক নিঃশ্বাসে ফিউডাল বা বুর্জোয়া বলে ধূলিসাৎ করবার চেষ্টা—আরও বাকচাতুর্য্যের সাহায্যে যার জের আজও টেনে চলেছেন 'নিরুক্ত' গোষ্ঠি। রাজনীতির দিক থেকে তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলাম বলে এতে পীড়িত হতাম খুবই। ক্রমাগতই মনে হত এদের মুখের বড়াই সত্ত্বেও এরা নিশ্চই লুকিয়ে লুকিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান ভালবাসে। আজ যে তারা রবীন্দ্র সাহিত্যের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছে এ যেন আমারই ব্যক্তিগত জয়লাভ। কবিগুরুর শবদেহের পরে অজস্র ফুলের মালার ভীড়ের মধ্যে সংগোপনে অথচ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তখনকার দিনের বে-আইনি কম্যুনিষ্ট পার্টির দেওয়া একটী মালা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সে মালাটীর ব্যঞ্জনা ছিল আমার কাছে গভীর। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদ যে শৈশবকাল উত্তীর্ণ হয়েছে তারই সাক্ষ্য ছিল সেটী।

এই পর্য্যন্ত গেল মিলের কথা। গরমিল বাধে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক উত্তরাধিকার নিয়ে। ব্যক্তি হিসাবে কথা বলা সাহিত্যিক বিচারে সঙ্গত হবে না—হয়তো লাভও নেই খুব, কারণ বিনা দ্বিধায় রবীন্দ্রনাথের শূন্য আসনে গৃহীত হবেন—এতবড় শক্তিশালী লেখক বাংলাদেশে বর্তমানে নেই। তাই বোধ হয় মতবাদের দিক থেকে বিচার করাই এ বিষয়ে সঙ্গত হবে।

'শনিবারের চিঠি'তে আজকাল বিক্ষিপ্তভাবে নানামতের লেখা মাঝে মাঝে বেরুচ্ছে। কিন্তু সেখানে যে সুরটীর প্রাধান্য আজও মোটামুটি অক্ষুন্ন রয়েছে সেটী হচ্ছে সজনীকান্তের "আমরা তাহারা নহি।" শুধু ভূগোলের দিক দিয়ে নয়, কালের পরিমাপেও আমরা যে সব দেশের ও সব কালের থেকে—বিশেষ করে পাশ্চাত্যদেশের ও বর্তমান কালের থেকে একেবারে ভিন্ন রাজ্যে বাস করি—'শনিবারের চিঠি' এই বিশ্বাসের পরেই প্রতিষ্ঠা করেছে তার সাহিত্যকে। তাই বিপুল রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রাসাদের যে প্রকোষ্ঠগুলি মধ্যযুগের আধো আলো, আধো ছায়ায় রহস্যময় হয়ে রয়েছে 'শনিবারের চিঠি'র আকর্ষণ সেইখানেই।

বুদ্ধদেব বলছেন চারিদিকের এই প্রলয়ঝঞ্ঝার মধ্যে সাহিত্যিকের কর্তব্য হচ্ছে অচঞ্চল চিত্তে পরম একনিষ্ঠার সঙ্গে 'good art' সৃষ্টি করে যাওয়া। তিনি মনে করেন সাময়িক উত্তেজনা, এমন কি সুসঙ্গত সমাজচৈতন্যও 'আর্টের' প্রতি সাহিত্যিকের একনিষ্ঠা ব্যাহত করবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ 'Humanism' যা গত মহাযুদ্ধের তাণ্ডবে, সংশয়বাদের ঝাপটায়ও অনির্বাণ ছিল, যা বারে বারে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সামাজিক চিন্তাকে আপনার করে নিয়ে এগিয়েছে—তার উত্তরাধিকার কি হবে ঝড়ঝঞ্ঝার মুখে চোখকান বুজে থাকার অস্বাভাবিক প্রাণপাতে? স্রোতের মুখে গা-ভাসানোর কথা বলছি না কিন্তু স্রোতের শক্তি ও গতি সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা কেন যে স্বল্পরক্ত বর্তমান সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করবেনা বুঝিনা।

আজ এই যুগ বদলের মুহূর্তে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের—

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।"

সে কবির এখনও আবির্ভাব হয়নি। কিন্তু চারিদিকে তারই জয়যাত্রার প্রস্তুতি যে চলছে তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। দেশের বলিষ্ঠ তারুণ্য আজ মাটির কাছাকাছি পৌঁছবার দিকে ঝুঁকছে। তাদের মধ্যে শক্তি সবার সমান নয়, হয়ত বা কারুর মধ্যে 'শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলাবার' ইচ্ছাও অজ্ঞাতে কাজ করছে। কিন্তু ঘটনাকে তলিয়ে দেখার মূল্য তারা ধরেছে, বুঝেছে পুরাতনের জের টানার একান্ত নিষ্ফলতা আর সব থেকে আশার কথা 'সৌখিন মজদুরী'র মেকীত্বও তাদের সন্ধানী দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। একদিকে তারা নির্মম—তারা কারুকে ছাড়েনা—নিজেদের তো নয়ই। আবার অন্যদিকে তারা অত্যন্ত দরদী—সেদিকটা প্রকাশ পাচ্ছে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যাবার তাদের অক্লান্ত চেষ্টার মধ্যে। সাহিত্য জগতে যে থমথমে আবহাওয়া চলেছে তা থেকে আশা হয় রবীন্দ্রনাথ যে কবিকে দূরের থেকে স্বাগত জানিয়ে গেছেন, তার জন্ম হবে হয়ত তাদেরই মধ্যে থেকে। অন্ততঃ তার জয়যাত্রার পথ আজ তারাই করছে প্রশস্ত। সে অনাগত কবির ললাটে থাকবে নতুন যুগের জয়তিলক আর তার আবির্ভাবে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে এক নিমেষে সমস্ত প্রশ্নের অবসান ঘটবে।

('নিরীক্ষা', বৈশাখ, ১৩৫০)

১৯৪২ সালের ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর তারিখে সংঘের দ্বিতীয় অধিবেশন[৫] হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মূল সভাপতি), হুমায়ুন কবির, আবু সৈয়দ আইয়ুব, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে সম্মেলনের সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হয়। বাঁকুড়া, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, যশোহর প্রভৃতি জেলা থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ এতে যোগদান করেন। তা ছাড়া বাঙলার বাইরে থেকেও প্রতিনিধি বা অভিনন্দনলিপি মারফত সাড়া পাওয়া যায়। এই সম্মেলনের খবর দৈনিক পত্রিকাগুলিতে বেশ ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' এখন পর্যন্ত সংগঠনের দিক থেকে দুর্বল। শিল্পীদের কাছে এখনও যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়নি। অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ কর্মীর অভাব যথেষ্টই রয়েছে। অবশ্য সম্প্রতি শহরের বুদ্ধিজীবী আবহাওয়া ও স্বতঃস্ফূর্তি থেকে সংঘের আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেবার আন্তরিক চেষ্টা হচ্ছে। মফঃস্বল থেকেও বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। নৈহাটি, দিনাজপুর, রংপুর, হাওড়া ও গাইবাঁধা থেকে ডাক এসেছে সংঘের কাছে এবং শীঘ্রই ঐখানে শাখা খোলবার চেষ্টা চলেছে। গান ও অভিনয়ের দুটি স্থায়ী দল দ্রুত গড়ে উঠেছে। বোম্বাইতে আগামী প্রগতি লেখক সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রায় পনেরো জন প্রতিনিধি যাবেন। ঐ সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর জন্য সংঘ থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম মনোনীত হয়েছে।

এইখানে বাঙলাদেশে গানের আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এর সূত্রপাত 'ইয়ুথস কালচারাল ইনস্টিটিউটে'র আমল থেকে। সে আন্দোলন ছিল একান্তভাবে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ—মজুর, কিষানের সংগ্রামের সঙ্গে সে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। এই সময়কার কিছু গান নিয়ে কমরেড বিনয় রায় শুরু করেন তাঁর আন্দোলন। গোড়া থেকে তাঁর

৫. সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীদের ২৮ মার্চের অধিবেশনকে কেউ বলেছেন প্রকাশ্য সভা, কেউ বলেছেন প্রথম সম্মেলন। সম্ভবত সভা, বড়জোর কনভেশন, বলাই সঙ্গত। সেই হিসেবে ১৯-২০ ডিসেম্বর সংঘের প্রথম সম্মেলন হয়েছিল—এ কথা বলাই বোধ হয় ঠিক হবে।—সম্পাদক

লক্ষ ছিল কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করা। বিহ্টা কিষান সম্মেলন থেকে তিনি কিছু হিন্দী গান আনেন। ভারতভূষণ অগ্রবালের 'বড় চলো' গানও এই সময় পাওয়া গেল। এরই সাহায্যে 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধারম্ভের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে তিনি মাতিয়ে তুললেন সমস্ত জনসভাকে। এর পরে ডোমার কিষান সম্মেলনে তাঁর উত্তরবঙ্গের ভাষায় লেখা গেরিলা গান "হই হই হই" চাষীদের মাঝে বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করল। মফঃস্বল থেকেও গান আসতে লাগল কিছু কিছু। বোম্বাই থেকে শেখা ও হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি হিন্দী গানও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গানের আন্দোলন যে মধ্যবিত্তের আওতা থেকে ক্রমেই জনসাধারণের দিকে এগোচ্ছে তার আর-এক প্রমাণ বিভিন্ন জেলার চলিত ভাষায় গান রচনা। মৈমনসিংহ-এর হাজং নামক আদিবাসীদের মধ্যে জনযুদ্ধের গান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা স্ত্রী-পুরুষ-শিশু একযোগে এই গান গায় ও সঙ্গে সঙ্গে নাচে। মিশনারী প্রভাবাধীন গারোদের মধ্যেও এই সুরের ছোঁয়াচ লাগছে। সম্প্রতি কমরেড বিনয় রায় উত্তর ও পূর্ববঙ্গের ১০টি জেলায় ঘুরে ১৩টি কেন্দ্রে ৯০ জনকে গান শিখিয়েছেন, স্থানে স্থানে গানের কেন্দ্র স্থাপন করে এসেছেন।

গোড়ার থেকেই এসব গান ছিল ফ্যাসিস্টবিরোধী, কিন্তু প্রথম প্রথম মনে হত এর সঙ্গে বুঝি দেশের মাটির যোগ নেই। বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদই যে আজ ফ্যাসিস্টবিরোধী রূপ নিতে বাধ্য, এ সত্য তখনও কি রাজনীতিতে, কি সাহিত্যে, কি গানে প্রতিফলিত হয় নি। কিন্তু পরে জনযুদ্ধের গানের সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীতের গোড়ার দিককার ব্যবধান গেল ঘুচে। জনযুদ্ধের গানই এ যুগের জাতীয় সঙ্গীতের রূপ নিল। "শোন মজুর কিষাণ দল" কিংবা কমরেড হেমাঙ্গ বিশ্বাসের "ও তোর সোনার ধানে বর্গী নামে" যে কোনো জাতীয় সঙ্গীতের মতোই মর্মস্পর্শী। কিন্তু এ শুধু 'স্বদেশী' যুগের অন্ধ পুনরাবৃত্তি নয়। ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতা, ব্যাপক আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ও চাষীমজুরের সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় এ গান আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। ভাষায় এল স্বচ্ছতা—বুদ্ধিজীবীসুলভ প্যাঁচালো কথার জায়গায় এল সহজ ও মর্মস্পর্শী কথা। বর্তমানে 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এই গানের আন্দোলনকে সংগঠিত করবার চেষ্টা করছে।

কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস প্রভৃতিতেও নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব দেখা যেতে লাগল যদিও সত্যকার সৃষ্টির দিক থেকে বড় কিছু এখনও দেখা দেয় নি।

বুদ্ধিজীবীসুলভ ঘোলাটে ভাবের কোয়াশাও সম্পূর্ণ কাটে নি। তবে জনযুদ্ধের তাণ্ডব জনসাধারণের মধ্যে যে আলোড়ন এনেছে তার মুখে এ সমস্ত বাধা তৃণের মতো ভেসে যাবে। মুষ্টিমেয়র বিলাসের সামগ্রী থেকে সংস্কৃতি আজ গণ-আন্দোলনের মূর্ত প্রকাশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চারদিকের সব লক্ষণ দেখে মনে হয় বাঙলা সংস্কৃতির ধারা আজ একটা বাঁকের মুখে।

('জনযুদ্ধ,' ২৮ শে এপ্রিল, ১৯৪৩)

প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে

বোম্বাই-এ প্রগতি সাহিত্য সম্মেলন ও তারই সঙ্গে গণনাট্য সম্মেলনের আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি পাওয়া মাত্র ঠিক করে ফেলেছিলাম যাবই সেখানে। ব্যক্তিগতভাবে আমার আকর্ষণের আরও কারণ ছিল। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের একমাত্র বুর্জোয়া সহর চোখে দেখার ইচ্ছা ছিল খুবই। আর সব থেকে বড় কথা ঐ সময়ে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত থাকার দুর্জয় লোভ সামলানো প্রায় অসম্ভব ছিল আমার কাছে।

অতএব ১৯শে সন্ধ্যায় হাওড়া ষ্টেশন থেকে "১৬ জন বসিবেক" মার্কা একটি থার্ড ক্লাস গাড়ীতে আমরা মাত্র ২৩-জন ঢুকলাম বোম্বাই-এর উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে তরুণ সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, গায়ক, অভিনেতার সঙ্গে আমার মত দু-এক জন ছিলেন, যাঁদের গায়ে প্রাণপাত চেষ্টাতেও কোনরকম ঐ ধরনের লেবেল আঁটা যায় না। তাই গুণীর দলের মধ্যে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের জন্যই ঐ আশ্চর্য menagerie-র ম্যানেজারী খানিকটা বাধ্য হয়েই নিতে হল আমাকে।

হাওড়া ষ্টেশন ছাড়া থেকে বোম্বাই-এ পৌঁছানো অবধি মাঝের পথটার কথা আমার মগজে এখনও একটানা হই-হই চীৎকার গানের মহড়া ও থেকে থেকে গুণীদের ঔদরিকতার অদ্ভুত দৃষ্টান্তে একাকার হয়ে রয়েছে। চমক ভাঙল একেবারে দাদারে এসে। শুনলাম নামতে হবে ঐখানেই।

দাদার যেন বোম্বাইয়ের বালীগঞ্জ। পরিস্কার চওড়া চওড়া রাস্তা খাস বোম্বাই থেকে প্রায় মাইল সাতেক দূরে। ওখানকারই বাসিন্দা এক বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে জিনিসপত্র রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বোম্বাই-এর উদ্দেশ্যে। সম্মেলনের কর্মকর্তাদের নিশানা জানা ছিল না, তাই ভাবলাম Communist Party Office এ গেলে নিশ্চয়ই একটা খবর মিলবে। বন্ধুবর বিনয় রায় ছিলেন আমাদের গাইড। তাঁর পরিচালনায় মাত্র বার ছয়েক ভুল করে অবশেষে পৌঁছলাম আসন্ন কংগ্রেসের কর্মচাঞ্চল্যমুখর ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে। নানা প্রদেশের কর্মীর দেখা মিলল সেখানে। পরিচিত

মুখও কিছু কিছু দেখলাম এধারে ওধারে। যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সর্বাগ্রে খেয়ে আসতে বললেন Party-র রন্ধনশালায়। সেই পথেই দু-একজন বাঙালী কর্মীর সঙ্গেও দেখা হ'ল। রন্ধনশালায় পোঁছে অবাক হলাম। প্রায় তিন চারশ কর্মী খেতে বসেছেন। কোন অবন্দোবস্ত বা হট্টগোল নেই। এ সমস্তর ভার যাঁর পর তিনি সকলের কাছে "মাইজী" নামে পরিচিতা। এই প্রৌঢ়া মহিলা একদিকে যেমন জবরদস্ত অন্যদিকে তেমনই আশ্চর্য্য তাঁর আতিথেয়তা। প্রত্যেকের কাছে সুবিধা-অসুবিধার কথা জিজ্ঞেস করছেন। কিন্তু নিয়মভঙ্গ হ'লে অত্যন্ত কঠোর তিনি—কত কঠোর কয়েকদিন পরের অভিজ্ঞতা থেকে তা আমরাই বলতে পারি। চাপাটি, ভাত, ভাজি অর্থাৎ তরকারী, ডাল ও পাতার ঠোঙায় ঘোল—এই হ'ল আমাদের আহার্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোককে একই খাবারে খুশী করা অত্যন্ত কঠিন তাই সর্বপ্রথমেই আমিষ বাদ দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার বেশ ভালই লাগত খাবার, বিশেষ করে তার পরিচ্ছন্নতা।

আহারের পর ঠিক হ'ল আমাদের একদল থাকবে বিশেষ জরুরী এক মিটিং-এর জন্য; অন্যেরা দাদারে ফিরে যাবে মালপত্র আনতে, কারণ প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অভাবে আমরা অন্ততঃ সাময়িকভাবে Party ক্যাম্পে ওঠাই সাব্যস্ত করলাম।

সেদিন আমাদের দাদার-পন্থী সঙ্গীরা কিরকম নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন তার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত সে রাতেই শুনবার সাহস হয়নি, কারণ নিজের নিজের মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে ভিজতে ভিজতে অবসন্ন দেহে যখন সেই অভিনব যাত্রীদল ক্যাম্পে পোঁছলেন তখন রাত প্রায় একটা। তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে তখন উদ্যত প্রশ্নরাজি জোর করে থামিয়ে রেখেছিলাম, কারণ পুঞ্জীভূত আক্রোশের একটা সাংঘাতিক বিস্ফোরণের আশংকা ছিল। পরদিন শুনলাম বেচারারা অচেনা শহরের পথে পথে ভিজে ভিজে ঘুরে বেড়িয়েছে—guide অভিজ্ঞ না হওয়াতেই এই গোলমাল। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল ভোর ৪৷৷০টায়—ভাঙল না বলে বলা উচিত ঘুম ভাঙানো হল, কারণ ৭৷৷০ মধ্যে স্নান সারার হুকুম ছিল। তাই ভলান্টিয়াররা আমাদের ঘুম ভাঙাতে অত্যন্ত তৎপর ছিল রাত থাকতেই।

পরদিন অর্থাৎ ২২শে মে বিকেল থেকে শুরু হল প্রগতি সাহিত্য সম্মেলন। যে হলটিতে অধিবেশনের আয়োজন হয়েছিল সেটা আয়তনে বেশ বড়ই। নানা প্রাচীরপত্রে ও ছবিতে তার দেওয়ালগুলিকে সাজানো হয়েছিল। উঁচু

মঞ্চের পরে স্থান হয়েছিল সভাপতি মণ্ডলীর। বাংলা থেকে শ্রীযুক্ত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম ছিল সভাপতি মণ্ডলীর তালিকায়। কিন্তু তাঁরা উপস্থিত হতে না পারায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় বাংলার প্রতিনিধিত্ব করলেন। এছাড়া ছিলেন উর্দু সাহিত্যের পক্ষে বিখ্যাত কবি যোশ মালিহাবাদী, মারাঠী সাহিত্যের পক্ষে শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে, গুজরাটী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জীতুভাই মেহতা, তেলেগু সাহিত্যিক ধর্মরাও ও কানাড়ী ভাষার তরফ থেকে অধ্যাপক জাহাঙ্গীরদার। এঁদের ভাষণের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত ডাঙ্গের লিখিত অভিভাষণ। সুদীর্ঘ হলেও তাঁর অভিভাষণ এত সুচিন্তিত ছিল যে শ্রোতাদের বিরক্তির উদ্রেক করেনি এক মুহূর্তের জন্যেও। এতদিন ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কম্যুনিষ্ট ডাঙ্গের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, ভারতের সব থেকে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের একচ্ছত্র নেতা, ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ডাঙ্গেকেও জানতাম। কিন্তু প্রস্তুত ছিলাম না ডাঙ্গের এই আশ্চর্য সাহিত্যিক পরিচিতির জন্য। কিন্তু অপ্রত্যাশিত হলেও সে-পরিচয় যে অত্যন্ত খাঁটি তার প্রমাণ পেয়েছিলাম তাঁর ভাষণের ছত্রে ছত্রে। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে তিনি যেভাবে মারাঠী সাহিত্যের প্রাচীন ও বর্তমান ধারার বাচাই করছিলেন তা সত্যই অদ্ভুত। লিখিত ভাষণ পাঠের মাঝে মাঝে তাঁর সরস টিপ্পনীগুলিও ছিল উপভোগ্য। বুদ্ধিজীবী সুলভ অস্পষ্ট মতামতের বালাই ছিল না তাঁর লেখার মধ্যে। শ্রমিকনেতার উপযুক্ত সুস্পষ্ট মত অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই তিনি প্রকাশ করছিলেন বারবার।

প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আমাদের বাঙালী গায়কদলের সমবেত সংগীত, বিশেষত মনে আছে রবীন্দ্রনাথের "বাঁধ ভেঙে দাও" গানটির কথা। গাইবার আগে ইংরাজী তর্জমা শোনানোর ফলে অবাঙালী সুধিবৃন্দের এর রস গ্রহণে সুবিধা হয়েছিল। লক্ষ্য করে ছিলাম বাঙলার বাইরে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ আছে। সঙ্গীতে শেষের করতালির পরিমাপে শুধু নয়, গান গাইবার সময়ে এবং সভার পরেও অনেকের উদগ্রীব প্রশ্ন থেকে তাঁদের এবিষয়ে একান্ত আগ্রহ খুবই চোখে পড়ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকজন প্রতিনিধি আমার পাশেই ছিলেন।

তাঁরা গানের প্রত্যেকটি লাইনের অর্থবোধের জন্য উৎসুক হয়ে বারবার আমার শরণাপন্ন হচ্ছিলেন। গানটি গাওয়া হয়েছিল খুব ভালো। বিশেষ করে বন্ধুবর দেবব্রত বিশ্বাসের সুদক্ষ নেতৃত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জনৈকা পোলিশ ভদ্রমহিলা সভাশেষে তাঁর কাছে গানের তর্জমাটি, সাগ্রহে চেয়ে নিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে সুদীর্ঘ পথের ঝক্কি আর প্রথম দিনের অনর্থক হয়রানির ফলে আমাদের দলের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর সূত্রপাত আরম্ভ হয় অবশ্য ট্রেন থেকেই। পথে যাঁদের সযত্নে বিসর্জনের সাবধান বাণী শাস্ত্রকারই ঘোষণা করে গেছেন তাঁদের দিয়েই শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত এর প্রকোপ আমরা দু-চারজন ছাড়া আর কেউই বোধ করতে পারেনি। তাই তৃতীয় দিন থেকেই আমাদের গানের দলে ভাঙন ধরতে আরম্ভ করে। ফলে ২৩শে সাহিত্য সম্মেলনের মধ্যাহ্ন অধিবেশনে আমরা গান গাওয়ার সংকল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হই।

২৩শে বিকেলে কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধন হ'ল বিখ্যাত কামগার ময়দানে। ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ও গিরনি কামগার ইউনিয়নের সঙ্গে এই ময়দানের যোগাযোগ বহুদিন থেকেই. শুনেছিলাম। সেই ময়দানেই ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব পার্টির প্রথম কংগ্রেসের সূচনার মধ্যে তাই একটা বিশেষ তাৎপর্য পেয়ে ছিলাম। মাঠেরই একপ্রান্তে বক্তাদের মঞ্চ তোলা হয়েছিল। দেশনেতা গান্ধীজী, জিন্না, নেহরু ও যোশীর বড় বড় ছবি দিয়ে এটাকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। এগুলি কম্যুনিষ্ট পার্টির অক্লান্তকর্মী চিত্তপ্রসাদের আঁকা। বুঝলাম যে একে কিছুদিন আগেও যা জেনেছি তার থেকে সে অনেক এগিয়ে গেছে। মাঠের চারিধারে সময়ের উপযোগী শ্লোগান লেখা ব্ল্যাকবোর্ডগুলিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। মঞ্চের উপরে ছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ ও অভ্যাগতের দল। আবার বাংলার ডাক পড়ল গানের জন্য। মাইক্রোফোনের দোষে অবশ্য সেদিন গান ভাল জমেনি। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদ্যনির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে, নিখিল ভারত কিষাণসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখার্জি, বোম্বাই শ্রমিকদের বৃদ্ধা নেত্রী সুন্দরীবাঈ প্রভৃতির বক্তৃতা বোম্বাই-এর সহস্র সহস্র বিপ্লবী মজুরের পরিবেশে সেদিন

আশ্চর্য্য শোনাচ্ছিস, যদিও অনেক সময়েই হয়ত তার সম্পূর্ণ অর্থবোধ হচ্ছিল না।

কামগার ময়দান থেকে আমরা বাঙলার দল ছুটলাম প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনের রাতের অধিবেশনে যোগ দিতে। অবশ্য পথে কোন ক্রমে এক ফাঁকে হোটেলে খেয়ে নেওয়া হল। রাত ন-টায় শুরু হ'ল প্রস্তাব আলোচনা। সমগ্র পৃথিবীর সামনে যে ফ্যাশিস্ট বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তাকে প্রতিহত করে নূতন সমাজচেতন সংস্কৃতি গড়ার সুদৃঢ় সংকল্প জ্ঞাপন করে মূল প্রস্তাবটি রচিত হয়। এটি ছাড়া সোভিয়েত ও চীনা লেখক ও শিল্পীদের অভিনন্দন জানিয়ে, অবরুদ্ধ ভারতীয় নেতা ও প্রগতি সাহিত্যিকদের মুক্তির দাবী করে, কাগজ সম্পর্কে সরকারী নীতির প্রতিবাদে ও গণনাট্য আন্দোলনকে সম্বর্ধিত করে বিভিন্ন প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে আবার বাঙলার ডাক পড়ল গান শোনানোর। 'এক-সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'—তরুণ বয়সে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই গানটি সেদিন সভায় সকলের মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে গায়কদলকে অভিনন্দন জানান। সুদূর বোম্বাই-এ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের এরকম আন্তরিক সমাদর সেদিন আমাদের অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছিল। গানের পর অন্যান্য প্রস্তাব আলোচনা, প্রগতি সাহিত্য সংঘের নূতন কর্মকর্তা নির্বাচন প্রভৃতি কাজ প্রায় বারোটা পর্যন্ত চলে। উর্দু সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সজ্জাদ জহীর সম্পাদক, শ্রীযুক্ত আব্বাস ও কবি বিষ্ণু দে যুগ্ম সহসম্পাদক ও শ্রীযুক্ত মামা ওয়ারেকর সংঘের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরিশ্রান্ত দেহে আমরা আমাদের আস্তানায় যখন ফিরলাম তখন প্রায় রাত একটা।

এর পর দিন অর্থাৎ ২৪শে মে তারিখে দামোদর থ্যাকারসে হলে কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এর নামকরণ হয়েছিল—"জাতীয়-সংস্কৃতি উৎসব।" এখানে অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, পাঞ্জাব যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও বাংলা থেকে বিভিন্ন দল নিজ নিজ প্রদেশের গান, নাচ, আবৃত্তি প্রভৃতির রূপ পরিবেশন করলেন। কিন্তু এ শুধু অতীতের অন্ধ পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়। দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্মত রূপের মধ্য দিয়ে এই তরুণ শিল্পীরা যে ভাবধারা প্রকাশ করলেন সেটা সনাতন নয়—বলিষ্ঠ সমাজচিন্তার সঙ্গে তার যোগ অন্তরের। অনুষ্ঠানের মধ্যে বেশ কল্যাণকর একটা

প্রতিযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি হল। বিচারক ছিলেন অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি, যুক্তরাজ্যের শ্রীযুক্তা হাজরা বেগম ও শ্রীযুক্ত চারি। অনুষ্ঠানান্তে এঁদের সর্বসম্মত মত অনুসারে অন্ধ্রকে প্রথম, বাংলাকে দ্বিতীয় ও কেরলকে তৃতীয় ঘোষণা করা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথমস্থানের গৌরব লাভের কারণ ছিল সুস্পষ্ট। দেশের মাটির সঙ্গে যে সব রসরূপের যোগ হচ্ছে নিবিড় সেইগুলি নিয়েই সেখানকার কর্মীনিষ্ঠরা কাজ আরম্ভ করেছেন। তার মধ্যে তাঁরা নবজীবনের রস সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছেন এবং খানিকটা সাফল্যলাভও যে করেছেন এটাও নিশ্চিত। সন্যাসী, ওঝা, রাখাল, ধাঙড় প্রভৃতি নিয়েই তাঁরা তাঁদের নৃত্য আবৃত্তি ও গান রচনা করেছেন, কারণ গ্রামের চাষীর কাছে ঐ চরিত্রগুলি অত্যন্ত সুপরিচিত। সহুরে রস বিচারের মানদণ্ডে হয়ত সে নাচগান অতিরিক্ত সরস ও হাল্কা প্রতিপন্ন হবে; কারণ সত্যই তার মধ্যে সুক্ষতা বা জটিলতার আতিশয্য ছিলনা এবং এও ঠিক যে অন্ধ্রদেশকে. কলাকৌশলের দিকে আরও নজর দিতে হবে। কিন্তু সংস্কৃতিকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলতে হ'লে তাকে গণজীবনের সঙ্গে গ্রথিত করতেই হবে, আর তার জন্যে প্রথমেই লোকশিল্পের রূপগুলিকে নিয়েই কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন। আমাদের বাঙলা দেশ থেকে অবশ্য আমাদের গানই ছিল সম্বল—একমাত্র ময়মনসিং-এর নিবারণ পণ্ডিতের পাঁচালী পাঠ ছাড়া। সে গান শ্রোতাদের হৃদয় জয় করেছিল, অক্লেশে হাততালিও বাঙলার দলই পেয়েছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু অন্ধ্র প্রদেশের থেকে একটা পার্থক্য সকলেরই চোখে পড়েছিল। আমরাও সংস্কৃতিকে নিশ্চয়ই ব্যাপকতম রূপ দিতে চাই; কিন্তু আমাদের অধিকাংশ গানের সুর ও কথা থেকে এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল যে আমরা যেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়েই জনগণের মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করছি আর অন্ধ্রপ্রদেশ সেখানে শুরু করেছে লোকশিল্প নিয়ে একেবারে সোজাসুজি জনগণের মধ্যে। দুই প্রাদেশিক দলের প্রতিনিধিদের শ্রেণীরূপ থেকেই একথা আরও স্পষ্ট হয়। আমাদের বাংলার দলে—দশরথলাল ও নিবারণ পণ্ডিত ছাড়া সবাই আসছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আর অন্ধ্রদেশের দলের সবাই ছিল কৃষক ও কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অবশ্য বাঙলায় সংস্কৃতি জগতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দান নিশ্চয় উপেক্ষনীয় নয়, কিন্তু তার বর্তমান নিস্তরঙ্গ জীবনে জোয়ার আনতে হ'লে সে সংস্কৃতির সঙ্গে

মজুর-চাষীর জীবনের যোগাযোগ ঘটাতেই হবে অতি দ্রুত গতিতে।

সেদিনকার দুটি গানের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। উত্তরবঙ্গের ভাষায় লেখা চাষী গেরিলার গান "হই-হই-হই" পরিচালনা করেন তারই রচয়িতা, বন্ধু বিনয় রায়। এই অত্যন্ত সহজ ভাষা ও সুরের গানটি সুদূর পাঞ্জাব বোম্বাই ও অন্ধ্রদেশের হৃদয় জয় করেছিল। তাঁরা করতালি দিয়েই ক্ষান্ত হননি, অনুরোধের পর অনুরোধ করে বাধ্য করেছিলেন বাংলার দলকে আবার এটিকে গাইতে। এই গানটির সুর গ্রাম্য হলেও অত্যন্ত জোরালো। এটা শিখবার জন্যে বিভিন্ন প্রদেশের ছেলে মেয়েরা বিনয় রায়-কে অতিষ্ঠ করে তুলতেন।

আর যে গানটি সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছিল সেটি হচ্ছে কায়ুর শহীদদের সম্বন্ধে লেখা। এটিও বিনয় রায়-এরই লেখা। এটি যখন আরম্ভ হয় তখন অত্যন্ত করুণ বোধ হয় এর আবেদনকে, কিন্তু ক্রমশঃ অশ্রু ব্যাকুলতা উত্তীর্ণ হয়ে গানটি যখন শেষ পঙক্তিতে ঘোষণা করে 'চার কায়ুরের বদলে আজ ভাই, হাজার হাজার কায়ুর চাই' তখন সকলের কথা বলতে পারিনা—অন্তত আমার শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎস্পর্শের আভাষ পেয়েছিলাম, ও বুঝে ছিলাম 'সুরের আগুন ছড়িয়ে দেওয়ার' তাৎপর্য কি।

২৪শে তারিখ রাত ১০৷৷০টায় হিন্দী ও উর্দু মোশায়রার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। আমাদের মধ্য থেকে চতুর্বেদী প্রভৃতি কয়েকজন গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু একমাত্র চতুর্বেদী ছাড়া বাকী সকলে এর রস সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেন নি। বাংলা ভাষায় ঠিক এই ধরনের কবিতা পাঠের ঐতিহ্যের খোঁজ পাওয়া যায় না, যদিও কবির লড়াইয়ের সঙ্গে হয়ত খানিকটা এর মিল আছে। যোশ মালিহাবাদী, সাগর নিজামী মাজাজ, মখদুম, নরেন্দ্র শর্মা প্রভৃতি বিখ্যাত কবিরা এই দিন মোশায়রায় যোগদান করেন।

২৫শে সকালে গণনাট্য সম্মেলনের অধিবেশন বসল। সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন বাংলার প্রসিদ্ধ অভিনয়শিল্পী শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন প্রদেশের বিবরণী পাঠের থেকে বোঝা গেল যে বোম্বাই, বাংলা ও পাঞ্জাবেই গণনাট্য অভিনয় খানিকটা শুরু হয়েছে মাত্র। বোম্বাইএ সর্দার জাফরীর "ইয়ে কিসকা খুন হ্যায়" নাটকটি মজুরেরা অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করেছিল। তারা স্বল্পমূল্যে সোভিয়েট বা প্রগতিমূলক সিনেমা দেখানোরও ব্যবস্থা করেছেন কয়েক

বার তাদেরই জন্য। কিন্তু সব থেকে আমাদের ভালো লাগলো পাঞ্জাবের বিবরণীটি। এটি পেশ করলেন শ্রীএরিক সিপ্রিয়ান। ইনি ছিলেন কলেজের অধ্যাপক—বর্তমানে অধ্যাপনা ছেড়ে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন আর সোজাসুজি নেমে এসেছেন জনগণের মধ্যে। এঁদের গণনাট্য কোন একজন নাট্যকারের লেখা নয়। সকলে মিলে নাটকের বিষয়বস্তু ঠিক করা হয়। তারপরে একজন নাটকটি লিখে ফেলেন। এরপরেও প্রতিবারই অভিনয়ের পর সমস্ত কিষাণ দর্শকদের মতামত নিয়ে আবার বদলানো হয় নাটকটিকে। এইভাবে ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে নাটকের রূপ। শ্রীযুক্ত সিপ্রিয়ানের বিবরণ থেকে বোঝা গেল যে পাঞ্জাবের কর্মীরা প্রথম থেকেই বিখ্যাত লেখক বা নাট্যকারের মুখাপেক্ষী হননি—একেবারে সোজাসুজি কিষাণের মধ্যে শুরু করেছেন কাজ। অবশ্য পাঞ্জাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহিত্যিক ঐতিহ্য বাংলার মত সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে কোন ক্ষতির আশংকা না করেও।

২৫শে সন্ধ্যার দামোদর হলে নিখিল ভারত গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রদেশের নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। মারাঠি নাট্যকার অনন্ত কানেকারের "রক্ত ও অশ্রু"; খাজা আহমদ আব্বাসের "অমৃত"; টিং সিংএর "আশ্চর্য্য-সংগীত"-এর ইংরাজী অনুবাদ ও বন্ধুবর বিনয় ঘোষ-এর "ল্যাবরেটরী" এই দিন অভিনীত হল। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে সব প্রদেশেরই অভিনয় বেশ ভালই হয়েছিল। আনুষঙ্গিক রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদির ব্যবস্থাও ভালই ছিল। নাটকগুলির মধ্যে সবগুলিই অবশ্য চাষী মজুরের উপযোগী ছিল না, কিন্তু প্রত্যেকটাই ছিল মোটামুটিভাবে প্রগতি চিন্তার বাহক। বাংলার অভিনয়ের বেশ প্রশংসা হয়, বিশেষ করে বন্ধুবর শম্ভু মিত্রের। তাঁর সহজ অভিনয় ও কন্ঠস্বর সকলেরই মনোরঞ্জন করে। পরের দিন "বম্বে ক্রনিকল" প্রভৃতি পত্রিকায় এদিনকার বেশ বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়।

ইতিমধ্যে প্রগতি লেখক সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে আমাদের বাংলাদেশের কয়েকজন প্রতিনিধির পৃথক থাকার বন্দোবস্ত করা হয়। এঁদের দু-একজন ছিলেন বেশ খানিকটা অসুস্থ, তাই পার্টি ক্যাম্পের কড়া হুকুম থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্যই হ'ল এই ব্যবস্থা। আমরা তাই এবার তিন চার দলে ছড়িয়ে পড়লাম। বিনয় অসুস্থতা সত্ত্বেও রইলেন ক্যাম্পেই। সুভাষ আমি চতুর্বেদী প্রভৃতি আরও কয়েকজনও থেকে গেলাম সেখানেই। ইতিমধ্যে পার্টি ক্যাম্পের জবরদস্ত আইন বেশ সয়ে এসেছিল আমাদের।

শুধু ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙানোর জন্য ভলান্টিয়ারদের পীড়াপীড়িটা অসহ্য বোধ হত। কারণ কোন দিনই রাত একটা দুটোর আগে শোয়ার যো ছিলনা। খাওয়াটা অবশ্য মাঝে মাঝে আমরা বাইরেই সেরেছি সময় সংক্ষেপের জন্য। এক-দিন তো বিপদেই পড়া গেল। বোম্বাই-এর বাঙালী ক্লাব প্রগতি লেখক সম্মেলনের বাঙালী প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁদের ক্লাবে। সেখানে অনুষ্ঠান শেষ করে পার্টির রন্ধনশালায় পেঁছিতে পেঁছিতে প্রায় রাত দশটা। ঠিক সময়ে উপস্থিত হইনি এই আইনভঙ্গের অপরাধে সেদিন 'মাইজী' প্রায় অনাহারের ব্যবস্থা করেছিলেন আমাদের জন্য। 'আমরা খবর পাঠিয়েছিলাম সংবাদদাতার ভুলে খবর পেঁছয়নি' এই সব নানা করুণ আবেদনের পর সে রাতে কোন রকমে আহার জোটে। প্রত্যেকটি প্রতিনিধির সুবিধার দিকে যাঁর দৃষ্টি ছিল অদ্ভুত সজাগ তাঁরই অন্যরূপ দেখলাম সেদিন। মনে হল শৃংখলাহীনের প্রতি তাঁর নিষ্করুণতা সত্যই আদর্শস্থানীয়।

২৮শে তারিখ সন্ধ্যায় কমুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে বিভিন্ন প্রাদেশিক দলের নাচ গান ও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। পাঞ্জাবের দল খাদ্য সমস্যাকে নিয়ে একটি নাটিকা অভিনয় করলেন। তার ঘটনার মধ্যে কোন জটিলতা ছিল না—পাঞ্জাবের কিষাণের দুর্গতি ও কিষাণ সম্মেলনের প্রতি আস্থা নিয়েই নাটিকার আখ্যান-ভাগ রচিত। অভিনয় কিন্তু খুবই চমৎকার হয়েছিল, বিশেষ করে দর্জাল গৃহিনীর ভূমিকার বিমলা বাকায়ার অভিনয়। ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও এঁর অভিনয় স্বাচ্ছন্দ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা থেকে আমরা সেদিন বন্ধুবর বিজন ভট্টাচার্য্যের "আগুন" নাটিকাটি অভিনয় করি। পাঞ্জাবের মত বাংলার ক্ষেত্রেও ঝগড়াটে বৌএর ভূমিকায় মণিকুন্তলা সেনের অভিনয়ের সকলেই খুব তারিফ করেন। কমুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের সভাপতি মণ্ডলীর মধ্যে ইনি ছিলেন একজন। এমন নেত্রীস্থানীয় সদস্যার সুন্দর সহজ অভিনয় সকলেরই খুব আশ্চর্য লেগেছিল। এছাড়া সেদিন "হই-হই-হই" নামক চাষী গেরিলার গানটি উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদের সাহায্যে করার ফলে বাংলা দলের গানের খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ে। 'আল্লা মেঘ দে, পানি দে' গানটির ছত্রে পূর্ববঙ্গের দুঃস্থ চাষীর করুণ আবেদনও সেদিন সকলের মর্ম স্পর্শ করেছিল। দেবব্রত বিশ্বাস ও বিজন ভট্টাচার্য্যের অভিনয় গীতি সত্যই চমৎকার হয়েছিল সেদিন।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার সব থেকে ভালো লেগেছিল ২৯শে তারিখের

রাতের ব্যবস্থাটি। কামগর ময়দানের একপ্রান্তে একটা মঞ্চের বন্দোবস্ত করা হয়। এরই উপরে বিভিন্ন প্রাদেশিক দল প্রায় ১০,০০০ মজুরের সামনে তাঁদের নিজ নিজ নাচ গান করেন। সর্দার জাফরী ও শ্রীজাম্বেকার মাইক্রোফোনের সাহায্যে যথাক্রমে হিন্দী ও মারাঠী ভাষার গান ও নাচের মর্ম আগেই মজুরদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। অন্ধ্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, বাংলার দল তাদের বিচিত্র নৃত্যগীত উপস্থিত করলেন তাদেরই সামনে যারা এতদিন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। আশ্চর্য্য এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সুদীর্ঘ অনুষ্ঠান শেষ হয়, ততক্ষণ সেই 'অসংস্কৃত' "Lower depths" -এর বাসিন্দারা মুষলধারে বর্ষণ সত্ত্বেও নিজ নিজ আসনে অচঞ্চল ছিল—শিক্ষিত মধ্যবিত্তসুলভ অশোভন হুড়োহুড়ি করার মত 'মার্জিত রুচি' তখনও তাঁরা আয়ত্ব করতে পারেনি।

পরের দিন অর্থাৎ ৩০শে বিকেলে আমরা আবার কলকাতার ফিরতি পথে পাড়ি দিলাম। ক'দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা কথাই ক্রমাগত মনে হচ্ছিল। কথাটি শ্রীযুক্ত চারীর—

'A new culture is rising before our very eyes, a culture shaped on the anvil of inescapable necessity and under the hammer blows of the Communist Party of India."

('অরণি', ২৫শে জুন, ২ রা ও ৯ই জুলাই, ১৯৪৩)

সাহিত্য ও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা

রবীন্দ্রনাথ একবার এক চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন—'জানি না আমার সাহিত্যের ভবিষ্যত মার্ক্সসিসমের কোন অতলে !'

কথাটা ভেবে দেখবার—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের বলেই। ঐ চিঠিতে ও আরো সবিস্তারে 'রাশিয়ার চিঠিতে' তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন ব্যষ্টি-সমষ্টি সমস্যার। সোভিয়েটের অকৃত্রিম বন্ধু হলেও এ বিষয়ে তাঁর খট্‌কা ছিল মনে—বিশেষ করে এমন সন্দেহ ছিল যে পরিকল্পনার নামে হয়ত মানুষের মানসিক সৃষ্টির উপর রাষ্ট্রের বেশ খানিকটা জুলুম চলতে পারে সমাজতন্ত্রের আমলে।

অথচ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েট পরিকল্পনার আশ্চর্য সাফল্যের কথা নানা প্রসঙ্গে তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন মুক্তকণ্ঠে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এই রকম দ্বিধান্বিত দৃষ্টি শুধু তাঁর একারই নয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা planning-এর গুরুত্ব আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। কংগ্রেসের উদ্যোগে 'জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি' প্রতিষ্ঠা ও বহু দায়িত্বশীল নেতাদের সাম্প্রতিক বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে রাষ্ট্রনেতাদেরও ওদিকে নজর পড়েছে।

কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের রাজ্যে *laissez faire* নীতির গৌরব আজও অম্লান। সেখানে পরিকল্পনার উল্লেখ হলেই কথা ওঠে জবরদস্তির, ফরমাইসী সাহিত্য বা শিল্পের অসারতার আর regimentation-এর। বলা হয়, মানুষের বৈষয়িক জীবনে শৃঙ্খলা আনবার জন্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন থাকলেও মনন-শীলতার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা মাত্রই ফলের দিক থেকে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সেখানে তাই পরিকল্পনার মূল্য হয় যৎসামান্য, নয়তো একেবারেই নেই, কিম্বা আরো সোজাসুজি পরিকল্পনা মাত্রই ক্ষতিকর।

মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন সম্পর্কে কেন এই দু'রকম বিচার ?

এর পিছনে অনেকটাই হল ভুল বোঝার ফল। 'পরিকল্পনা' শব্দটার মধ্যে কোন যাদু নেই। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও সেটা যেমন মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে তেমনি আবার অমঙ্গলেরও হেতু হতে পারে। আসল কথা হল, পরিকল্পনা হচ্ছে কার স্বার্থে আর নিয়ন্ত্রণ করছে কে ? দেশের মুষ্টিমেয় জনকয়েক

মুনাফা-শিকারীর স্বার্থই যদি বড় হয় তবে হাজার পরিকল্পনাতেও সমাজের অধিকাংশ মানুষের দুঃখ এক তিল ঘুচবে না—বরং বাড়বে। যুদ্ধের মাতলামিতে দেশকে মাতিয়ে ফ্যাসিস্টরাও তো সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করেছিল জাতীয় পরিকল্পনার নামে—মজুর আন্দোলন তথা দেশের সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখাও হয়েছিল ঐ পরিকল্পনার দোহাই পেড়ে। আমেরিকা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতির অজুহাতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কন্ঠরোধ করার চেষ্টা চলে একদিকে আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ নীতির নামের আড়ালেই পারমাণবিক শক্তি রহস্যের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখার ব্যবস্থা হয় তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় জনকয়েক টাকাওয়ালা লোকের স্বার্থে নয়, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য দেশের সমৃদ্ধি সাধন ঘটানো হয়। অন্তত এই দিকে সমাজতন্ত্রের সাফল্য কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ হয়েছে—এ কথা এদেশের বুদ্ধিজীবী মহল মোটামুটি মেনে নিয়েছে।

কিন্তু তখনই আবার প্রশ্ন ওঠে সোভিয়েট সাহিত্য নিয়ে। সেখানকার পরিকল্পনার পরিসর যদি মানুষের বৈষয়িক জীবন থেকে শুরু করে তার মানসজীবন পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তবে সোভিয়েট সাহিত্যের সার্থকতার মাত্রা দিয়েই কি যাচাই হবে না রবীন্দ্রনাথের সংশয়ের যাথার্থ্য অথবা ভ্রান্তি? সত্যই কি সেখানকার সাহিত্যিক ফসল অতটাই চোখ-ঝলসানো?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে গোড়াতেই একটা সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আমরা সোভিয়েট সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ মাত্র পাই—তাও ইংরাজী মারফৎ। এর ভিত্তিতে সুবিচার প্রায় অসম্ভব। তবু যা মেলে তার মূল্য কম নয়—বিশেষ করে সংস্কৃতির নানা বিভাগে সোভিয়েটের প্রাণোচ্ছলতা সত্যই আশ্চর্য।

এ ছাড়া আরো একটা কথা আছে—একেবারে গোড়ার কথা। নূতন সমাজ ব্যবস্থা পত্তন হলে **সঙ্গে সঙ্গেই** তার ভিত্তিতে নূতন ও উন্নততর সংস্কৃতি স্বতোৎসারিত হবে—এ যুক্তি মার্কসবাদের নয়। এতো সরাসরি ছক-মাফিক সিদ্ধান্ত যান্ত্রিক দৃষ্টিকোনেরই পরিচায়ক। এরই ফলে বামপন্থী আতিশয্যে অনেক সময় সমস্ত অতীত সাহিত্যকে 'ফিউডাল' বা 'বুর্জোয়া' আখ্যা দিয়ে 'সর্বহারা সাহিত্যে'র তুলনায় তাকে হেয় বলে ঢালা রায় দেওয়া হয়ে থাকে। এর ভ্রান্তি এইখানেই যে, এই যুক্তিতে সমাজ-মানসের উপর সমাজ-ব্যবস্থার প্রচন্ড প্রভাবের

'পরেই জোর একান্ত ভাবে দেওয়া হয়—সমাজ মানসও যে সমাজ-ব্যবস্থাকে কতটা প্রভাবিত করে সে-কথা প্রায় উপেক্ষিতই থাকে। তাই এ আশঙ্কা অস্বাভাবিক নয় যে, পরিকল্পনার নামে বুঝি জবরদস্তি চলবে সমাজ মানসকে সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার উদ্দেশ্যে।

আসলে কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজ-মানস হাত ধরাধরি করে, একত্রে পা মিলিয়ে চলে না। তাদের গতিহার অসমান; কখনও মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তা বা কল্পনার দৌড় সমসাময়িক সমাজের সমস্ত সম্ভাবনাকে ছাপিয়ে বহুদূর এগিয়ে যায়—যেমন ঘটেছিল ইউটোপিয় সমাজতান্ত্রিক বা প্যারিস কম্যুনার্ডদের বেলায় বা এদেশে রামমোহনের ক্ষেত্রে (অবশ্য সেই ছাপিয়ে যাওয়ার দৌড়েরও সীমা আছে কারণ মার্ক্সের ভাষায়—উত্তর যোগাবার সরঞ্জাম বাস্তবক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলে তবেই প্রশ্ন উঠতে পারে)। তারপর আসে সমাজবিপ্লব—গড়ে ওঠে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা যার প্রশস্ততর পরিসর সাময়িকভাবে সমাজ মানসকে পিছনে ফেলে যায়। মানুষ তখন নতুনের সব কিছু সম্ভাবনাকে পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ত করার জন্য মাথা খাটাতে ও গা ঘামাতে উঠে পড়ে লাগে—ঠিক যে ব্যাপার এখন চলছে সোভিয়েটে। অর্থাৎ সমাজ মানস কখনো পশ্চাৎপদ সমাজ-ব্যবস্থার অগ্রগতির প্রতীক্ষায় থাকে—কখনো আবার সমাজ-ব্যবস্থা তুলনায় অনগ্রসর সমাজ মানসের প্রগতির মুখ চেয়ে অপেক্ষা করে।

সোভিয়েট সাহিত্যের মূল্য বিচার করার সময় এ কথাটি মনে রাখা দরকার। উন্নততর সমাজের সাহিত্যিক প্রতিফলন এখনো আশানুরূপ না হলেই অসহিষ্ণু হলে চলবে না। বরঞ্চ ইতিমধ্যেই সেখানে যে পরিবর্তন এসেছে তাই লক্ষ্যনীয়। বিপ্লবের ঠিক পরে সোভিয়েট সাহিত্যে মিলত বাস্তব ঘটনার যথাযথ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। নিরক্ষরতার দেশে প্রথম অক্ষর জ্ঞান এলে হঠাৎ আত্ম-সচেতন মানুষের পক্ষে এ-রকমটাই স্বাভাবিক। লেখকদের পক্ষেও নিপীড়িত শ্রেণীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের প্রথম উত্তেজনায় এইভাবে মানুষের বাইরের দিকটার প্রতি একান্ত দৃষ্টিপাতও মোটেই আশ্চর্যের নয়। কিন্তু ক্রমে যখন সোভিয়েটের মানুষ বিপ্লবের তাৎপর্য আত্মস্থ করতে লাগল তখন এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের জায়গায় এলো ইতিহাসবোধ-সমৃদ্ধ সাহিত্য। এ স্তরে মানুষ নিজেকে নূতন অবস্থায় আবিষ্কার করার প্রাথমিক চমক কাটিয়ে পূর্বতন ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চায় আর তারই মধ্যে দিয়ে তার

আত্মোপলব্ধিকে আরো গভীর ও ব্যাপক করার চেষ্টা করে। সোভিয়েট সাহিত্যে এখন এই ধারা চলছে। শুধু সর্বগ্রাসী বর্তমান নয়—অতীতের নানা পর্যায় এ যুগের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। প্রাচীনের সঙ্গে নূতনের এক অব্যাহত যোগসূত্র তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন যার ফলে সাহিত্যে দেখা দিয়েছে এক আশ্চর্য সঙ্গীত। আবার বিশ্বমানবের ভবিষ্য ইতিহাসে সোভিয়েট মানবের স্থান সম্পর্কে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ও এ-সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ। প্রাণচঞ্চল সোভিয়েট কথাসাহিত্যে তাই কখনো দেখি কসাক জীবনে বিপ্লবের প্রসার নিয়ে লেখা শোলোকভের উপন্যাসগুচ্ছ কখনো আলেক্সাই টলষ্টয়ের বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত মহৎ উপন্যাস, কখনো এরেনবুর্গের রচনায় অন্তর্দ্বন্দ্ব পীড়িত ফ্রান্সের পতনের মর্মান্তিক ছবি, কখনও বা জেঙ্গিস খাঁর জীবন অবলম্বনে ইয়ানের ঐতিহাসিক উপন্যাস। আগের যুগের মত এ যুগে স্থান কাল নিয়ে পক্ষপাত নেই কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে একটা সমগ্র ঐতিহাসিক দৃষ্টি।

কিন্তু এই দুই-এর কোনো পর্বেই রাষ্ট্রের তরফ থেকে লেখক বা শিল্পীর উপর কোনো সাহিত্য বা শিল্প সম্পর্কিত মত জোর করে চাপানো হয়নি। অবশ্য বিপ্লবের প্রচণ্ড আলোড়নে গোড়ার যুগে **RAPP** প্রভৃতি বিচিত্র সাহিত্যিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল। এগুলি কিন্তু ছিল বেসরকারী। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এদের উপর বিশেষ কোনো খবরদারী করা হয়নি—বরঞ্চ **Cubism, Futurism** প্রভৃতি নিয়ে অবাধে পরীক্ষা চালানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তারপর সদ্যজাগ্রত জনসাধারণের বিপুল সাংস্কৃতিক তৃষ্ণা দূর করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অপারগ হয়ে অনেক ভুয়ো প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। অনেক আতিশয্য, গোঁড়ামি ও প্রাথমিক ছেলেমানুষীর পর ক্রমে সাহিত্যিক ও শিল্পীরা নিজেরাই আবার ঠিক পথের দিশা পেলেন। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে তাঁদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে নানাভাবে—চেষ্টা চলেছে সমাজের অন্যান্য মানুষের মতো তাঁদেরও জীবনদর্শন আয়ত্ত করার পথে সাহায্য করতে। সাহিত্যে বা শিল্পে সমাজ-বিরোধী বা জনগণের স্বার্থ-বিরোধী লক্ষণ প্রকাশ পেলে রাষ্ট্র হয়ত জোর গলায় আপত্তি জানিয়েছে—অবশ্য যুক্তি দেখিয়ে। কিন্তু কোনো সাহিত্যিক বা শিল্প সম্পর্কিত মত জোর করে চালানোর জন্য সোভিয়েট সরকার কোমর বাঁধেনি—সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছে দেশের লেখক বা শিল্পী সঙ্ঘের হাতেই। বিষয়বস্তুর খাতিরে আঙ্গিককে ছোট করার চেষ্টাও হয়নি।

কবি বোরিস প্যাস্টারনাককে বরাবরই ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলঙ্করণ নিয়ে অবাধে পরীক্ষা চালাতে দেওয়া হয়েছিল। আজ সোভিয়েটের সর্বপ্রধান কবি হিসাবে তাঁর নাম সুপ্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্যাভলভের পরীক্ষা নিরীক্ষার স্বাধীনতার কথাও স্মরণীয়।

হয়ত এর পরে আসবে তৃতীয় যুগ। পূর্ণাঙ্গ সাম্যবাদী সমাজের মুখোমুখি পৌঁছে সাহিত্য তখন আবার হয়ত ব্যক্তিত্বের মূল্য-নিরূপণের কাজে লাগবে— উন্নততর সামাজিক স্তরে ব্যক্তিমানবের নানা সমস্যা নিয়ে আবার মাথা ঘামাবে।

কিন্তু সে কথা থাক। আমাদের বাংলা কথা-সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে কিছুদিন হল এখানেও লেখকেরা বস্তুনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছেন। এর সঙ্গে ইংলন্ডের সাম্প্রতিক **New Writing, Documentary Film** ও **Mass Observation** ধারার তুলনা খানিকটা চলতে পারে। বাংলা সাহিত্যে এই ধারা বহু খ্যাত, অখ্যাত সাহিত্যিকের দুর্ভিক্ষ বা অন্যান্য সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে লেখবার চেষ্টার মধ্যে পরিস্ফুট। এর মূল্য কম নয়। দৃষ্টির সজীব আন্তরিকতা, কথোপকথনের স্বাভাবিকতা ও আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে একাগ্র উৎসাহ—এ সবই হল এ ধরণের রচনার মস্ত গুণ।

কিন্তু তবু এ হল জীবনের বহিরাবয়বের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণ। এ ধরনের সমস্ত রচনাই—ছোট গল্প, উপন্যাস, এমন কি, কবিতা—সবই হল আসলে **reportage**-ধর্মী। এর রচয়িতাদের সাধনা হচ্ছে নির্লিপ্ত থাকার। তাই তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করেন সব রকম নাটকীয়তা বর্জনের। কেউ কেউ আবার চেষ্টা করেন যথাসম্ভব সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রচার চালানোর 'অপবাদ' থেকে মুক্ত থাকতে। অধিকাংশ সময়েই তাই এই ধারা হয়ে ওঠে মানুষের সাম্প্রতিক দুর্ভাগ্যের সাহিত্যিক প্রকাশ। ফলে মোটের উপর অনেক সময়ই সৃষ্টি হয় বেশ খানিকটা হতাশার। তা ছাড়া কল্পনাপ্রবণ পাঠক ও সাহিত্যিকদের তরফ থেকে অভিযোগ আসে সাহিত্যের রাজ্য থেকে কল্পনা শক্তির নির্বাসনের। রবীন্দ্রনাথের মত আরো অনেকেই আশঙ্কা করেন যে এর ফলে সাহিত্য রচনা হবে না, হবে ঘটনার **photography** কিম্বা পরিকল্পনার নামে—'স্বাভাবিকতার' নামে চলবে ছক-মাফিক সাহিত্য সৃষ্টি।

কিন্তু এই 'অতি-স্বভাবাবিকতার' স্তর পেরিয়ে যে সামাজিক বাস্তবতাবোধ—ঘটনার বহিরাবয়ব নয়, তার অন্তর্নিহিত সামাজিক সত্য উদ্ঘাটনের স্তরের আসন্নতার লক্ষণও ক্রমে পরিস্ফুট হচ্ছে। তারাশঙ্করের **'regional novel'**

বা 'আঞ্চলিক উপন্যাস', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন ধরনের ছোট গল্প, সতীনাথ ভাদ্দ্ড়ীর সাম্প্রতিক ঔপন্যাসিক উদ্যম, বিজন ভট্টাচার্যের গণনাট্য সৃষ্টিই এখন পর্যন্ত এই ধারার সার্থকতম প্রয়াস। সাহিত্যের দরবারে নবাগত সুভাষ মুখোপাধ্যায় (আমি কবি সুভাষের কথা বলছি না) প্রভৃতি কয়েকজন সাম্যবাদী সাহিত্যিক-সাংবাদিকের নতুন ধরনের দক্ষ reportage রচনার মধ্যেও এই দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছবার প্রতিশ্রুতি আছে। অবশ্য অখণ্ড সাহিত্যিক সার্থকতা এখনও পাওয়া যায়নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভাঙাগড়াই চলছে। সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টার মধ্যে দিয়ে আর সে ব্যবস্থা পরিবর্তিত হবার পরে হয়ত মহত্তর সাফল্যের সন্ধান মিলবে।

কিন্তু সমাজব্যবস্থার যেই পরিবর্তন ঘটবে মানুষের খাওয়া পরার ভাবনা যেই ঘুচবে—অমনি সঙ্গে সঙ্গে যে যা ভাববে বা করবে সবই হবে অভ্রান্ত—এ দাবী মার্কসবাদীর নয়। তাঁদের বক্তব্য শুধু যে ধনতান্ত্রিক সমাজে অন্য সব কিছুর মত সত্যানুসন্ধান বা রূপসাধনার যে সুযোগ জনকয়েক অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানের কপালে জোটে সমাজতন্ত্রে তা সবারই মিলবে। সামাজিক কর্মকাণ্ডের পরিধি হবে ব্যাপকতর। ধনী নির্ধনের সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগীর মনে—অবশ্য তাঁর মন যদি যথেষ্ট সংবেদনশীল হয়---যে আত্মধিক্কার বা অপরাধবোধ থাকা স্বাভাবিক, তার থেকেও তখন মুক্ত হবে শিল্পী সাহিত্যিক।

সমস্ত দ্বন্দ্ব বা বিরোধের অবসান অবশ্য তখনও ঘটবে না। ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির একটা মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে যা তখনও থাকবে ('দ্বন্দ্ব' শব্দটি অবশ্য **dialectical** অর্থে ব্যবহার করছি)—সমাজের কণা হিসাবের মানুষের সঙ্গে ব্যক্তির। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব। ঠিক তেমনই প্রগতি ও পরিকল্পনার মধ্যেও থাকবে দ্বন্দ্ব কারণ মানুষের হাতে উৎপাদিকাশক্তির বিকাশ ঘটলেই তার সঙ্গে সব থেকে নিখুঁত পরিকল্পনার ছকেরও একটা লড়াই বাধবেই। তৃতীয়ত, মানুষের চেতন মন ও তার অজানিত অভিজ্ঞতাজাত অবচেতনের অবরুদ্ধ বাসনা কামনার মধ্যেও বিরোধ আছে। এর ভিতর দিয়েই বিকশিত হয় মানুষের ব্যক্তিত্ব। আর্টের কাজ বিশেষ করে এই বিরোধের বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আনা—বুদ্ধি ও কল্পনার মধ্যে সঙ্গতি সৃষ্টি। কিন্তু এ কাজ সহজ নয়, এর জন্য শিল্পীকে করতে হয় সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের সাফল্যের জন্যই প্রয়োজন বৈষয়িক দিক দিয়ে তাঁকে সমস্ত বিরোধ ও দুশ্চিন্তা

থেকে মুক্তি দেওয়া। একটি ব্যক্তিত্ব অর্জনের ও অন্যটি ব্যক্তিত্ব নাশের সহায়ক—এই রকম দুই ধরনের বিরোধ চলতে থাকলে অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য।

সমাজতন্ত্রে সাহিত্যিক বা শিল্পী অন্য মানুষের মতো ধনতান্ত্রিক সমাজের বিশৃঙ্খলা থেকেই শুধু রেহাই পাবেন না, তিনি অংশ গ্রহণ করবেন পরিকল্পনার কাজে—এমনকি প্রয়োজন বোধে পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটাবেনও তিনিই। সামাজিক জীবন যতই মানুষের করায়ত্ত হবে ততই তার অন্তরের গভীরের যেসব বাসনা কামনার বিক্ষোভ রয়েছে, তার সঙ্গে বোঝাপড়া সহজ হয়ে উঠবে। সেই বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়েই ক্রমে দেখা দেবে নূতন, উন্নততর সমাজচিন্তা।

('পরিচয়', মাঘ, ১৩৫১)

লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে

ঘন ঘন অভ্যর্থনা সমিতির সভা বসেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুন নতুন ব্যবস্থা হচ্ছে কাজের—হয়ত ঘটনার চাপে অনেকটাই তাব বেঁকেচুরে যাচ্ছে—এমন কি বাতিলও হচ্ছে খানিকটা। কর্মকর্তারা ব্যস্তসমস্ত হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছেন এধার ওধার—অবিশ্রাম কাজ করছেন। আবার ধৈর্যচ্যুতিও ঘটছে বারবার। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের সাজসজ্জায় অভ্যস্ত পরিচ্ছন্নতার অভাব। হিসাব-বাগীশ রণজিতের কলম একটানা চলেছে পাতার উপরে নানা আঁকজোক এঁকে, মুখও তার থেমে নেই, বোঁচকা বুঁচকী নিয়ে মফস্বল থেকে প্রতিনিধি ও শিল্পীর দল আসছেন দলে দলে। তাঁদের থাকা-খাওয়ার আয়োজন করতে করতে অফিস সম্পাদক নাজেহাল। চিত্র প্রদর্শনীর কাজে আকণ্ঠমগ্ন মণি রায়ের মন দুরন্ত উল্লাস থেকে চূড়ান্ত হতাশা পর্যন্ত, সব কটা পর্দা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে বারবার। খেটে খেটে গণনাট্য সম্পাদকের চুল উত্তাল হয়ে উঠল।

আমন্ত্রণ-লিপিতে সম্মেলনের যে কাজের তালিকা পাওয়া গেল তার প্রথমেই ছিল ২রা মার্চ ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে "আমার দেশ" শীর্ষক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন। উদ্বোধন করলেন লক্ষ্ণৌ-এর শ্রীযুক্ত অসিত হালদার। শিল্পীকেও যে আজ চারিপাশের জীবন থেকে রসদ সংগ্রহ করতে হবে, একথা তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেল। প্রদর্শনীতে অতুল বসু, রমেন্দ্র চক্রবর্তী, জয়নুল আবেদীন থেকে আরম্ভ করে ছোটবড় বহু শিল্পীর প্রায় আড়াইশ' ছবি স্থান পেয়েছিল। মাটির কাজ, ঢাকাই মসলিন প্রভৃতি শিল্পের নিদর্শনও বাদ পড়েনি। সব কিছুর মধ্যে দিয়েই মোটামুটি রূপ দেবার প্রয়াস হয়েছিল এ দেশের—যে দেশ যন্ত্রণায় কাতরায়, রোগে ভোগে, দুর্ভিক্ষে ধোঁকে, অনাহারে মরে অথচ ঐসব মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে দিয়েও যে দেশ হাসে, ভালোবাসে, বাঁচে। আয়োজনের দিক থেকে প্রদর্শনীর ত্রুটি ছিল হয়ত কিছু কিছু। সম্মেলনের অন্যান্য আয়োজনের চাপে এটি চাপাও পড়ে গিয়েছিল হয় তো। তবু "আমার দেশ" কথাটার মধ্যে যে নিবিড় মমতাবোধ জড়ানো, তারই রংএ রাঙানো ছিল সমগ্র প্রদর্শনী।

শনিবার, ৩রা মার্চ মহম্মদ আলী পার্কে ঢুকবার মুখে প্রথমেই চোখে পড়ল বড় বড় হরফে লেখা "রবীন্দ্রনগর" আর ভিতরে ঢুকেই দেখলাম "সোমেন চন্দ তোরণ"। চরম পরিপূর্ণতার বনস্পতির পাশে সামান্য অঙ্কুরের প্রতিশ্রুতিকে এইভাবে তুলে ধরার ব্যঞ্জনা আমার কাছে বোধ হল অত্যন্ত গভীর। মনে হল বিপুল রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে এগিয়ে নেওয়ার পথে সোমেন চন্দর আত্মদানের আদর্শ সমগ্র সম্মেলনের মেজাজকে একটা উঁচু ঠাটে বেঁধে দিয়ে গেল।

সম্মেলন মণ্ডপটি হয়েছে চমৎকার—যেমন প্রশস্ত তেমনই পরিপাটি। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, গর্কী প্রভৃতি দেশী ও বিদেশী মনীষীদের ছবিতে মণ্ডপটি সাজানো। দু'ধারে চেয়ার, মাঝখানে শতরঞ্জিতে প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য ও দর্শকদের বসবার জায়গা—দু'পাশে ও পিছনে গ্যালারীতে। মণ্ডপের পাশেই বই-এর দোকান, অভ্যর্থনা সমিতি ও ভলান্টিয়ারদের অফিস—আর সম্মেলনের সর্বাঙ্গীণতা সাধনের চূড়ান্ত উপাদান হিসাবে—চায়ের দোকান। এর জনপ্রিয়তা বাস্তবিকই মাঝে মাঝে এতই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল যে, সভামণ্ডপ থেকে কড়া রকমের তাড়া আসছিল হল্লা বন্ধ করার। অবশ্য যাঁরা তাড়া দিচ্ছিলেন অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁদেরও এরই আশেপাশে দেখা যাচ্ছিল।

বিকেল চারটেয় আরম্ভ হ'ল অধিবেশন। মঞ্চের পরে সভাপতিমণ্ডলীর নির্দিষ্ট আসনে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর মত কথাসাহিত্যিকদের পাশে দেখা গেল মুর্শিদাবাদের শেখ গোমহানীর মত লোককবি ও মৃৎশিল্পী পশুপতি ভট্টাচার্যকে। এই সমাবেশের তাৎপর্য খুবই গভীর। কারণ, বাংলার মধ্যশ্রেণীর সংস্কৃতি আর গ্রামের লোক-সংস্কৃতি—সচেতনভাবে এ দু'য়ের মিলন ঘটানোর চেষ্টা অন্তত এদিক দিয়ে বোধ করি এই প্রথম। আর একটি কথা। লোক-শিল্পীদের এখানে ডাক পড়েনি সম্মেলনের একটা আনুষঙ্গিক মাত্র হিসাবে বা শুধু শোভা বর্ধন করতে। এখানে তাঁরা এলেন শহুরে সংস্কৃতিবিদদের সমকক্ষ ও সাথী হিসাবে—শিখতে ও শেখাতে। সমগ্র সম্মেলনের মধ্যে এটি ছিল মূল সুর; কারণ ঘা খেয়ে খেয়ে এ বোধ আজ জাগছে যে ক্ষীণপ্রাণ মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটানো। গ্রাম ও নগরের অন্তরকে একসূত্রে বাঁধবার এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেল সম্মেলনের কাছে শেখ গোমহানী সাহেবের পরিচয় প্রদান উপলক্ষে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক ভাষণে। কবিওয়ালাদের সঙ্গে তারাশঙ্কর বাবুর যোগ হৃদয়ের। বিশেষ করে

গোমুহানী সাহেবের গুণমুগ্ধ বন্ধু তিনি। তাই বাঙলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মুখে গ্রাম্য এক লোককবির অকুণ্ঠ প্রশস্তি থেকে বোঝা গেল যে দু'টো সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের জিনিসকে বাইরে থেকে আলগাভাবে জোড়া দেবার কৃত্রিম চেষ্টা এ নয়—তাগিদ আসছে এখানে অন্তর থেকেই।

এর পরে শেখ গোমুহানীর সভাপতির ভাষণ এ সন্ধ্যার সব থেকে উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। বাইরে থেকে এঁকে অতিশয় সাধারণ মানুষ বলে বোধ হয়। শুধু তাঁর গভীর কোটরগত চোখ জোড়ার ঔজ্জ্বল্য আশ্চর্য। এই মানুষটি যেই বক্তব্য শুরু করলেন তখনই কিন্তু বুঝলাম যে, সামান্য অশিক্ষিত চাষী বলে আত্মপরিচয় দিলেও অল্পের মধ্যে গুছিয়ে বলার দিক থেকে তিনি যে কোন শহুরে বক্তারও আদর্শ। গ্রাম ও শহরের মধ্যেকার অন্তরের বিচ্ছেদ একই সঙ্গে কতটা মর্মান্তিক ও হাস্যকর তাঁর সহজ, অনাড়ম্বর কথায় তারই সুন্দর প্রকাশ দেখলাম। হঠাৎ বক্তৃতা থামিয়ে তিনি শুরু করলেন পদরচনা। মনে হ'ল কবির উপযুক্ত ভাষণ বটে। দ্রুত রচনার চমক ছাড়াও তাঁর কবিত্ব শক্তি সত্যই অদ্ভুত। হিন্দু-মুসলমান, ধনী-নির্ধন, শহর-গ্রাম নির্বিশেষে দেশবাসী মাত্রেরই দেশসেবার সহজাত অধিকার ঘোষিত হল তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে। একটি কলি বার বার ঘুরে ফিরে আমার মনে পড়ছে—"আমার বুকের রক্তে হো'ক মা তোমার পায়ের আলপনা।"

সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর ক্ষুদ্র লিখিত ভাষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ন যুক্তিসমৃদ্ধ বক্তৃতার পর মূল সভাপতি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অল্প দু'চারটি কথা বলেন। কি ভাবে সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষকালে কয়লাখনির রসাতল-বাসিন্দাদের জীবন তাঁর কাছে সাহিত্যিক প্রকাশের দাবী জানায়—তারই ইঙ্গিত পাওয়া গেল তাঁর কথায়। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটির আন্তরিকতা সত্যই সকলের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

ব্যক্তিগত হলেও আরও দু'টি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। চায়ের দোকানে বসেছিলাম। লাউড-স্পীকারে কানে আসছিল নানা প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিনন্দন। মামুলী বলে খুব মনও হয়ত দেইনি সেদিকে। হঠাৎ শুনলাম আয়ার্ল্যাণ্ডের বিখ্যাত নাট্যকার, সিয়ান ও'কেসী লিপি মারফৎ সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন:

"I send you an Irish greeting, send it surging through your own drum-beat and the sound of Indian bugles blowing. Soon the people of India will be solving their own problem as they

alone can solve them ; with full power in their hands, firmer resolution in their hearts and a hard but bright path stretching out before to a great future...A new Asia, with India and China leading, will bring about a civilisation justifying itself to God and man. May that day come swift for the world's sake"—মনটা মুহূর্তে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল ভবিষ্যতের স্বপ্নে। হঠাৎ একটা খুব চেনা, পুরোনো সুরে চমক ভাঙল। এগিয়ে গিয়ে দেখি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের পরিচালনায় বাংলা গণনাট্য-সঙ্ঘের ছেলে মেয়েরা গাইছে গোবিন্দ রায়ের "কতকাল পরে, বল ভারতরে, দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে"। "পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে" গানের এই কলিতে এসে কেন জানি আমার চোখের পাতা আপনা থেকেই ভিজে এল।

৪ঠা, রবিবার সকালে সম্মেলন মণ্ডপে বসল গানের আসর। এখানে এল বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে নানা গানের দল যারা সারি, জারী, ভাটিয়ালীতে দেখতে দেখতে আসর জমিয়ে ফেল্ল। দেশের মাটির গন্ধ এ সব গানের ছত্রে ছত্রে। মাঝে মাঝে আবার বাংলার গণনাট্য দল পুরোনো জাতীয় গানও গাইলেন যার সুর ১৯৪৫ সালের শ্রোতাদের সঙ্গে আবার যেন নতুন করে ১৯০৫ সালের পরিচয় ঘটাল।

রংপুরের অন্ধ বাদক, টগর অধিকারীর কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। সামান্য দোতাবার সাহায্যে যে এমন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি সম্ভব, কানে না শুনলে একথা মানতাম না। বাজানো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরস্কার ঘোষণার ধুম পড়ে গেল চারিদিক থেকে। অনুরোধের তাগিদে দুবার বাজালেও বোঝা গেল অনেকের মনে তখনো ক্ষোভ রইল আরো না শুনতে পাওয়ায়। কিন্তু এত জেলার শিল্পী সমাবেশ হয়েছিল যে বেশী সময় দেওয়া সম্ভব হল না। এমনিতেই দু'তিনটি জেলাকে বাধ্য হয়ে বাদ দিতে হ'ল সেদিনকার অনুষ্ঠান থেকে। এক্ষেত্রেও হয়ত বন্দোবস্ত আরো কিছুটা ভাল হতে পারত।

দুপুর তিনটে থেকে চলল প্রতিনিধি সম্মেলন। এখানে সঙ্ঘের নাম পরিবর্তন, রবীন্দ্র সাহায্যভাণ্ডার, শিশু সাহিত্য, সিনেমা থিয়েটার রেডিও প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলল ও সংশোধনের পর সেগুলি গৃহীত হ'ল। মফস্বলের প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জলপাইগুড়ির ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সিলেটের কবি অশোক

বিজয় রাহা ও বাঁকুড়ার সাহিত্যিক গোপাল লাল দের নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে।

বিকেল পাঁচটা থেকে আবার প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। আগের দিন শৈলজানন্দবাবুর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার আন্তরিকতার কথা বলেছি। এদিনে তারাশঙ্করবাবুর ভাষাও ঠিক সেই আন্তরিকতার ঐশ্বর্যে সকলকে টানল। মন্বন্তর ও মন্বন্তরোত্তর সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত খুবই স্পষ্ট ও জোরালো। কিন্তু সব থেকে বড় কথা তাঁর যুক্তির তীক্ষ্নতার সঙ্গে হৃদয়াবেগের যোগাযোগ হওয়ায় সেটা উপস্থিত সকলের শুধু মস্তিষ্ককে নয়—অন্তরেও সাড়া জাগাল! মৃৎশিল্পী পশুপতি ভট্টাচার্য মহাশয়ের বক্তৃতাটিও ক্ষুদ্র হলেও উল্লেখযোগ্য।

সভাপতিমণ্ডলীর সভ্যদের ভাষণ শেষে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত, মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্মেলনকে অভিনন্দন জানালেন। জরাগ্রস্ত দেহ নিয়ে সুদূর চট্টগ্রাম থেকে এই জ্ঞানতপস্বী যে সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন—এ থেকে এই কথাটাই প্রমাণ হয় যে প্রগতি সাহিত্য ও শিল্পী আন্দোলন আজ বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে তার যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে। নদীয়ার শিক্ষাব্রতী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়ের উৎসাহও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বৃদ্ধ বয়সে তিনি যে এই আন্দোলনের মর্ম গ্রহণ করতে পেরেছেন সেটা তাঁর মনের সজীবতায়ই পরিচয় দেয়। তাঁর আন্তরিক বক্তৃতাটিও চমৎকার হ'ল।

এর পরে শুরু হল বিভিন্ন প্রস্তাবের উপরে বক্তৃতা। এর মধ্যে সঙ্ঘের নাম পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রস্তাবটির কথা বলা প্রয়োজন। বাংলা দেশের সঙ্ঘের নাম এতদিন ছিল 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'। এটি 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' ও 'নিখিল ভারত গণনাট্য সঙ্ঘ' উভয়েরই বাংলা শাখা। কেন্দ্র ও শাখার মধ্যে নামের এই বৈষম্যের কারণ এই যে, ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে যখন বাংলাদেশে জাপানী আক্রমণ প্রায় আসন্ন হয়ে ওঠে ও দেশী ফ্যাশিষ্ট-দের হাতে সোমেন চন্দ নিহত হন তখন সেই বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে বাংলা শাখার উদ্ভব হয়। সঙ্ঘের 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী' আখ্যার যুক্তিযুক্ততা ছিল সেই-খানেই। তখনও দু'টি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের একটিও* ছিল না তাই কেন্দ্র ও শাখার মধ্যে নামের সঙ্গতি রক্ষার প্রশ্ন ওঠেনি। ১৯৪৩-এর মে মাসে যখন বোম্বাই-এ ঐ উভয় প্রতিষ্ঠানেরই উদ্ভব হয় তখন বাংলাদেশের সঙ্ঘ উভয়

*১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে লখনউতে প্রগতি লেখক সংঘের উদ্ভব হলেও ঐ সময় তার বাংলা শাখাটি নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল।

ধরনের কাজই চালাচ্ছিল বলে, তাকে নিজ নাম বজায় রেখেই উক্ত প্রতিষ্ঠানেরই শাখা হিসাবে অনুমোদন করা হয়। বর্তমানে ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে অনেক আর তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী মতবাদে অবিচলিত থেকেও সঙ্ঘের নাম পরিবর্তনের। কিছুদিন আগে 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও নাম পরিবর্তনের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এই সমস্ত আলোচনা করে তাই এবারকার সম্মেলন কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সঙ্ঘের নূতন নামকরণ করল 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'।

সোমবার সন্ধ্যার অনুষ্ঠানটি এবারকার সম্মেলনে সব থেকে জনপ্রিয় হয়েছিল। এদিন মুর্শিদাবাদের শেখ গোমহানী সাহেবের সঙ্গে চট্টগ্রামের বিখ্যাত কবি রমেশ শীলের কবির লড়াই ছিল। এ পর্যন্ত সম্মেলনে কোনদিনই জনতার সংখ্যা পাঁচ ছ'হাজারের কম হয়নি—এমন কি আগের দিন সন্ধ্যায় এই পাঁচ ছ'হাজার লোকই ধৈর্যের সঙ্গে প্রস্তাব আলোচনাও শুনেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু সোমবার সন্ধ্যায় শ্রোতার সংখ্যা উদ্যোক্তাদের কল্পনাকেও হার মানাল। প্রায় দশ হাজার নরনারী শিশু রাত সাড়ে এগারোটা অবধি কবির লড়াই শুনেছে—ভাবেনি আজকের দিনের ক'লকাতার যানবাহনের অসুবিধার কথা। নেহাৎ যাদের কিছু আগে উঠতে হয়েছে তাদের আফশোস শুনেছি বারবার আর শেষ পর্যন্ত ফলাফল জানবার কৌতূহলও মেটাতে হয়েছে অনেকের তার পরদিনও।

এই ভীড়ে কারা ছিলেন? ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক, শিল্পী, অধ্যাপকের পাশে কলেজ স্কুলের ছাত্র, আপিসের কেরানী, দোকানী, কারিগর, বাঙালী মজুর আর লাউড স্পীকারের রবাহূত পথচারীর দল। এঁরা এলেন একা একা বা দলে দলে কিন্তু এসে আর নড়েননি শেষ পর্যন্ত। সত্যকার শিল্পীর শিল্প শহুরে মনকেও কি রকম দুর্নিবার টানে, এর থেকে বড় প্রমাণ আর তার কী হতে পারে?

আর একটা কথা। এই সাধারণ মানুষেরাই তো শহরের বিভিন্ন সিনেমা থিয়েটারে ভীড় জমায়, সেখানকার পীড়াদায়ক সস্তা রসে মাতে। আর সে রসের যারা পরিবেশক তারা আমাদের বোঝায় যে সস্তা না হলে কোন জিনিসই জনসাধারণের মনে ধরবে না। এ কবি গানের আসরের লোকসংখ্যা শুধু নয়—তাদের আনন্দ উজ্জ্বল মুখ দেখবার পরও কি মানতে হবে এ কথা?

গোমহানী সাহেবের কথা আগেই বলেছি। রমেশ শীলের কথায় প্রথমেই

মনে পড়ে তাঁর পাকা চুল, মুখের ঈষৎ হাসির আভাস, পাতলা ঠোঁটের সংবেদনশীলতা, চোখের প্রায় করুণ দৃষ্টি—আর এই সব মিলিয়ে তাঁর সৌম্য দর্শন। অথচ এই রমেশ শীলই যখন প্রতিপক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে মাতেন তখন তাঁর দৃষ্টি হয়ে ওঠে প্রখর, ঈষৎ স্ফুরিত নাসায় চাপা ক্রোধ বা অভিমানের অভিব্যক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর তাঁর নিষ্করুণ চাপা হাসির সঙ্গে দ্রুত বিচ্ছুরিত হয় সুতীব্র শ্লেষবাণ। আগের দিন গোমহানী সাহেবের ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলাম আজ রমেশ শীলের রচনাশক্তিতে অভিভূত হলাম।

এর পরে তিন দিন ধরে বঙ্গীয় গণনাট্য সঙ্ঘের 'নবান্ন' অভিনয় ও কেন্দ্রীয় গণনাট্য দলের 'ভারতের মর্মবাণী' নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হয় সভামণ্ডপেই। চার হাজার লোকের সামনে লাউড স্পীকারের সাহায্যে অভিনয় বা নৃত্যনাট্য দেখানোর এই চেষ্টা খুবই অভিনব, যেমন অভিনব এর সাহায্যে কবির লড়াই-এর আসর সৃষ্টি করার প্রয়াস। প্রাথমিক প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ছোটখাটো ত্রুটি সত্ত্বেও বলতে হবে এই পরীক্ষায় উদ্যোক্তারা যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছেন!

সম্মেলনের সাংগঠনিক আয়োজনেও ত্রুটি ছিল কিছু কিছু। এ রকম ব্যাপারে খানিকটা পর্যন্ত তাড়াহুড়ো, শেষ মুহূর্তে ব্যবস্থার ওলট-পালট ঘটা স্বাভাবিক। এখানেও তাই ঘটেছে মাঝে মাঝে। তবু হাজারো অসুবিধা তুচ্ছ করে হাজার হাজার দর্শক শ্রোতার দল কবিগান থেকে শুরু করে দুরূহ প্রস্তাব আলোচনা পর্যন্ত সব কিছু মন দিয়ে শুনেছে। সম্মেলন তাদের ভালো লেগেছে—কাজেও লেগেছে।

মন্বন্তরোত্তর বাংলার সমস্যা শুধু বাইরের দিক থেকে পুনর্গঠনের সমস্যা নয়। অন্তরের দিক থেকেও আমরা আজ দুঃস্থ, পীড়িত ও নিঃস্ব। সমস্ত সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির মূল কথা পরস্পরের প্রতি মমতাবোধ, একজোট হওয়ার প্রবৃত্তিও কিছুটা যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। বাংলার লেখক ও শিল্পী সম্মেলন এই দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন সাহিত্যিক শিল্পী তথা সমস্ত বাঙালীর কাছে, আর যে কার্যক্রম তাঁরা গ্রহণ করেছেন তারই মধ্যে তাঁরাও যে সেই ব্রতপালনে কুণ্ঠিত নন সে প্রতিশ্রুতি সুস্পষ্ট।

('পরিচয়', চৈত্র, ১৩৫১)

বাংলার সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন

বাংলার সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন, এ দেশের ব্যাপক সমাজ পুনর্গঠনেরই একটি অঙ্গ। একদিকে বিদেশী শাসন—অন্যদিকে জমিদারী প্রথার জগদ্দল পাথর বাংলার প্রাণশক্তিকে এতদিন দাবিয়ে রেখেছে। তাই এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির উচ্ছেদই হল অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতির মতো সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সেই প্রাণশক্তির স্ফুরণের প্রথম অপরিহার্য পদক্ষেপ। এই সহজ সত্যকে না মেনে স্বপ্নসৌধ গড়বায় চেষ্টা করলে আন্তরিকতা থাকলেও তার সাফল্য সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। এমন কি বৃহৎ সমাজ পুনর্গঠনের পৃষ্ঠপটে না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতীর' আদর্শও দেশময় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি যদিও তিনি এই দুই এর অঙ্গাঙ্গীভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। উদয়শংকরের চেষ্টাও কংগ্রেস সরকারের প্রাথমিক আনুকূল্য সত্ত্বেও এই কারণেই ক্রমে ক্রমে নিভে এল। তাই গোড়াতেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন ও এই প্রদেশে জমীদারীপ্রথার উচ্ছেদের পরে নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ—এই দুইই হল বাংলার সাংস্কৃতিক অগ্রগতির অপরিহার্য পৃষ্ঠপট।

এবার সংস্কৃতির নিজস্ব ক্ষেত্রে আসা যাক্। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে বাংলার সংস্কৃতি জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হল তার দ্বিধা বিভক্ত অবস্থা। একদিকে বহু যুগ ধরে বাংলার অসংখ্য পল্লীর বুকে বিচিত্র লোকসংস্কৃতি আজও অনেক আঘাতের পর কোনক্রমে টিঁকে আছে। অন্যদিকে রয়েছে বিদেশী ধন-অস্ত্রের স্পর্শজাত গত দু'শ বছরের শহুরে সংস্কৃতি। কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথের মত নাগরিক সংস্কৃতির বাহকগণ লোকসংস্কৃতির বিচিত্র ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার থেকে তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টির রসদ সংগ্রহ করেছেন। আবার শহুরে সিনেমা থিয়েটারের চটুল গানের সুর মফঃস্বল শহর ছাপিয়ে অনেক সময় গ্রামাঞ্চলেও সংক্রামিত হয়েছে। এ সব সত্ত্বেও মোটামুটি এ কথা বলা যায় যে শহুরে ও গ্রাম্য সংস্কৃতির ধারা প্রধানত আপন আপন খাতেই বয়ে চলেছে।

আজ আমরা দেখছে পাচ্ছি যে এই দুই ধারাই ক্ষীয়মান। পল্লীসংস্কৃতি

তার আশ্চর্য্য প্রাণশক্তির জোরে বহুশত বছরের জের টেনে কোনক্রমে টিঁকে আছে। একদা যে স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লী অর্থনীতির বনিয়াদের পরে এর বিকাশ সম্ভব হয়েছিল গত দু'শ বছরে বিদেশী ধনতন্ত্রের প্রচণ্ড সংঘাতে তার মূল উৎপাটিত হয়েছে অথচ য়ুরোপীয় দেশে যেমন পুরাতন অর্থনীতির শূন্য স্থান অধিকার করল নূতন উন্নততর অর্থনীতি, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিকূলতার ফলে এ দেশে সমাজ বিবর্তনে সেই সহজ নিয়ম খাটল না। পল্লী-সংস্কৃতি এর পর থেকে ক্রমেই ধ্বংসের দিকে চলেছে অথচ সমাজ বিকাশের সহজ নিয়মে সেই স্তর অতিক্রান্ত হয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিও পুষ্ট হয়ে ওঠেনি। সনাতন ধ্বংস হল কিন্তু নূতন এল না। তাই পদে পদে অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, কখনও হাস্যকর, কখনও করুণ নূতন-পুরাতনের সমাবেশ।

এই অবস্থায় নাগরিক সংস্কৃতিও ক্রমে বিকশিত হয়ে জাতীয় সংস্কৃতির রূপ নিতে পারল না। বাংলার "নবজাগরণ" হল অতি স্বল্পায়ু। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'নবজাগরণ' চরম সীমায় পৌঁছে সমস্ত পৃথিবীর চোখ এদিকে ফেরাতে পারল। তবু এর ভিত্তির দুর্বলতা তার পর থেকে বিশেষ ভাবেই প্রকট হয়ে উঠল। যে মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবিরা ছিল এই সংস্কৃতির স্রষ্টা ও বাহক, ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ প্রখর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দম এল ফুরিয়ে—বিশেষ করে তাদের ঔপনিবেশিক চরিত্রের জন্য। লোকসংস্কৃতির মতো শহুরে সংস্কৃতিও ক্রমে সৃষ্টির দিক থেকে নিঃস্ব হয়ে এল।

এই সংকটের অবস্থাকে আরো জটিল করে তুলেছে আজকের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। বহুদিন ধরে প্রতিবেশী হিসাবে পাশাপাশি বাস করলেও—এমন কি এক ভাষাভাষী হয়েও এ দুইএর মধ্যে কোন সত্যকার অন্তরের যোগ গড়ে ওঠেনি। হয়ত কখনও দুই সমাজ বিদ্বেষবুদ্ধি আচ্ছন্ন না হয়ে খানিকটা মৈত্রীর পথে এগিয়েছে কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রয়ে গেছে বরাবরই। আজকের দিনের রাজনৈতিক কলহের তীব্রতার কথা বাদ দিলেও মানতে হবে যে হিন্দু মুসলমান রয়ে গেছে পরস্পর থেকে বহুদূরে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর ফল হয়েছে মারাত্মক, বিশেষ করে নাগরিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। কারণ পল্লী সংস্কৃতিতে হিন্দু মুসলমান কৃষকের মন যদি বা পরস্পরকে খানিকটা ছুঁয়েছে—হিন্দু মধ্যবিত্তের প্রাধান্যের জন্য শহরে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানের ছাপ প্রায় নেই। আজো কোন হিন্দু লেখক মুসলমানের সামাজিক জীবন নিয়ে সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি মুসলমান সাহিত্যিকও পারেন নি প্রতিবেশী সমাজের সাহিত্যিক প্রতিফলনে

সফল হতে। এর ফলে সাহিত্য যে বেশ খানিকটা একপেশে হয়ে পড়েছে, একথা মানতেই হবে। দুর্ভাগ্যবশত শরৎচন্দ্রের মুসলমান জীবন নিয়ে লিখবার প্রতিশ্রুতি অপূর্ণই রয়ে গেল।

বাংলার সংস্কৃতির সঙ্কট আরো ঘোরালো হয়ে উঠেছে গত কয়েক বছরে। দুর্ভিক্ষের কবলে প্রাণ হারিয়েছেন বহু লোকশিল্পী, আরো অনেকে শিল্পধর্ম-ভ্রষ্ট জীবনের বিড়ম্বনা ভোগ করছেন অশেষ দারিদ্র্যের মধ্যে। শহুরে সংস্কৃতির বাহক—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখক ও শিল্পীও অনেকে হয় দুর্গত জীবন যাপন করছেন, নয়ত, বড় বড় প্রকাশক প্রতিষ্ঠান, সিনেমা কোম্পানী, সংবাদপত্র সত্ত্বাধিকারী বা বেতার প্রতিষ্ঠানের খপ্পরে গিয়ে পড়ছেন। সেখানে খেয়ে বাঁচছেন তাঁরা—এমন কি দু'চারজন ভাগ্যবান হয়ত মোটা টাকাই কামাচ্ছেন। কিন্তু এর ফলে তাঁরা হয় সৃষ্টির দিক থেকে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন—কিম্বা চমক-লাগানো নয়ত গতানুগতিক নিষ্প্রাণ সাহিত্য বা শিল্প রচনা করে চলেছেন। বাংলার সংস্কৃতি জীবনের 'পরে এ এক প্রচণ্ড আঘাত।

এর চেয়েও বড় বিপদের কথা এই যে গত কয়েক বছরে আমরা সংস্কৃতিসৃষ্টির মূলে যে একটা সাধারণ সামাজিক মূল্যবোধ থাকে, সেটিও হারাতে বসেছি। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ হলেও এতদিন খানিকটা জীবন্ত ছিল। কিন্তু আজ সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মত লোককেও জেল থেকে বেরিয়ে এসে ভাবতে হয়, কেন প্রতি শ' বাঙালীর মধ্যে ৯০ জন বাকী ১০ জনকে বাঁচাতে পারল না। যে বাঙালীর সঙ্গে সতীশবাবু পরিচিত, এ কয়েক বছরে কিন্তু সে-সব চরিত্রে বেশ কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। একদিকে নৃশংস অর্থলোলুপতা মানুষের জীবনের মূল্যে মুনাফা ফাঁপিয়ে তুলেছে নানা অসামাজিক পথে। অন্যদিকে অসহায়তারও যেন সীমা পরিসীমা নেই এদেশে। এই অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ-ঝলকানির মত কতগুলি মহাপ্রাণ তরুণের রক্তে রাজপথ রাঙা হলেও কলঙ্ক মোচন হয়নি—সাবেকী সামাজিক বিবেকেরও পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়নি।

বাংলার শিক্ষা সংকটের কথা এই প্রসঙ্গে ওঠে। দুর্ভিক্ষ প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে প্রাইমারী শিক্ষার পরে। স্কুল ও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উচ্চতর শিক্ষাও যে অক্ষুণ্ন থাকেনি, তার প্রমাণও পাওয়া যায়। যে সামাজিক মূল্যবোধ-হীনতার কথা আগেই বলেছি তার অন্ধকারেই মধ্যবিত্ত

পরিবারগুলিতেই ছাত্রেরা বড় হয়। কাজেই সেখানকার রুচিবিকার যে তাদেরও গভীরভাবে স্পর্শ করবে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে। তাই সংস্কৃতি-জীবনের বর্তমানই শুধু বিড়ম্বিত নয়, সুপরিচালিত সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস না হলে তার ভবিষ্যতও অন্ধকার।

সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন তবে হবে কোন পথে? আগেই বলেছি এটি একটি বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। যে সব অত্যাবশ্যক রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের নাড়ীর যোগ সেগুলির বিশদ আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। শিক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে শুধু বলা যেতে পারে যে বাংলা দেশের পুনর্গঠনকে কেন্দ্র করেই নূতন শিক্ষাপ্রণালী রচনা করতে হবে। ভাসা ভাসা, আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বায়বীয় শিক্ষার জায়গায় যদি এইভাবে প্রত্যক্ষ সমস্যাকে সামনে রেখে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যায় তবে আগামী দিনের সংস্কৃতিজীবন সমৃদ্ধ হতে বাধ্য। এমন কি বিদেশী ইতিহাস, দর্শন বা বিজ্ঞান চর্চারও মুখ যদি এদিকে ফেরানো যায় তবে তার বিদ্যায়তনিক (academic) মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবেনা, বরঞ্চ জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠবে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে।

শিক্ষার আর এক প্রধান দিক হওয়া উচিত আমাদের জাতীয় ইতিহাস চর্চা। আমাদের সামনেকার সমস্যা অতি বিপুল সন্দেহ নেই কিন্তু তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হলে যে চরিত্রের প্রয়োজন তা' গড়বার অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে এই। তবে এ ক্ষেত্রেও পুরাতনের চর্চা শুধু বিলাসমাত্র হয়ে যাতে সর্বসাধারণের ভয়ের উদ্রেক না করে তার জন্য সাবধান হওয়া দরকার। বর্তমানের তাগিদেই অতীতের অনুধাবন প্রয়োজন। দেশের মাটি থেকে যে সংস্কৃতি এতদিন ধরে গড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন, সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায় হতে পারে। সাহিত্য পরিষদ, রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, সায়েন্স এসোসিয়েশন, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, বিশ্ব ভারতী, কলিকাতা মিউজিয়ম, আর্ট স্কুল, ওরিয়েন্টাল স্কুল অফ আর্ট, বসু বিজ্ঞান মন্দির, সায়েন্স কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি যে প্রতিষ্ঠানগুলি গত দেড়শ' বছরের বাঙালী মানসকে রূপ দিয়েছে, তার সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ঘটাতে হবে—তাদের মনে এগুলি সম্বন্ধে যে ভয় ও দূরত্ববোধ আছে তা' দূর করতে হবে। এর জন্য পুস্তিকা প্রকাশ বা উপযুক্ত, ওয়াকিবহাল ব্যক্তিকে দিয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে যা'তে দেশের উন্নতির সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানগুলির

কাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা জন্মাতে পারে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৃহৎ জাতীয় পরিকল্পনার আর এক অঙ্গ হওয়া উচিত বিদ্যায়তনের বাইরে জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকের যোগাযোগ। যে শহরে বা গ্রামে বিদ্যালয়ের অবস্থিতি, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর শিক্ষক ও ছাত্রদের জানা চাই। শুধু জ্ঞান আহরণ নয়—বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনও এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। নৈশবিদ্যালয় মারফৎ এইভাবে শিক্ষা বিস্তার, গণনাট্য বা গানের সাহায্যে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা কিম্বা রোগ-নিবারণ বা চিকিৎসার চেষ্টাও চলতে পারে। এ থেকে ছাত্র কি শিক্ষকেরাও প্রত্যক্ষভাবে জীবন থেকে পাঠ গ্রহণ করতে পারবেন ও সেই শিক্ষা প্রয়োগ করতেও শিখবেন।

এইভাবে বিদ্যায়তনের চার দেওয়ালের বাইরের শিক্ষা অন্যত্রও হতে পারে। বাংলার বহু ঐতিহাসিক সহর বা গ্রাম, বহু প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পকেন্দ্র, মহাপুরুষের জন্ম বা বাসস্থানে ছাত্রদলের ভীড় হওয়া চাই। অবশ্য সঙ্গে এমন লোক থাকা চাই যিনি এ সম্পর্কে দু'কথা বলতে পারেন। মিউজিয়াম, চিত্র-প্রদর্শনী দেখানোর সঙ্গে ছাত্রদের স্থানীয় বিখ্যাত লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গেও পরিচয় ঘটাতে হবে।

কিছুদিন থেকে বিশ্বভারতী থেকে 'বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ' ও 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য পরিষদও 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা,' প্রকাশ করে দেশের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। এই ধরনের গ্রন্থমালার জনপ্রিয়তা আরও বহুগুণ বাড়ানো দরকার এবং সংস্কৃতির অন্যান্য দিকেও এই ধরনের কাজ প্রসারিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলিকে কেন্দ্র করে সর্বত্র পাঠচক্র গড়ে তুলতে হবে যেখানে পাঠগ্রহণে একের অসুবিধা অন্য দশজনে দূর করতে পারে। এখানে সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন প্রচেষ্টার মাত্র কয়েকটি দিক সম্বন্ধে খাপছাড়াভাবে বলা হল। আরো দু'টি কথা বলে শেষ করি। আমাদের মত পিছিয়ে-পড়া জাতির মানসকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ করে তুলতে হলে চাই বিজ্ঞানের সার্বজনীন প্রয়োগ। আমাদের প্রতিটি সমস্যার, 'পরে বিজ্ঞানের সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করে সনাতন হাতুড়ে সমাধানের পথ থেকে মানুষের মনকে বৈজ্ঞানিক সমাধানের দিকে ফেরাতে হবে। এর ফলে কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে যে বিরোধ লাগবে দৃঢ়ভাবে তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। জোড়াতালা আপোষের দুর্বলতা নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে

বর্জ্জনীয়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জাতীয়তাসাধনের সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা অনুসারে বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ—পরিমান ও উৎকর্ষের মাত্রা—দু'দিক দিয়েই বহুলাংশে বাড়াতে হবে। কারণ বিশ্বের অগ্রগতির ফলাফল থেকে নিশ্চয়ই আমরা সাধ করে বাদ পড়তে চাইনা।

('রূপান্তর', ১৩৫৩)

সাহিত্য ও গণসংগ্রাম

এ-সম্মেলনে যাঁরা জড়ো হয়েছেন তাঁদের কাছে 'সাহিত্য ও সমাজের নিবিড় সম্পর্ক', তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যের অসারতা বা বাস্তবের অবিকল প্রতিফলনের নামে নৈরাশ্যবাদ ও বিকৃতি-বিলাসের বিষময়তা নতুন করে প্রমাণের দরকার নেই। এসব মেনেই তাঁরা এখানে এসেছেন, আর গণসংগ্রামে যোগদান ছাড়া সমাজের তথা সাহিত্যের যে মুক্তি নেই, এ-সত্যও তাঁদের স্বীকার করতে বাধা নেই।

আমাদের প্রশ্ন হল সে-যোগদানের রূপ কি হবে? এর জবাব না নিয়ে যদি আমরা এখান থেকে যাই, তবে সম্মেলন অনেকটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, কারণ তরুণ শিল্পী সাহিত্যিকের কাছে এই প্রশ্নই হল আজ সব থেকে জরুরী।

আমাদের মধ্যে এ-সম্পর্কে দু'ধরনের চিন্তা দেখা যায়—যদিও আগেই মুখবন্ধ করেছি, গণসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকা ছাড়া সাহিত্য-শিল্পের যে এগোবার জো নেই, এ-বিষয়ে উভয়েই একমত। একদল ভাবছেন গণসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রয়োজন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য—যে অভিজ্ঞতা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ, ফলবান করে তুলবে। সে-সাহিত্য আবার গণসংগ্রামকে পুষ্ট করবে, এগিয়ে দেবে নূতন কর্মোদ্যোগের পথে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষাণ সভার কর্মীর মতো সাহিত্যিক বা শিল্পীর গণসংগ্রামে যোগ দেবার প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ সে-'প্রলোভন' এড়াতে না পারলে সেই বিরামহীন কর্মস্রোতের অতলে তলিয়ে যাবে সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির সমস্ত প্রেরণা। এরকম 'সাহিত্যিক অপমৃত্যু'র নজীরও তাঁরা দেখান আমাদের আশপাশ থেকেই।

অন্যদল বলেন, মজুর-কিষাণকে সংঘবদ্ধ করতে মজুর-কিষাণ সংগঠকেরা যে কাজ করেন, শিল্পী ও সাহিত্যিককেও তা করতে হবে। করতে হবে শুধু গণসংগ্রামের খাতিরেই নয়—সাহিত্য শিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মনে রেখেও। তাঁরা বলেন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগের নামে দূরত্ব রাখা চলবে না—বিশেষ সুবিধা দাবী করা চলবে না। কারণ তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শুধু গণসংগ্রাম নয়—সাহিত্যও, কারণ ভাসা ভাসা অভিজ্ঞতা থেকে তৈরী হবে শুধু কৃত্রিম সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।'

বাস্তবিক, 'অন্যান্য বর্মীদের মতো' গণসংগ্রামের সৈনিক হলে শিল্প-সাহিত্যের স্রোত রুদ্ধ হবেই—এ কথাটা বিচারসহ নয়। আরাগঁর পক্ষে সব থেকে ফলপ্রসূ সময় হল রক্তাক্ত প্রতিরোধের বছর ক'টি। স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভেসে এল কর্নফোর্ডের অবস্মরণীয় কবিতা। নাৎসী-পদানত ফ্রান্সে পিকাসোর তুলি থামে নি যদিও অন্তরীক্ষচারীদের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল অব্যাহত। কডওয়েল সম্পর্কে জর্জ টমসন বলেছেন, "It was not an accident that his most productive period as a writer coincided with his political activity in Popler." জুলিয়াস ফুচিকের কথা না হয় নাই তোলা গেল।

আসলে অফুরন্ত অবকাশ, নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার অনুকূল পরিবেশ না হলে সাহিত্যশিল্পের সৃষ্টি ব্যাহত হবে—এ-ধারণাটি ঠিক নয়। বরঞ্চ আজকের মতো তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের যুগে সব থেকে অনুকূল সেই পরিবেশকেই বলব যা সাহিত্যিকের শ্রেণীসচেতনতাকে সব চেয়ে বেশী শাণিত করে তুলতে সাহায্য করবে। আর যেহেতু আমরা জ্ঞান ও কর্মের নিবিড় পারস্পরিকতায় বিশ্বাসী, তাই কর্মস্রোত থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখেও পরিপূর্ণ জ্ঞান, পরিপূর্ণ সচেতনতা লাভ করা সম্ভব মনে করি না। বিশেষ করে আমাদের মতো নিরক্ষতার দেশে লেখক ও শিল্পীরা হলেন মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে উদ্ভূত। গোর্কির মতো নিপীড়িত শ্রেণী থেকে সাহিত্যিকের আবির্ভাব এখানে অনেক বেশী কঠিন। কাজেই আপন জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে স্বতঃই লেখকের পক্ষে তীব্র সচেতনতা অর্জন করা স্বাভাবিক নয়—যদিও আমরা জানি সেই স্বতঃস্ফূর্ত চেতনাও সোশ্যালিস্ট চৈতন্য নয়। তাই আমাদের মতো লেখক ও জনগণের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের দেশে কর্মের দিক দিয়ে একাত্ম না হতে পারলে সাহিত্যের মুক্তি নেই। তাই বাইরের খানিকটা দূরত্ব রাখতে গেলে মনের দিক থেকেও ব্যবধান ঘুচবে না।

তা'ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষাণ সভার অবিশ্রান্ত কাজকর্মের ফলে যদি দু'চার বছর লেখা বন্ধও থাকে, তাতেই বা কি আসে যায়। ইতিমধ্যে সেই কাজের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মানসিকতার ক্ষেত্রে পলি পড়বেই—আগামী দিনের সোনালী ফসলের যা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। তাই বৈশাখের রুদ্রদাহ দেখে বিহ্বল না হয়ে ভরসা রাখতে হবে আষাঢ়ের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে।

চীনের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। চীনও আমাদেরই মতো অক্ষর-জ্ঞানহীন—দারিদ্র্যের প্রচণ্ডতাও এক পর্যায়ের। সেখানে নবজীবনের উন্মেষে

শিল্পী-সাহিত্যিকের ভূমিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রনায়ক মাও সে-তুং অত্যন্ত আস্থাশীল। তিনি বলেছেন আমাদের ফ্রন্ট—সামরিক ও সাংস্কৃতিক—এবং দু'টো পরস্পর-মুখাপেক্ষী। কিন্তু ঠিক ফ্রন্টের মতো করেই শিল্পীকে সাহিত্যিককে দায়িত্ব অর্জন করতে হবে—লক্ষ্য স্থির রেখে সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে হবে। শুনেছি সেখানে সংস্কৃতি-কর্মীদের দু-তিন বছরের জন্য কিষাণের আত্মীয়তা অর্জন করতে যেতে হয়। তার ফলে প্রথমটা সত্যই থেমে গিয়েছিল কলম আর তুলি, কিন্তু অত্যন্ত সাময়িকভাবেই। তারপর এসেছে নতুন সৃষ্টির জোয়ার।

বুদ্ধিজীবীর পক্ষে কিষাণের মনের মধ্যে প্রবেশ করা, তাকে তার সংশয়, পিছুটান কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার মতো আত্মীয়তা অর্জন করা দুরূহ, তা একটি দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে—চীনা একটি নারী-সংস্কৃতিকর্মীর অভিজ্ঞতার কথা। উত্তর চীনের এক গ্রামে তিনি তখন কিষাণদের সংঘবদ্ধ করছেন। সন্ধ্যার আকাশে চাঁদ দেখে তিনি একদিন বিহ্বল হলেন, কিন্তু সঙ্গের কৃষাণী সেই চাঁদ দেখেই প্রচণ্ড শীতের রাত্রির সম্ভাবনায় ভয়ার্ত হয়ে উঠলো আসন্ন দুর্গতির কথা ভেবে। চীনা নারীকর্মী লজ্জিতা হলেন—অত্যন্ত রুক্ষ কঠোর বাস্তবের আঘাতে সংবরণ করলেন তাঁর বিহ্বলতা।

তবে কি শিল্পী-সাহিত্যিক শুধু মজুর-কিষাণের সচেতনতা নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকবেন। নিশ্চয়ই নয়। তিনি বুদ্ধিজীবী হিসাবে সেখানে আনবেন সোশ্যালিস্ট চৈতন্য, আর তারই ভিত্তিতে তাদের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করবেন। কিন্তু সোশ্যালিস্ট চেতনা মজুর-কিষাণেরা সহজভাবে গ্রহণ করবে শুধু তাদের আপনজনারই কাছ থেকে, গুরুমশায়ের কাছ থেকে নয়। তাই কবিকে, শিল্পীকে, সাহিত্যিককে ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত মজুর ও কিষাণ সভার কিষাণের সহকর্মী হতেই হবে—তাদের বিপ্লবী কাজের দর্শকমাত্র নয়।

অন্য ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষাণ-কর্মীর সঙ্গে তবে তফাৎটা হবে কোথায়? তফাৎ হবে দু'দিক থেকে। সাহিত্যিক বা শিল্পীর মন সংঘবদ্ধ মজুর-কিষাণের সংস্পর্শে এসে অলক্ষ্যে বিপ্লবী চেতনায় সমৃদ্ধ হবে—যে-চেতনা হল নতুন সাহিত্যের বনিয়াদ। অন্যদিকে শিল্পী-সাহিত্যিক মজুর-কিষাণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের মধ্যেও অলক্ষ্যে সংক্রামিত করবেন সেই তীব্র প্রচণ্ড অনুভূতি যা হল শিল্পী-সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য। সে-অনুভূতি প্রশস্ত করবে আগামী বিপ্লবের পথ। বিপ্লবী-কবি এলুয়ার তাই বলছেন: "কবিরা

বুঝতে পেরেছেন যে সব মানুষই তাঁদের মতো সৌন্দর্যের প্রতি আবেগময় অনুভূতি পেতে পারে।" নাৎসী-অধ্যুষিত ফ্রান্সে জনসাধারণ ও সাহিত্যিক যে একই বিপ্লবী প্রচেষ্টার মধ্যে একাত্ম হতে পেরেছেন, তারই উল্লেখ করে তিনি বলেছেন: "এক মুহূর্তের জন্যেও আমরা মানুষ সম্বন্ধে হতাশ হই নি; এক মুহূর্তের জন্যেও আমরা অত্যাচারিতদের মুক্তি এবং অত্যাচারীদের ধ্বংসের ভরসা ছাড়ি নি। মুক্তি তার দুর্গ, ফ্রান্সকে ছেড়ে যায়নি। তার রক্ষীদের অনেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে, নিহত হয়েছে এবং বাকী সকলে অন্ধকারে লড়াই চালিয়ে গেছে; কিন্তু তাদের সকলেরই হৃদয়ে ছিল একই উদ্দীপনা, ছিল একই আশা যা চিরন্তনের রঙে রাঙানো। কেউ আর বলত না 'আমি,' বলত 'আমরা' আর কবিদের সম্মান যা প্রকাশ পেয়েছিল এবং যা টিঁকে থাকবে তা হল এই যে তারা বলেছে 'আমরা মানুষরা'। একথা তারা বলেছে সমগ্র পৃথিবীর সেই সমস্ত মানুষের হয়ে যারা নীচভাবে জীবনযাপন করতে আর রাজী নয়।"*

আমি জানি এ-প্রসঙ্গে বিপ্লবীর কাজের মধ্যেও কাজ-ভাগাভাগির কথা উঠবে, এই মুহূর্তে সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষে মজুর-কিষাণ আন্দোলনে বিনাশর্তে আত্মনিয়োগ করার পথে নানা অসুবিধার কথা উঠবে, আত্মনিয়োগ করলেই সৎসাহিত্য সৃষ্টি হবে—এ মত যান্ত্রিকতাদোষদুষ্ট, এমন কথা উঠবে। এ সবই ঠিক; কিন্তু এ-সবের বিচার হবে প্রাথমিক সমীকরণের চেষ্টার পর। যেটা প্রথমে করবার সেটা হল প্রত্যেক শিল্পীকে সাহিত্যিককে যুক্ত হতে হবে মজুর-কিষাণ-আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে। সৈনিক হওয়ার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার পর কথা উঠবে কাজ ভাগাভাগির, বিচার হবে নতুন ফসল ভালো না মন্দ, খতিয়ে দেখা যাবে লাভক্ষতি। ইতিমধ্যে সবাইকে যেতে হবে ফ্রণ্টে।**

(১৯৪৯)

---

* 'ফরাসী কবির জবানবন্দী,' 'পরিচয়', চৈত্র, ১৩৫৫।

** পরিচয়, জৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ ৭০৯-১৩; ১৯৪৯ সালের ২২-২৪ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে'র চতুর্থ সম্মেলনে পঠিত। এই প্রবন্ধটির বক্তব্যই পরবর্তীকালে 'প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' প্রসঙ্গে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে।

শিল্প সাহিত্যের সমস্যা ঃ চীনের পথ

১৯৪২ সালে ইয়েনান শহরে চীনের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সম্মেলনে গণনায়ক মাও সে-তুং যে দু'টি বক্তৃতা দেন, তাই এতদিন চীনা সাহিত্যিক শিল্পীদের কাছে পথের নিশানা হয়ে এসেছে। ১৯৪৯ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ গোটা চীনকে অবশেষে কুয়োমিনটাং, তথা মার্কিন প্রভাবমুক্ত করে, তখন যে নতুন অবস্থার উদ্ভব হয় তা শুধু রাজনীতি, অর্থনীতিতে নয়—সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। চীন মোটের উপর আজ মুক্ত—পরাধীন আর দ্বিধাবিভক্ত রইল না—উন্মেষ হল নতুন জীবনের, নতুন বাস্তবের, নতুন সংগ্রামের। সেই নতুনের সঙ্গে তাল রেখে নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে হবে, শুধু পুরানোর জের টানলেই চলবে না—তাই ১৯৪৯ সালের জুলাইয়ে পিকিং-এ ডাকা হল সমগ্র চীনের লেখক ও শিল্পীদের সম্মেলন—নতুন কর্তব্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে।

এই সম্মেলনের চারটি সব থেকে জরুরী বক্তৃতা সম্প্রতি পিকিং থেকে ইংরেজি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এই সংকলনে আছে বর্তমান চীনা গণরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই এর 'গণমুক্তি সংগ্রাম ও সাহিত্য শিল্পের সমস্যা,' বিখ্যাত চীনা মনীষী ও এখন রাষ্ট্রের সহ-সভাপতি কুও মো-জো-র 'নয়া চীনে সাহিত্য সৃষ্টির সংগ্রাম,' খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও বর্তমানে সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী মাও দুনের 'কুয়োমিনটাং অধিকৃত এলাকার সাহিত্য' এবং বিখ্যাত চীনা সমালোচক ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী মন্ত্রী, চাউ ইয়াংএর 'জনগণের নতুন সাহিত্য' বিষয়ক আলোচনাগুলি। আর গোড়াতেই এগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন খ্যাতনামা চীনা কবি এমি সিয়াও।

মাও সে-তুং ১৯৪২ সালের ভাষণে সাধারণভাবে মজুর কিষাণ ও সৈন্য বাহিনীর সেবায় শিল্পী সাহিত্যিকদের আত্মনিয়োগ করতে বলেছিলেন। নতুন অবস্থায়ও সেই নির্দেশকেই সামনে রেখে আলোচনা চলেছে এবারকার

সম্মেলনে। সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৯ এই সাতটি বিপ্লবী বছরের তাৎপর্যেরও হিসাবনিকাশ দিয়ে নতুন কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে নতুন অবস্থার উপযোগী করে। চীনের নতুন সাহিত্যকে বুঝবার পক্ষে এ পুস্তিকার গুরুত্ব তাই অসামান্য।

চৌ এন-লাই মুক্তিফৌজের চমকপ্রদ বিজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সে বিজয়ে চীনের মুক্তিফৌজ, শ্রমিক ও কৃষকের ভূমিকা কতখানি, ব্যাপক গণতান্ত্রিক শক্তি সমাবেশেরই বা মূল্য কী এবং আন্তর্জাতিক গণশিবিরের শক্তির প্রভাবই বা কতটা। এরই পৃষ্ঠপটে তিনি তুলে ধরেছেন শিল্পী সাহিত্যিকদের কতগুলি সমস্যা।

প্রথমেই মুক্ত চীন আর কিছুদিন আগেও যে এলাকা কুয়োমিনটাং শাসনাধীন ছিল সেখানকার শিল্পী সাহিত্যিকদের ঐক্যের কথা তিনি বলেছেন, দেখিয়েছেন যে উভয় এলাকায় নূতন সংস্কৃতিকর্মীদের সম্মিলিত সংখ্যা প্রায় ৭০,০০০। এঁদের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যে ঐক্য গড়ে তুললেন তারই সূত্র তাঁরা প্রসারিত করবেন এখন সমগ্র অখণ্ড চীনে।

দ্বিতীয়ত, জনগণের সেবার, তাঁদের জানবার সুযোগ এখন আর শুধু মুক্ত এলাকায় নয়—সারা চীনের শিল্পী সাহিত্যিকরাই পাবেন। এখন থেকে তাঁরা তৎপর হবেন বিশেষ করে মজুর, কিষাণ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে। এর অর্থ এই নয় যে শুধু মজুর কিষাণদের নিয়েই লিখতে হবে। চৌ এন-লাইয়ের ভাষায় "অন্যান্য শ্রেণী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ থেকে বঞ্চিত হবার কথা আমি বলিনি। আসল কথা হল কোথায় জোর দিতে হবে—সে খবর জানা। নইলে এই মহান যুগ ও তার স্রষ্টা, খেটে খাওয়া মানুষদের আমরা আমাদের সৃষ্টিতে প্রতিফলিত করতে পারব না।"

তৃতীয়ত, সাহিত্যশিল্পের ব্যাপক আবেদন ও তার শিল্পগত মহত্ত্বের প্রশ্ন। এখানেও চৌ এন-লাই নিঃসংশয়ে জোর দিয়েছেন জনপ্রিয়তার উপর, এমন কি আজ শিল্পগত দিক থেকে যদি সৃষ্টি উচ্চাঙ্গের না'ও হয় তবু "আমাদের খুব বেশী দাবি করা ঠিক হবে না; আপন সন্তানের মতো তার প্রতি ব্যবহার করতে হবে। সমালোচনা করতে হবে, শেখাতে হবে কিন্তু বেত মারা বা বকুনী দেওয়া চলবে না। নইলে সন্তানের ক্রমবিকাশের পথ আমরাই রুদ্ধ করব—তাকে বানিয়ে তুলব অপদার্থ।"

চতুর্থত, পুরানো কায়দায় যে-সব শিল্পী সাহিত্যিক আজও বহুলোকের মনোরঞ্জন করেন, তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি রেখে ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের নতুন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পুরানো ঢং বদলানোর মস্ত কাজ রয়েছে সামনে। গায়ের জোরে তাকে হটানো বা তাড়ানোর চেষ্টা ব্যর্থ হবেই। তার মধ্যে যা কিছু সুন্দর, কল্যাণকর ও প্রগতিশীল তাকে অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করতে হবে—নইলে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতি আঘাত করা হবে। আবার এমন কিছু অনেক জিনিস পুরানো সাহিত্য শিল্পের মধ্যে আছে নিশ্চিতভাবেই যা বর্জনীয়।

পঞ্চমত, একটি অঞ্চল বা এলাকা থেকে এবার আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে হবে সারা দেশে। অখণ্ড চীনে গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এ কাজ আজ খুবই সম্ভব। সমাজের পুনর্গঠন নতুন নতুন কর্তব্য হাজির করবে লেখক শিল্পীদের সামনে যা পালন করতে হবে আঞ্চলিকভাবে নয়—সারা চীনের ভিত্তিতে।

সর্বশেষে, সারা চীনের লেখক ও শিল্পীর ফেডারেশনই শুধু নয়, সাহিত্য, নাটক, ছায়াছবি, সঙ্গীত, ছবি, অপেরা ও নৃত্য এসব কিছুরই শাখা গড়তে হবে সারা দেশে। সমস্ত চীনের সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদ অবস্থা, সাংস্কৃতিক সংগঠনের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা, শহর থেকে গ্রামের যে ব্যবধান তা দূর করে শক্ত করতে হবে ঐক্যবদ্ধ নতুন গণতান্ত্রিক চীনের নতুন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বনিয়াদ।

কুও মো-জো মাও সে-তুংয়ের সূত্র অনুসারে দেখিয়েছেন যে চীনা বিপ্লবের বর্তমান স্তরের চরিত্র যখন 'নতুন গণতান্ত্রিক' এবং নতুন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থ যখন "সর্বহারার নেতৃত্বে জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী বিপ্লব" তখন চীনের নতুন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের চরিত্র স্বভাবতই হবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী এবং তাঁর নায়কতা করবে সর্বহারা শ্রেণী। ৪ঠা মে-র আন্দোলনের আগে বুর্জোয়ার নেতৃত্বে যে পুরানো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য 'আফিং যুদ্ধের' আমল থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল তার চরিত্রও ছিল কম বেশী পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরোধী। কাজেই যে মূল লক্ষণ নতুন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে পুরানো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে পৃথক হিসাবে চিহ্নিত করছে, সেটি হল সর্বহারার নেতৃত্ব। আজকের দিনে রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চীনা বিপ্লব যে বিপুল জয়লাভ করেছে

তার মূলে আছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি মারফৎ এই সর্বহারা শ্রেণীরই নেতৃত্ব। কিন্তু শুধু নেতৃত্ব নয়, সেই নেতৃত্বের অধীনে ব্যাপক সংযুক্ত ফ্রন্টের কথাও তুলেছেন কুও মো-জো। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চীনে এই যুক্ত ফ্রন্ট দেখা গেছে গোড়ার থেকেই। প্রথম যুগে পেটিবুর্জোয়া ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন এ ফ্রন্টের ভিতর এবং তাঁদের সমবেত চেষ্টার ফলেই ৪ঠা মে আন্দোলন ও ১৯২৭-এর বিপ্লবী আমলের মধ্যবর্তী যুগে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্যের প্রভাব বিনষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। ১৯২৭ সালের দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতার পর গণতন্ত্রের সংগ্রাম নতুন স্তরে উন্নীত হল। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা দিল বামপন্থী আন্দোলন। তার রূপ ছিল সর্বহারা ও বিপ্লবী পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে যুক্ত ফ্রন্ট—যার পুরোধা ছিলেন লু সুন।

এই যুক্ত ফ্রন্টের ভিতর কিছু কিছু কর্মী গোঁড়ামি ও গোঁয়ার্তুমির ঝোঁকে 'রুদ্ধদ্বার' নীতি গ্রহণ করেছিলেন। চীন-জাপান যুদ্ধের ঠিক আগে ও যুদ্ধের সময় কিন্তু বুর্জোয়া ও দেশপ্রেমিক লেখকদের নিয়ে ব্যাপক ফ্রন্ট গঠন করা হয়। এঁদের মধ্যে পরে কেউ কেউ ডাইনে হেলেছিলেন কিন্তু মোটের উপর নতুন সাহিত্যিক আন্দোলন এই সময় প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করে এবং জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে যথেষ্ট শক্তি জোগায়। কুয়োমিনটাং এলাকার লেখকেরা সরকারী নিষ্পেষণ সত্ত্বেও হাল ছাড়েননি—জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের দিকেই ক্রমশ অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছেন। ৪ঠা মে-র সময় থেকে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়নি মুক্ত এলাকায় ১৯৪২ সালে ইয়েনান সম্মেলনে মাও সে-তুংয়ের বক্তৃতা তার নিষ্পত্তি করেছিল। সাহিত্যিক শিল্পীরা তাই জনগণের মধ্যে দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়বার চেষ্টা করলেন।

গত ৩০ বছরের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর সাহিত্যের সৌধ ধ্বসে পড়েছে। কুয়োমিনটাং পুঁজিদারদের সাহিত্যও জনগণ ও লেখকমাত্রেরই ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির "জনসাধারণের জন্যই আর্ট" এই নীতিকে লড়তে হয়েছে দুর্বল, অবাধ বাজারের পোষক পুঁজিদারদের 'আর্টে'র জন্যই আর্টের নীতির বিরুদ্ধে এবং শেষ পর্যন্ত সে নীতি

জয়যুক্ত হয়েছে। এইভাবেই চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে অবশেষে পতন হয়েছে বুর্জোয়া নেতৃত্বের।

রাজনৈতিক যুক্ত ফ্রন্টের মতোই সাহিত্যিক যুক্ত ফ্রণ্টের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকবে—সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ মতামত নিয়েই থাকবে। এই সমস্ত মতকে এক করা অসম্ভব—তাদের পৃথক সত্তা থাকতে দিতেই হবে। কিন্তু রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হলে সাহিত্য মারফৎ ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা করতে হবে জনগণের সেবার। সমালোচনা কিন্তু রাজনৈতিক যুক্ত ফ্রণ্টের মত এখানকার যুক্ত ফ্রণ্টের অপরিহার্য অঙ্গ। সে সমালোচনা হবে পারস্পরিক।

চীনের বিপ্লব আজ নতুন স্তরে এসে পৌঁছেছে। এখনকার প্রধান কাজ হল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন এবং দেশরক্ষা। বর্তমান সম্মেলনকে এরই উপযোগী কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। কুও মো-জো'র প্রস্তাব হলঃ (১) সাহিত্যিক হাতিয়ারের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজির সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং জনগণের নয়া গণতান্ত্রিক রিপাবলিক গঠনের জন্য সংগ্রাম তীব্রতর করতে হবে, (২) জনসাধারণের মধ্যে যেতে হবে, তাদের বুঝতে হবে, তাদেরই জীবন যাপন করতে হবে। নতুন সাহিত্য হবে মতবাদগত বিষয়বস্তুর দিক থেকে মূল্যবান, নীতির দিক থেকে সু-উচ্চ এবং এমন আঙ্গিকে রচিত জনগণ যার স্বাদ গ্রহণে উৎসুক। (৩) পুরানো আধা-উপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্যের জের একেবারে নিঃশেষ করতে হবে—সমূলে উৎপাটন করতে হবে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া ও চীনা সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্যের প্রভাব। পুরাতন সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করে।

সাহিত্যিকদের বিপ্লব ও জাতীয় পুনর্গঠনে অংশ গ্রহণ করতে হবে শুধু অন্য দশজন অংশীদারের মত নয়—লেখক শিল্পী হিসাবেও। জনগণের সংগ্রামকে প্রতিফলিত করতে হলে লেখকদের বাস্তবের গভীরে প্রবেশ করতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে গণজীবনকে—যে গণজীবন হল সমস্ত সৃষ্টিরই অফুরন্ত উৎস। জনসাধারণের শিক্ষক হবার আগে, হতে হবে তাদের বিশ্বস্ত ছাত্র। কিন্তু শুধু বাস্তবের গভীরে ঢুকলেই হবে না। আজকের দিনের জটিল বাস্তবকে আয়ত্ত করতে হলে চাই বিপ্লবী তত্ত্ব ও প্রগতিশীল সাহিত্যের নীতি ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করা। আমাদের রচনার শিল্পগত উৎকর্ষ বাড়াতে

নিশ্চয়ই হবে কিন্তু তা করতে হবে সাহিত্যের ব্যাপক আবেদনের ভিত্তিতে এ ছাড়া চীনা ও বিদেশী ঐতিহ্য থেকে সমালোচনার চালুনীতে ছেঁকে গ্রহণ করতে হবে সারবস্তু।

পুরানো সাহিত্যের সংস্কার ও সনাতনপন্থী লেখক ও শিল্পীদের নতুন শিক্ষাদান—চীনের সাহিত্যিকদের সামনে এই হচ্ছে মস্ত কাজ।

চীনের সাহিত্য বা শিল্পকর্মীদের যেতে হবে জনসাধারণের মধ্যে। কিন্তু সে যাওয়া সেচ্ছায় হওয়া চাই। যাঁরা কিছুটা এ কাজ করেছেন তাঁদের মনে রাখতে হবে মাও সে-তুঙের সাবধান বাণীঃ "আত্মাভিমানই হল উন্নতির সব থেকে বড় অন্তরায়।" আর যাঁরা তা করেননি, তাঁদের সুদৃঢ়ভাবে অগ্রসর হতে হবে জনসাধারণের গভীরে।

"কুওমিনটাং অধিকৃত এলাকার সাহিত্য" সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাও দুন প্রথমেই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুক্ত এলাকার সঙ্গে এখানকার বাস্তব পৃষ্ঠপটের পার্থক্য দেখিয়েছেন। কুয়োমিনটাং এলাকায় ক্ষমতা প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে—তারা অন্যান্য প্রগতিশীল গণ-আন্দোলনের মত প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনের টুঁটি টিপে মারবার চেষ্টার ত্রুটি করেনি। নিষ্পেষণের চাপে স্বাভাবিক প্রকাশের অভাবে অনেক সময়ই লেখকদের মধ্যে একান্ত আত্মগত ধ্যানধারণার দিকটা প্রকট হয়ে উঠত। তবু কুয়োমিনটাং ও মুক্ত এলাকা দু' জায়গায়ই সাহিত্যিক আন্দোলনের সাধারণ গতি ছিল একই দিকে—মাও সে-তুঙ নির্দিষ্ট পথে দু'জনেরাই পা বাড়িয়েছিলেন।

কুওমিনটাং এলাকার গত ১০ বছরের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনকে মোটামুটি চারটি স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম যুগ হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের শুরু থেকে হ্যাংকাও পতন পর্যন্ত (১৯৩৭-এর জুলাই থেকে ১৯৩৮-এর শেষ পর্যন্ত)। যুদ্ধ শুরু হওরার সঙ্গে সঙ্গে সারা চীনে লেখকদের মধ্যে প্রচণ্ড 'উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাঁরা নাট্যচক্র তৈরি করে সৈন্যবাহিনীতে ও গ্রামাঞ্চলে যেতে আরম্ভ করেন। জীবন্ত সংবাদপত্র, পথচলতি নাটক প্রভৃতি নতুন ধরনের আঙ্গিকে তাঁরা সর্বজনবোধ্য আর্ট সৃষ্টির চেষ্টা করেন। সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসে তাঁদের অনেকেরই নতুন দৃষ্টি খুলে যায়। অনেকে মুক্ত এলাকায় চলে যান।

দ্বিতীয় যুগ হচ্ছে হ্যাংকাও পতন থেকে ১৯৪১-এর গোড়ায় দক্ষিণ 'আনহুই ঘটনা' পর্যন্ত। এই কয়েক বছর (১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪) কুওমিনটাং শাসকেরা

প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রতি প্রায় নিষ্ক্রিয় দর্শকের মনোভাব দেখাতে থাকে। তারা জাপানের সঙ্গে আপসের জন্য বিদেশী হস্তক্ষেপ এমন কি জাপানের কাছে আত্মসমর্পণের কথাও ভাবতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপরই তারা ভরসা করতে আরম্ভ করে। এই সময় তারা চীনের জনসাধারণ ও কমিউনিস্ট পার্টির বিপক্ষতা করতে থাকে—প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের উপর চালাতে থাকে নানা বিধিনিষেধ—এমন কি যে কোনও মুহূর্তে লেখকদের বন্দীশালায় পাঠানো হতে থাকে। অনেক লেখক এই নিষ্পেষণ ও আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে হতাশ হয়ে পড়েন। তবু অধিকাংশ লেখকই হাল ছাড়েননি—তাঁরা 'ব্যাপক ফ্রন্ট গঠন করে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে নানা কৌশলে লড়াই চালাতে থাকেন।

তৃতীয় যুগ হচ্ছে ১৯৪৪-এর দ্বিতীয়ার্ধে হুনান, কোয়াংসি প্রভৃতি প্রদেশে জাপানী বাহিনীর প্রবেশ থেকে পরবর্তী গ্রীষ্মকালে জয়লাভের ঠিক আগে পর্যন্ত। এই সময় আর্থিক দুরবস্থাও যেমন তীব্র হয়ে ওঠে ঠিক তেমনই প্রচণ্ড হয় সরকারী জুলুম। কিন্তু এই সময়ই চেংটু ও কুনমিং-এ ছাত্র আন্দোলন ফেটে পড়ে এবং ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার দেখা দেয়। এরই সঙ্গে সাহিত্য আন্দোলনও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হচ্ছে ছোট, সরাসরি রাজনৈতিক কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ও ব্যঙ্গচিত্র।

শেষ যুগ হচ্ছে প্রতিরোধ যুদ্ধের শেষ থেকে গণমুক্তি যুদ্ধের বছরগুলি পর্যন্ত। এই সময় সরাসরি মার্কিনদের তাঁবে যাওয়ার বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন মাথা চাড়া দেয়—তার সঙ্গে যুক্ত থাকেন লেখকেরা। গান ও কবিতা দিয়ে তাঁরা গণ-আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৪৬ সালে গৃহযুদ্ধের আগুনে কুওমিনটাং শাসকেরা দেশকে জ্বালাতে শুরু করে—সংবাদপত্র বন্ধ করে, বই নিষিদ্ধ করে, লেখকদের উপর অত্যাচার চালিয়ে তারা গণতান্ত্রিক সাহিত্য আন্দোলনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। তবু কিন্তু সংস্কৃতি আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যায়নি—ছায়াচিত্র শিল্পীরা কঠোরতম খবরদারীর মধ্যেও প্রগতিশীল ছবি বার করতে থাকেন। কিছু কিছু 'লেখক হংকং-এ চলে গিয়ে সেখান থেকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান।

এই চার যুগেই 'সারা চীনের সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘ' দেশপ্রেমিক সমস্ত

শ্রেণীর লেখক ও শিল্পীর মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেন। গত দশ বছরে কুয়োমিনটাং এলাকার সাহিত্য হার মানেনি। তার বিজয়ের প্রধান কারণ হল এই যে, সাহিত্য আন্দোলন জনসাধারণের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একই পথের পথিক হতে পেরেছিল।

এই দশ বছরে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, কুয়োমিনটাং এর অত্যাচার উত্তরোত্তর যেমন বেড়েছে লেখকদের অবস্থাও তেমনই সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন গ্রামাঞ্চলে যেতে কিন্তু নিজেদের সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে না পারার দরুণ তাঁরা সেখানে শিকড় গাড়তে পারেননি। তাই তাঁদের লেখার মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ছিল। অনেকে জবরদস্ত খবরদারির চোটে কলম ছেড়েছেন, হয়ত বা দেশও ছেড়েছেন। তার উপর খুব মজবুত সংগঠনের অভাবে তাঁরা পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তেমন পাননি—লড়াই চালাতে হয়েছে প্রত্যেককে মোটামুটি এককভাবে সঠিক নেতৃত্ব ছাড়াই। ঐ সব কিছু মিলিয়ে তাঁদের রচনায় দেখা দিয়েছে কিছু পরিমাণে এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত চিন্তা, কিছুটা শূণ্যতা। তা সত্ত্বেও গত দশ বছরের সাহিত্য ফেলবার নয়! কখনও তাঁদের রচনায় প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের স্বরূপ জ্বলন্তভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে, কখনও বা পেটি-বুর্জোয়ার সার্থক প্রতিফলন পাঠকের মনে কায়েমী অবস্থার প্রতি ঘৃণা জাগ্রত করেছে, বাড়িয়ে তুলেছে নতুন জীবনের প্রতি টান। তাদের মধ্যে কেউ কেউ জনপ্রিয়, সহজ আঙ্গিকে লিখবার চেষ্টা করে কমবেশী সাফল্য লাভও করেছেন।

কুয়োমিনটাং এলাকার কোন কোন লেখকের রচনা হয়ত পড়তে ভালই লাগে কিন্তু তাদের মারফত গোপনে পাঠকদের মনে একটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, লঘু আবেগ সঞ্চারিত হয়। যুগের মূল সামাজিক সংঘাত প্রতিফলিত না করতে পারলে এই শূণ্যতা অবশ্যম্ভাবী। এর অভাবে তাদের কেউ কেউ ছোটখাটো, খুঁটিনাটি সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, কেউ বা একদম সরে গেছেন বাস্তব জীবন থেকে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় তাঁদের অন্তঃসারশূন্যতা ঢাকা পড়েনি। কেউ কেউ জীবনের সমস্যার প্রত্যক্ষ সমাধানের অভাবে, আধ্যাত্মিক সমাধান খুঁজেছেন তাঁদের চরিত্রগুলিকে 'আত্মিকশক্তি'-বিমণ্ডিত করে। বাইরের বাস্তব সত্যকে এড়িয়ে তাঁরা একান্ত আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিতেই দেখেছেন বাস্তবকে, রঙ চড়িয়েছেন যথেচ্ছভাবে। কোন কোন লেখকের হয়ত সামাজিক বিবেক ছিল আর তাই নির্মম বাস্তবকে কিছুটা তাঁরা দেখাতেও

পেরেছেন সঠিকভাবে। কিন্তু তাঁরাও মূল সংঘাত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। কোন সত্যকার বক্তব্য ছাড়া শহুরে জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কাহিনীর মধ্যে হঠাৎ বেয়াড়া প্রেমের গল্প বুনে দেওয়া কিংবা সরাসরি নৈরাশ্যবাদ প্রচার—এ সব ধারাও অল্প বিস্তর দেখা গেছে।

কুয়োমিনটাং এলাকার সাহিত্যে বর্তমান সময়ের মূল সামাজিক সংঘাতের প্রতিফলন যে আশানুরূপ হয়নি তার কারণ শুধু বাইরের বাধা নয়—লেখকদের নিজস্ব এই সব আত্মকেন্দ্রিকতাও বটে। অধিকাংশ লেখকই এসেছেন পেটিবুর্জোয়া পরিবার থেকে। তাঁরা স্বভাবতই পশ্চিমের দিকে তাকিয়েছেন—বাস্তবকে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেননি তেমন করে। তাঁদের বিষয়বস্তুও অনেক সময়ই হয়েছে পেটি বুর্জোয়া জীবনযাত্রা নিয়েই—পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের দুর্বলতার সাফাই তাঁরা গেয়েছেন সেখানে। মজুর কিষাণ চরিত্র এঁকেছেন ভাসাভাসা ভাবে—তাঁদের মজুরকিষাণের জামাকাপড়ের নীচে পেটিবুর্জোয়া মন লুকোনো যায়নি।

একেবারে প্রতিক্রিয়াশীলেরাও আসর ছাড়েনি। তারাও নানারকম ঘুমপাড়ানি চটকদার মাল ছেড়েছে বাজারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা সরাসরি রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে লেখেনি—শুধু বিকৃত রুচির খোরাক জুগিয়েছে দু'হাতে। ঐ সব লেখা অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েই ফেনিয়েছে বিস্তর আর সৃষ্টি করেছে বেশ কিছুটা হতাশা।

সাহিত্য সৃষ্টির পিছনকার তত্ত্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানে জমাট রয়েছে বিস্তর অস্পষ্টতা ও ধোঁয়াটে চিন্তা। গোঁড়ামীর বিরুদ্ধতা করার নামে পেটি বুর্জোয়া চিন্তা বল্‌গাহীন ভাবে ছুটেছে। প্রতিরোধ যুদ্ধে জাতীয়তার উপর জোর দিতে গিয়ে ভোলা হয়েছে শ্রেণীদৃষ্টিকে—ব্যাপক ফ্রন্ট গড়তে যাওয়া হয়েছে পারস্পরিক সমালোচনা বাদ দিয়েই। মাও সে-তুঙের ১৯৪২-এর নির্দেশ কুয়োমিনটাং এলাকায়ও প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু কুয়োমিনটাং ও মুক্ত এলাকার অবস্থার পার্থক্যের দোহাই পেড়ে মাও-এর নির্দেশ কার্যত উপেক্ষাই করা হয়েছে মৌখিক স্বীকৃতির আড়ালে।

কুয়োমিনটাং অধিকৃত এলাকার সাহিত্যের মতবাদগত বিকাশের ধারাকে মোটামুটি এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

প্রথমত, প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য যাতে সর্বজনগ্রাহ্য

হয় সে দিকে নজর পড়ে কিন্তু জনপ্রিয় সাহিত্যের সমস্যাকে প্রধানত দেখা হতে থাকে আঙ্গিকের প্রশ্ন হিসাবে। লেখকের দৃষ্টিকোণ, ধারণা, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি মনোভাব—এ সবের দিকে কিন্তু তেমন নজর যায়নি। ১৯৪০ সালের 'জাতীয় আঙ্গিক' সম্পর্কিত বাদানুবাদ সাহিত্যের জনপ্রিয়তার সমস্যার সহজ সমাধান খুঁজল পুরনো লোককলার আঙ্গিক গ্রহণের মধ্যে। এর ফলে ৪ঠা মে আন্দোলনের সময় থেকে যে সব নতুন আঙ্গিক দেখা দিয়েছিল তা বাতিল করার চেষ্টা হল এক কথায়। অন্য আর এক পক্ষ নতুন আঙ্গিকের নামে তাঁদের সংকীর্ণ পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণই বজায় রাখার চেষ্টা করলেন। দুই পক্ষেই ছিল অন্ধ গোঁড়ামি। অবশ্য এর ফলে কিছুটা পরীক্ষা চলল নতুন নতুন আঙ্গিক ব্যবহারের আর লোকসংগীত ও আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে গবেষণাও হল কিছুটা। এ সবেরই নিশ্চয়ই যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু আসল কথা হল এই যে সাহিত্যের জনপ্রিয়তার সমস্যা শুধু আঙ্গিকগত সমস্যাই নয়।

দ্বিতীয় সমস্যা হল সাহিত্যের রাজনৈতিক গুণাগুণ ও শিল্পগত গুণাগুণের সমস্যা। প্রতিরোধ যুদ্ধ যতই জটিল হয়ে উঠতে লাগল ততই দেখা গেল শুধু জাতীয়তাবাদী মনোভাব বা যুদ্ধের স্লোগান আওড়ানোই জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তখন থেকেই সাহিত্যের রাজনৈতিক ও শিল্পগত গুণাগুণের কথা ওঠে। বাইরে সাহিত্যের রাজনৈতিক উৎকর্ষ অস্বীকার করা হল না কিন্তু জোর দেওয়া হতে লাগল শিল্পগত গুণের উপর। প্রশ্ন কিন্তু শুধু এই নয় যে রাজনৈতিক ও শিল্পগত উৎকর্ষের মধ্যে কোনটা বেশী প্রয়োজন। কোন মাপকাঠিতে শিল্পগত উৎকর্ষ মাপতে হবে—সেই জরুরী প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। শিল্পগত গুণ যদি আমরা পেটি বুর্জোয়া ভাবালুতার মাপকাঠিতে মাপি তবে সাহিত্যের রাজনৈতিক ও শিল্পগত গুণের সমন্বয় সমস্যার সমাধান অসম্ভব হয়ে উঠবে।

অনেকে মনে করেন আমাদের সাহিত্যের দোষ হচ্ছে এই যে তাতে শিল্পগত গুণের অভাব রয়েছে—রাজনৈতিক উৎকর্ষের অভাব তো নেইই বরঞ্চ যেন বাড়াবাড়ি রকম ভাবেই তা রয়েছে। অনেকের যুক্তি এই যে সাহিত্যের মূল কথা হল তার শিল্পগত উৎকর্ষের দিকটা। অবশ্য রাজনৈতিক গুণও থাকা উচিত কিন্তু সেটা হল শুধু মাত্র শিল্পগত মূল্যকে উপস্থিত করার মাল-মশলা মাত্র।

অনেকে সাহিত্যের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ফলাফল দাবি করা অসঙ্গত মনে করেন। তাঁরা বলেন সাহিত্যের অবশ্যই রাজনৈতিক কাজ আছে কিন্তু সেটা সরাসরি নয়—দীর্ঘ দিনের। সার্থক শিল্প বিভিন্ন ধরনের চরিত্র মারফত একটা স্থায়ী রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করে কিন্তু তার কারণ সে শিল্প সব থেকে তীক্ষ্নভাবে বাস্তব অবস্থার রাজনৈতিক তাৎপর্য প্রকাশ করে। তাই কোন লেখক যদি স্থায়ী রাজনৈতিক মূল্যের নামে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ফলাফলের বিরুদ্ধতা করেন তবে তিনি কার্যত রক্তমাংসহীন মানবতাবাদের খপ্পরে পড়বেন—সাহিত্যের রাজনৈতিক উৎকর্ষের দিকটাই অস্বীকার করে বসবেন।

অনেকে সাহিত্যের মধ্যে রাজনৈতিক ইঙ্গিত থাকার বিরুদ্ধতা করেন এই জন্য যে এর ফলে লেখক মনগড়া, অবাস্তব কথা বলবেন। অবশ্য এই রকম ধরনের লেখা নিশ্চয়ই আছে যেখানে লেখার আসল কথা হল পেটি-বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। তার বিপ্লবী কথাবার্তা শুধু বাইরের সাজগোজ। কিন্তু একেবারে ধাপ্পাবাজীর দৃষ্টান্ত বাদ দিলে এর কারণ দাঁড়ায় এই যে লেখক এখনও মতবাদের দিক থেকে নিজেকে নতুন করে গড়েননি, জন-সাধারণের সঙ্গে যোগাযোগও তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ নয়। সে-ক্ষেত্রে প্রতিষেধক হচ্ছে শিল্পীদের কাছ থেকে আরও বেশী রাজনৈতিক উৎকর্ষ দাবি করা। সাহিত্যিকেরা খুব চমৎকার ভাবে পেটি-বুর্জোয়ার ভাবালুতা প্রকাশ করতে পারেন অথচ জনসাধারণের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খার রূপ দিতে পারছেন না ব'লে শিল্পকেই একমাত্র সত্য ও রাজনীতিকে প্রতারণা বললে সাহিত্যকে আমরা জাহান্নামেই পাঠাব।

শিল্পের উৎকর্ষের নামে নির্বিচারে পশ্চিমী বুর্জোয়ার সাহিত্য গ্রহণ বা আঙ্গিক-সর্বস্বতার ওকালতী করা হয়। কখনও বা লেখকের 'প্রাণশক্তি' ও একান্ত 'আত্মগত চিন্তার' উপরই জোর দেওয়া হয়। এর অর্থ যাই হোক না কেন যদি তা বাস্তব রাজনৈতিক সংগ্রামের সংস্পর্শ-বিবর্জিত হয় তবে তা অসার্থক হবেই। শেষ পর্যন্ত সাহিত্যশিল্পের রাজনৈতিক তাৎপর্য অস্বীকার করে তা দাঁড়াবে আঙ্গিক সর্বস্বতায়।

তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে 'আত্মগত' বিচারের সমস্যা অর্থাৎ লেখকের দৃষ্টিকোণ, ধারণা ও মনোভাবের প্রশ্ন। ১৯৪৪ সালে চুংকিং-এ একদল লেখক তাঁদের রচনার মধ্যে 'প্রাণশক্তির' উপর জোর দিতে থাকেন। চারিদিকের কঠোর

জীবনসংগ্রাম ও অন্ধকারে বিমূঢ় পেটিবুর্জোয়ার মানসেরই প্রকাশ এটা। বাস্তব দুঃসহ বলে একদিকে যেমন হতাশা তেমনই অন্যদিকে অবস্থান্তরের জন্য আবেগও স্বাভাবিক! সাহিত্যে দু'টি ধারাই প্রতিফলিত হল কিন্তু দ্বিতীয়টি সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ করেই দেখা গেল। পরবর্তী দিনে এইটাই 'পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবের' মত হিসাবে প্রকাশ পায়। এ ধারা প্রচণ্ডভাবে হতাশার মনোভাবকে আক্রমণ করে কিন্তু সমস্যার বাস্তব সমাধানে অপরাগ হয়ে 'আত্মগত বিচারের' দাবিকেই জোরদার করে তোলে।

এখানে ধরে নেওয়া হয় যে জীবনের প্রতি লেখকের দৃষ্টি নির্জলা বস্তুনিষ্ঠ হওয়া ঠিক নয়। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানারকম বিচ্যুতি যা দেখা যায় তার কারণ কি সেগুলি বেশী বস্তুনিষ্ঠ, না পেটিবুর্জোয়ার আত্মগত বিচারের প্রতি আসক্তিই তার আসল কারণ? পেটিবুর্জোয়ার দৃষ্টিকোণ, ধারণা বা মনোভাবই যদি লেখককে জনসাধারণ থেকে দূরে রাখে তবে আরো বেশী আত্মগত বিচারে সমস্যার সমাধান হবে না। আসলে এটা হচ্ছে দৃষ্টিকোণের সমস্যা—কি করে লেখক অসংশয়ে পেটিবুর্জোয়া-শোভন আত্মগত দৃষ্টি বর্জন করে চিন্তায় ও জীবনে জনসাধারণের সঙ্গে একত্র হতে পারেন তারই প্রশ্ন।

কুয়োমিনটাং-এর প্রতিক্রিয়াশীল রাজত্বে লেখকদের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন দাবি করা কি ঠিক? নিশ্চয়ই ঠিক, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে চীনের সামাজিক ও বিপ্লবী সমস্যার গভীর পর্যালোচনা এবং মত ও কাজের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টার মধ্যে দিয়েই তা করতে হবে। কিছুটা পরিমাণ গণ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করাও সম্ভব। প্রতিকূল বাস্তবের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত 'প্রাণশক্তির' জোরে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে লড়াই চালিয়ে সুরাহা হবে না—ইতিহাস সৃষ্টি করবে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম।

মনে রাখতে হবে লেখক যদি চিন্তা ও জীবনে পেটি বুর্জোয়ার ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করে মজুর, কিষাণ ও সৈন্যবাহিনীর দৃষ্টিকোণ আয়ত্ত করতে না পারেন তবে সাহিত্যের জনপ্রিয়তার সমস্যা বা সাহিত্যের শিল্পগত ও রাজনৈতিক উৎকর্ষের সমস্যা—কোনটারই সমাধান হবে না। আর লেখকের ব্যক্তিগত মানসের দৃঢ়তা দুর্বলতা, সুস্থতা রুগ্নতা এবং তার দ্বারা তাঁর সৃষ্টি কতটা প্রভাবিত হবে—এ সব প্রশ্নেরও জবাব মিলবে না।

এ সব সমস্যা আজ সমাধানের মুখে; কারণ, দশ বছর পরে বাস্তবের আজ বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। লেখক-শিল্পীর আজ সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত। জন-

সাধারণের সঙ্গে একাত্ম হবার সুযোগ অফুরন্ত। তার সবটাই নির্ভর করবে লেখকেরা এ যুগ ও জনসাধারণের কাছ থেকে কতটা শিখতে পারেন তার ওপর। পুরানো, অকেজোর সঙ্গে নতুনের তফাতটা দেখতে হবে আর তাই প্রকাশ করতে হবে সৃষ্টিতে। পুরানো দিনে সাহিত্যিকেরা যা করেছেন তা তুচ্ছ নয় কিন্তু আগামী দিনের কর্তব্য মনে রেখে তাঁদের দৃষ্টি দিতে হবে পুরানো দিনের দোষত্রুটির ওপর আর আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে সংশোধনের।

'জনগণের নতুন সাহিত্যে' চাউ ইয়াং মুক্ত এলাকায় যে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে তার বিবরণ ও বিশ্লেষণই দিয়েছেন। মাও সে-তুংয়ের ইয়েনান বক্তৃতার পরই নতুন ফসলের প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনের সময় থেকে সাহিত্য ও জনজীবনের সমন্বয়ের কথা উঠেছে। এতদিন পরে মুক্ত এলাকায় পূর্বাচার্যদের স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠছে।

মুক্ত এলাকার নতুন সাহিত্যের বিষয়বস্তু নতুন, চরিত্র নতুন, ভাষা নতুন ও নতুন তার আঙ্গিক। বিষয়বস্তুর দিক থেকে জাতীয় ও শ্রেণী সংগ্রাম এবং নতুন সমাজ সৃষ্টিই হল প্রধান কথা। শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ সৈন্য ও এদেরই সহকর্মী বুদ্ধিজীবীদের ভীড় এই সাহিত্যে—ঠিক নতুন সমাজ ব্যবস্থায় তাদের প্রাধান্যের মতোই। সমস্ত চরিত্রই সংগ্রামের আগুনে ইস্পাতের মত শানিত। বীর হয়ে মানুষ জন্মায় না—সংগ্রামের মধ্যেই তারা বীর হয়ে ওঠে। সেই বীরত্বের, পৌরুষের উন্মেষই হচ্ছে এ সাহিত্যের মুখ্য কথা—সাধারণ মানুষের যে প্রচ্ছন্ন অথচ বিপুল বীর্য সৃষ্টি করছে নতুন জগত। এই বীরত্ব অর্জন করার পথে বাধা অনেক, পিছুটান বহু। তার বিবরণও নতুন চীনা সাহিত্যে মিলবে যদিও তা অতিক্রম করার মধ্যে দিয়ে নতুন মানুষের উদ্ভবই হল সমগ্র বক্তব্যের সার কথা।

জাতীয় বৈশিষ্ট্যের নামে চীনা সমাজে যে সনাতনকে আঁকড়ে থাকার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যেত, লু সুন তার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড শ্লেষ ও শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের শাসনে বহুদিন থাকলে এই রকম আধ্যাত্মিক দুঃখবাদের জন্ম হয়। তিনি এই ধরনের 'জাতীয় বৈশিষ্ট্যের' বিলোপ এবং তার জায়গায় নতুন বলিষ্ঠ, আশায় উজ্জ্বল 'জাতীয় বৈশিষ্ট্যের' জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। অবশ্য জনসাধারণের উজ্জ্বল দিকটার পাশে তাদের অন্ধকার দিকও আছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ও সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের আশ্চর্য অবদানের তুলনায় তাদের ত্রুটির দিকটা

নগণ্য—সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা মোটেই উচিত নয়।

মুক্ত এলাকার নতুন বক্তব্য পেশ করার তাগিদে উদ্ভব হয় নতুন আঙ্গিক, ভাষার নতুন ভঙ্গি। জনসাধারণের সঙ্গে লেখক শিল্পীর সত্যকার একাত্মতা এতদিন পরে সর্বজনবোধ্য সাহিত্য ও জাতীয় ভাষার সমস্যার সমাধান করেছে। সহজ, অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে নতুন বক্তব্য। আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়, বিশেষ লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করা হচ্ছে ভাষার সমৃদ্ধির জন্য। সাহিত্য ছাড়াও গীতিনাট্য, কাঠখোদাই, ছবি প্রভৃতির মধ্যেও চীনা ভঙ্গি ক্রমশই ফুটে উঠছে। পুরানো আঙ্গিক একেবারে বাতিল করা হচ্ছে না, তাকে আত্মস্থ করে রূপান্তরিত করা হচ্ছে নতুন বক্তব্যের উপযোগী করে। আগে সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্যের আঙ্গিককে সেকেলে ও পুরানো মনে করা হত। কথাটা ঠিকই কিন্তু বুর্জোয়া সাহিত্যের আঙ্গিকও কিছু নতুন নয়। চীনের আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার জন্যই পশ্চিমের সব কিছুকে নতুন মনে করার এই প্রবৃত্তি। আসলে গণসাহিত্যের চাহিদার অনুপাতে সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া—দুই সাহিত্যের আঙ্গিকই পুরানো। সেগুলিকে অস্বীকার করা হবে না। তাদের সংস্কার করা হবে নতুনের প্রয়োজন অনুযায়ী। লোককলার আঙ্গিক থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করা হবে কিন্তু অন্য আঙ্গিক, দেশী বিদেশী সমস্ত ঐতিহ্য থেকে সংগ্রহও বন্ধ হবে না।

নতুন চীনে সাহিত্য ও জনসাধারণ, সাহিত্য ও রাজনীতির সম্পর্ক এতটা নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যে সাহিত্যিক বা শিল্পীরা আজ অনায়াসে পাঠক দর্শক শ্রোতাদের মতামত জিজ্ঞাসা করেন, তারই সাহায্যে সমৃদ্ধ করেন আপন সৃষ্টিকে।

একেবারে পেশাদার লেখক বা পেশাদার শিল্পী ছাড়াও মজুর, কিষাণ ও সৈন্যবাহিনীতে আজ ব্যাপক সাহিত্য-শিল্প প্রচেষ্টা চলেছে। সেখানে তাঁরা সহজ, অনাড়ম্বর ভাষায় তাঁদের সংগ্রামের কথা, আশা আকাঙ্খা সমস্যার কথা সরাসরি উপস্থিত করেন। শুধু কবিতা বা রচনা নয়, তাঁরা নিজেদের নাটক পরিবেশন করেন নিজেদের নাট্যচক্র মারফত। এরই সঙ্গে সঙ্গে চলে লোক-কবিদের উৎসাহদান, তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জন। চীনে বড় শহর মুক্তি-ফৌজের হাতে এসেছে পরের দিকে—তাই মজুরদের মধ্যে সাহিত্য-শিল্পের আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে দেরীতে। কিন্তু রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান অপেক্ষাকৃত উঁচু হওয়ায় তাঁদের মধ্যে আন্দোলন ভবিষ্যতে দ্রুত প্রসার লাভ

করবে।

পেশাদার শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে মজুর, কিষাণ, সৈনিক, শিল্পী সাহিত্যিকদের যোগাযোগ উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক। তাঁরা পরস্পরের কাছে শিখতে পারেন অনেক কিছুই।

আর একটা কাজ হল পুরানো সামন্ততান্ত্রিক—যে সাহিত্যের আজও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে তার সংস্কার-সাধন। বিশেষ করে পুরানো নাটকের সংস্কার আজ মস্ত একটা কাজ। পুরানোর জেরটানা নিশ্চয়ই অন্যায় কিন্তু শাসন-তান্ত্রিক ফতোয়া দিয়ে এগুলিকে নিষিদ্ধ করাও ভুল হবে। আসলে তার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র খুলে ধরতে পারলে নাট্যচক্রগুলি তা অভিনয় করতে এবং দর্শকেরা তার অভিনয় দেখতে অস্বীকার করবেন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঐ নাটকের সংস্কার প্রয়োজন যাতে দর্শক, শ্রোতারা পুরানো যুগ সম্পর্কে সঠিক বৃত্তান্ত পান ঐগুলি মারফত। এই সংস্কারের কাজে হঠকারিতা সম্পূর্ণ বর্জনীয়। চীনের নতুন সাহিত্য এখনও চীনের সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের অনেক পিছনে পড়ে আছে। মুক্তি যুদ্ধের বিজয়ের পর নতুন কর্তব্যও এসে হাজির হয়েছে অনেক—জনসাধারণের সর্বব্যাপক মুক্তি সংগ্রাম, তাদের নতুন গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজ, একটা বিরাট কৃষিপ্রধান দেশকে শিল্পপ্রধান করে তোলার কর্তব্য রয়েছে সামনে। এ সবেরই সাহিত্যিক বা শিল্পগত প্রতিফলনই হবে আগামী দিনের নতুন সাহিত্যের মূল কথা। সমাজ-জীবনের প্রত্যেকটি মূল সংঘাতের প্রকাশ সাহিত্যে বা শিল্পে হতেই হবে।

চীনের নতুন সাহিত্যকে তত্ত্বের দিক থেকে আরও সমৃদ্ধ হতে হবে। এর অর্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে-তুঙের চিন্তা পুরোপুরি আয়ত্ত করা। তবেই সমস্ত জটিল সামাজিক ঘটনাবলীর মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে—সম্ভব হবে সুষ্ঠুভাবে সাহিত্যে শিল্পে তার প্রকাশ।

শুধু এইভাবেই সম্ভব একই সঙ্গে জীবনের সমস্ত দিকের সুতীক্ষ্ন, স্পষ্ট প্রতিফলন আর দৃঢ়ভাবে কর্মনীতি প্রচার। কোনো এক সময়ের কোনো এক নীতি প্রচারের খাতিরে জীবনের মূল বাস্তব সত্যকে বিকৃত করারও প্রয়োজন হবে না, আবার জীবনের আংশিক ও অতি সূক্ষ্ম 'বাস্তবতা' প্রকাশ করতে গিয়ে কর্মনীতির পিছনকার আদর্শকেও ক্ষুণ্ণ করতে হবে না। নতুন সত্যবাহক চরিত্রগুলিও তাহলে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারবে—শুধু নেতিবাচক চরিত্রই সাহিত্যের আসর জুড়ে থাকবে না। শুধু মজুর-

কিষাণের বাস্তব অবস্থা বা সমস্যা নয়, নেতৃত্বের বাস্তব অবস্থা ও সমস্যাও সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে। ইয়েনান সম্মেলনের পর প্রথম কাজটা ভালই হয়েছে, এখন বিশেষ করে দ্বিতীয়টার দিকে নজর দিতে হবে।

কর্মনীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে লেখক বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক, তাঁদের মতবাদগত প্রচেষ্টা ও ভবিষ্যতের কথা বলতে গিয়ে সামাজিক শ্রেণীগুলির সম্পর্ক ও সংগ্রাম—শ্রেণীগুলির জীবন, চরিত্র, মতবাদগত প্রচেষ্টা ও ভবিষ্যতের কথাও প্রকাশ করতে পারবেন। কর্মনীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে লেখক জীবনের তুচ্ছ, আংশিক, আত্মগত বা ব্যক্তিগত ভাবালুতার দিকটা নির্বাচন করে জেনে বা অজ্ঞাতসারে জীবনকে বিকৃত করার হাত থেকে বাঁচতে পারবেন। নীতির জায়গায় ব্যক্তিগত মর্জিকে স্থান দেওয়া সৃষ্টিশীল সাহিত্যের পক্ষে মারাত্মক। অবশ্য সাহিত্যে নীতি প্রচারের উৎস হওয়া চাই বাস্তব জীবননীতির আক্ষরিক নির্দেশ মাত্র নয়।

আঙ্গিককৌশল অবশ্যই আমাদের আয়ত্ত করতে হবে কিন্তু আঙ্গিকসর্বস্বতা এড়াতে হবে—বিষয় ও আঙ্গিককে বিচ্ছিন্ন করা বা পশ্চিমা আঙ্গিককেই একমাত্র আদর্শ মনে করা ভুল।

সমগ্র সাহিত্য আন্দোলনের দিক থেকে এখনও জনপ্রিয়তার সমস্যাই মূল সমস্যা। শুধু নতুন মুক্ত এলাকাতেই নয়, পুরানো এলাকাতেও সাহিত্যকে জনপ্রিয় করাই হল প্রধান কর্তব্য। নতুন অবস্থায় শহরের ওপর আমাদের জোর পড়ছে বলে গ্রামকে ভুললে চলবে না—মাও সে-তুংয়ের কথা মনে রাখতে হবে "জনসাধারণের সংস্কৃতির অর্থ কৃষকের সংস্কৃতির মান উঁচু করা।" শহর ও গ্রামের সংস্কৃতি বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ করতে হবে।

নতুন পাঠককে পদে পদে সাহায্য করার জন্য চাই নতুন সমালোচনা। সত্যকার সমালোচনার অভাবে অনেক লেখককে পথ হাতড়ে মরতে হয়। মাও সে-তুঙের সূত্র প্রয়োগ করে মজুর, কিষাণ ও সৈনিক সাধারণের যৌথ চিন্তা প্রকাশ করাই সমালোচনার কাজ। সাহিত্যকর্মীদের মধ্যে সমালোচনার ফলে আত্মসমালোচনার প্রবৃত্তির উদ্রেক হওয়া চাই—তাঁদের সৃষ্টির মতবাদগত ও সাহিত্যিক উৎকর্ষের উন্নতি ঘটা চাই। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে মতবাদগত নেতৃত্বের হাতিয়ার হল সমালোচনা। এরই জন্য গড়ে তুলতে হবে শক্তিশালী সাংগঠনিক নেতৃত্ব।

('পরিচয়', চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৫৭-৫৮)

প্রগতি-লেখক আন্দোলনের পৃষ্ঠপট

'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠার পর দেখতে দেখতে প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেল। ঐ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সেদিন যে আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল অনেকদিন পর্যন্ত তার প্রভাব আলোড়িত করে এদেশের লেখক ও বুদ্ধিজীবী মহলকে। বিশেষ করে বাঙলা দেশে বিশিষ্টতম সাহিত্যিকরাও একদা ঘনিষ্ঠ ছিলেন সংঘের সঙ্গে। পরে সংগঠনটি ক্রমশ নিস্তেজ হতে হতে অবশেষে ১৯৫৩ সন নাগাদ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। উর্দু লেখকরা অবশ্য সম্প্রতি বোম্বাই-এ তাঁদের প্রগতি লেখক সংঘটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁদের এই উদ্যম খুবই অভিনন্দনযোগ্য। তবু মানতেই হবে সারা দেশে ঐ সংঘের অস্তিত্ব আর নেই পনেরো বছর আগেকার মতো। কেন এমনটা ঘটল, কি ছিল আন্দোলনের দুর্বলতা, তার স্থায়ী কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা দেশের সাহিত্যের উপরে—এসব প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক ও জরুরী। তবু সে-বিচার বা সাধারণভাবে আন্দোলনের সার্থকতা মূল্যায়নের কোনো প্রচেষ্টা এখানে করব না। শুধু প্রগতি লেখক সংঘের সূচনা কোন বাস্তবের তাগিদে, তার প্রতিষ্ঠাতারা কোন ভাবনার ভাবুক ছিলেন, কোন লক্ষ্য নিয়েই বা তাঁরা সেদিন শুরু করেছিলেন তাঁদের দুঃসাহসী যাত্রা—এ সবের কিছুটা পরিচয় দানই এ লেখার উদ্দেশ্য। গত দশ বছরে যে তরুণ লেখক বন্ধুরা কলম ধরেছেন তাঁদের কিছুটা আগ্রহ হয়তো থাকতে পারে এ বৃত্তান্ত সম্পর্কে।

সময়টা ত্রিশের কোঠার প্রায় মাঝামাঝি। পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের কিছুটা বিলম্বিত ধাক্কায় এ-দেশ তখন বিপর্যস্ত। তারই পটভূমিতে কংগ্রেস পরিচালিত যে বিপুল গণ-আন্দোলনের সূচনা এ-সময়ে তাও আবার চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত। সেই ব্যর্থতার গ্লানি ও লাঞ্ছনা তরুণদের মধ্যে পুরাতন নেতৃত্বের লক্ষ্য ও পন্থা সম্পর্কে গভীর সংশয়ের উদ্রেক করে। শুরু হয় তাঁদের আত্মজিজ্ঞাসা। এরই সূত্র ধরে তরুণদের একাংশ

শ্রমিক ও কৃষক সংগ্রামের শরিক হওয়ার একান্ত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকেন ক্রমে ক্রমে। নওজোয়ান সভা ও ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার কাজেও তাঁরা অগ্রণী হন। এই সব তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাদী চিন্তাও তাঁদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে অল্পবিস্তর। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের ভিতরেও সমাজবাদী শক্তি দানা বাঁধতে বাঁধতে আত্মপ্রকাশ করে একটি সমাজবাদী সংগঠনরূপে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ, বিশেষ করে আসামীদের (এঁদের অনেকে প্রায় এক দশক আগে থেকেই শুরু করেছিলেন তাঁদের সাধনা) বিবৃতি সংবাদপত্র মারফত সাধারণ পাঠককেও কিছুটা পরিচিত করে সমাজবাদী ভাবধারা ও সোভিয়েত দেশের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। এ-ছাড়া Sea Custom Act-এর সতর্ক পাহারা এড়িয়ে মাঝে মাঝে দু-একটি পুস্তক পুস্তিকা নবযুগের বাণী বহন করে আনত তখনকার দিনের তরুণদের কাছে।

প্রগতি লেখক আন্দোলনের এই পৃষ্ঠপটটি স্পষ্টতই রাজনৈতিক। তার জন্য কোনো সংকোচ বা জবাবদিহির প্রয়োজন দেখি না। প্রচণ্ড আঘাতের পর সম্বিৎ লাভ করে সমগ্র জাতির জীবন ও চেতনা যখন ক্রমশ নতুন ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল তখন জাতীয় বিবেকের বাণীমূর্তি লেখকরাও যে সেদিন সেই আলোড়নে মথিত হয়েছিলেন এবং সে চাঞ্চল্য সঞ্চারনের চেষ্টা করেছিলেন জনসাধারণের মধ্যে, এ-তো তাঁদের পরম গৌরবের কথা। আন্দোলনের ঐ আদিপর্বে সাহিত্যকর্মের জটিলতা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির চাইতেও তখন স্বাভাবিক ছিল বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এবং সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সাহিত্যিক প্রগতির সাযুজ্যের অসংকোচ স্বীকৃতি। সেই ঘোষণা নিয়ে আবির্ভাব হল—'প্রগতি লেখক সংঘে'র।

একটি কথা বলা প্রয়োজন এ প্রসঙ্গে। এই ব্যাপক পৃষ্ঠপটের অন্য একটি দিক ছিল যার প্রভাব প্রগতি লেখক আন্দোলনের উন্মেষ মুহূর্তে আরো প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর হয়েছিল। সেটি সাহিত্যিক মহলের চিন্তাভাবনা সম্পর্কিত। দেশে বিদেশে বাস্তব অবস্থার যে নির্মম রূপ সেদিন প্রকট হয়েছিল তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না নিছক স্বপ্নাতুরতায় বিভোর থাকা। আবার বিশের কোঠায় তরুণদের মধ্যে যে রোমান্টিক 'বিদ্রোহ' প্রবণতা দেখা গিয়েছিল তার দৌড়ও ক্রমস্ফুট হচ্ছিল অনেকের চেতনায়। এক্ষেত্রেও নতুনের ইঙ্গিত সর্বপ্রথম

ধরা পড়েছিল রবীন্দ্রমানস মুকুরে। ১৯২৪ সনে 'রক্তকরবী'র প্রকাশ, ১৯২৬ সনে রলাঁর সহায়তায় ফ্যাসিজমের স্বরূপ উপলব্ধি, রলাঁ বারব্যুস পরিচালিত 'যুদ্ধ ও ফ্যাসিজম বিরোধী আন্দোলনের' সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং ১৯৩০ সনে সোভিয়েত ভ্রমণ ও 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশ সাহিত্যিক সমাজ ও পাঠক মহল উভয়েরই রুচিকে প্রস্তুত করে তুলছিল ধীরে ধীরে। বাঙালী পাঠকের মন যে কোন্ ধরনের সাহিত্যের জন্য তৃষিত হয়ে উঠেছিল তার একটি প্রমাণ গর্কীর 'Mother' উপন্যাসের বাংলা তর্জমার জনপ্রিয়তা। তার দু'টি সংক্ষিপ্ত বাংলা তর্জমা ঐ সময় থেকে প্রকাশিত হতে থাকে সংস্করণের পর সংস্করণ।

অর্থাৎ দেশের বাস্তব পরিস্থিতি, সাহিত্যিক সমাজের অন্তত একাংশের মনোভাব ও পাঠক সাধারণের চাহিদা—প্রগতি লেখক আন্দোলন ধারার উৎস সন্ধান করতে হবে এ সবেরই অবস্থান্তরের গভীরে।

নতুন সাহিত্য আন্দোলনের উপযোগী ক্ষেত্র দেশের বুকেই প্রস্তুত হতে থাকলেও সাক্ষাৎ তাগিদ কিন্তু এল বাইরে থেকে। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ সনের মধ্যে বিলাতে প্রবাসী কিছু ভারতীয় তরুণ এ দেশের অন্যান্য তরুণদের মতোই গভীর মর্মপীড়া বোধ করছিলেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপর্যয়ে। স্বদেশ থেকে দূরত্বের দরুন এঁদের অন্তর্দাহ হয়তো আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল। সংকটমুক্তির পথের জন্য এঁরা তাই মাঝে মাঝে আলোচনা চালাতেন নিজেদের মধ্যে। বিলাতে তখন সমাজবাদের প্রভাবে তরুণ বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রমহলে প্রগতিশীল চিন্তা ও সাহিত্যধারা কিছুটা দানা বাঁধছিল যার প্রকাশ পরে দেখা যায় New Writing আন্দোলনের মধ্যে। ভারতীয় তরুণদের মধ্যে ছিলেন মুল্‌করাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জহীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানী ভট্টাচার্য, মুহম্মদ আশরফ, ইকবাল সিং, জয়নুল আবেদীন আহ্‌মদ, মামুদজ্জাফর, রাজা রাও, আহমেদ আলি প্রভৃতি সাহিত্য, ইতিহাস ও অর্থনীতির কৃতী ছাত্র। সমাজবাদ ও সমাজবাদ-প্রভাবিত প্রগতিশীল চিন্তা স্বভাবতই এঁদের আকৃষ্ট করল প্রবলভাবে এবং সাহিত্যের প্রতি নিবিড় অনুরাগের দরুন এঁদের অনেকেই ঝুঁকলেন প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের দিকে।

আর সর্বশেষে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল এই উদাত্ত ঘোষণা ঃ

"আমরা এই সুযোগে আমাদের এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করতে চাই ; যুদ্ধে আমাদের

কোনো স্বার্থ নাই। কোনো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগদানের আমরা ঘোর বিরোধী ... ।"

প্রায় পনেরো বছর আগের এই ভারতীয় মনীষীদের বাণী আজকের দিনে বিশেষ করেই স্মরণীয়।

সর্বভারতীয় সংঘ ১৯৩৬ সনের শেষ দিকে 'Towards Progressive Literature' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করে। লেখকদের মধ্যে ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সাজ্জাদ জহীর, মামুদজ্জাফর, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সুধিবৃন্দ। এখানে মূল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রচলিত সাহিত্যধারা ও পুরাতন আঙ্গিকের সমালোচনা তোলা হয় একাধিক প্রবন্ধে।

বাঙলা দেশে তখন 'প্রগতি লেখক সংঘে'র সভাপতি ছিলেন ড. নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। এ ছাড়া হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন সংঘের কাজকর্মে। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরণকুমার সান্যাল, আবু সঈদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ ও নবীন লেখকেরা। এঁদের অনেকেই ছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মন্মথ সান্যাল, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত প্রভৃতি সংঘের ঘনিষ্ঠরা অনেকেই ছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত। বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়ে গোপাল হালদার মহাশয়ও যোগ দিলেন লেখক সংঘে।

১৯৩৭ সনে বাঙলা দেশের অনেক জেলায় সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। প্রবন্ধ বাদেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির গল্প বা কবিতা লেখার রেওয়াজও শুরু হয় এই সময়ে। মনোরঞ্জন হাজরার 'নোঙরহীন নৌকা' ও 'পলিমাটির ফসল' এবং গোপালবাবুর 'একদা' এই দিক দিয়ে অগ্রণী প্রচেষ্টা। 'প্রগতি' নামে একটি সংকলনও প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সনে। উপরে যাঁদের নাম করা হল তাঁরা বাদে এ সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, সজনীকান্ত দাস প্রভৃতির রচনা। এর থেকে তখনকার লেখক সংঘের ব্যাপ্তির কিছুটা পরিচয় মিলবে। আর সংকলনের ভূমিকায় সভাপতি ড. নরেশচন্দ্র

সেনগুপ্তের এই কথাক'টি থেকে বোঝা যাবে যে উদ্যোক্তারা উদাসীন ছিলেন না সাহিত্যসৃষ্টি প্রক্রিয়ার জটিলতা সম্পর্কে ঃ

"দল বাঁধিয়া সাহিত্য রচনা হয় না। প্রগতি করিব—এই প্রতিজ্ঞা করিয়াও সব সময়ে সৎসাহিত্য রচনা করা চলে না। দল বাঁধিয়া প্রগতি সাহিত্য রচনা করিব, এ উদ্দেশ্য এ সংঘের নাই। সংঘের সভ্যগণের উপর প্রগতির দাবি ধরিয়া বাঁধিয়া প্রচার করিতেও সংঘ চাহেন না। কিন্তু যাঁরা প্রগতিকামী সাহিত্যিক তাঁহাদিগকে সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া, প্রগতি সাহিত্যের সম্যক প্রচার, আলোচনা ও গবেষণা করিয়া, পরস্পর আনুকূল্যের দ্বারা 'প্রগতি লেখক সংঘ' সাহিত্যে নিয়ত প্রগতির অনুকূল অবস্থা ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবার ভরসা রাখেন। ইহাই সংঘের লক্ষ্য ও ব্রত।"

এ সব লক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে প্রগতি লেখক আন্দোলন ক্রমশ দানা বাঁধছিল বাঙলা দেশে। তবু অনিবার্য প্রাথমিক স্বতঃস্ফূর্তি কাটিয়ে সত্যকার সংগঠিত আন্দোলন শুরু হয় দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনের পর। এর অধিবেশন হয় কলকাতায় ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসে। সম্মেলনের সভাপতি-মণ্ডলী গঠিত হয় মুল্‌করাজ আনন্দ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত সুদর্শন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ এবারেও একটি বাণী পাঠান সম্মেলনে। তা'তে এশিয়ার নবজাগরণের কথা তিনি বিশেষভাবেই উল্লেখ করেন। আর সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক, লোক-কাব্য ও শিল্প, সাহিত্যে মতবাদের প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনায় যোগ দেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, ড. আবদুল আলিম, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কবি মাজাজ, হিরণকুমার সান্যাল, আলি সর্দার জাফরি, বলরাজ সাহনী, আহমদ আলি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা লেখকবৃন্দ।

১৯৩৫ সনের যে ইস্তাহারটির কথা আগে উল্লেখ করেছিলাম কিছু রদ-বদলের পর সেটিই গৃহীত হল এ সম্মেলনেও। তার কিছু উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না এইখানে ঃ

'সনাতন সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে আটপৌরে জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাবার আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমাদের সাহিত্য প্রত্যক্ষ ও প্রাকৃতিককে ছেড়ে অপ্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিকের দিকে ধাবিত হয়েছে—ফলে তার রচনাভঙ্গী অন্ধ নিয়মানুগত্যের বিষম

জালে জড়িয়ে পড়েছে, তার ভাবসম্পদ হয়েছে রিক্ত ও বিকৃত।

'আমাদের সমাজ যে নবরূপ ধারণ করছে তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে প্রগতিকামী মননধারাকে বেগবান করা আমাদের লেখকদের কর্তব্য।...সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, যৌন স্বৈরাচার, সামাজিক অবিচারের যে ছায়া সাহিত্যে পড়েছে, তার অপসারণের জন্য তাঁদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।

'...আমরা চাই জনজীবনের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ...

'ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ আমরা তার উত্তরাধিকার দাবী করি। আমাদের দেশে নানারূপে যে প্রগতিদ্রোহ আজ মাথা তুলেছে তাকে আমরা সহ্য করব না।......আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যকে আমাদের বর্তমান জীবনের মূলসমস্যা—ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মন্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতিবিরোধ বলে প্রত্যাখান করি। যা কিছু আমাদের বিচার বুদ্ধিকে জাগ্রত করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতি-নীতিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।"

এই ইস্তাহার গ্রহণ ও উপযুক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি লেখক আন্দোলনের শৈশবকাল উত্তীর্ণ হয়।

দেশে ফিরে এঁদের কয়েকজন ১৯৩৬ সনে প্রবাসের সেই আলোচনার জের টানলেন 'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে। এই ইস্তাহারটিই কিছু রদবদলের পর কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সম্মেলনে গৃহীত হয় ১৯৩৮ সনে।

'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগ পর্ব ও তার প্রধান উদ্যোগীদের চেহারা ধরা পড়ে প্রথম সংখ্যা 'New Indian Literature'-এ (সর্বভারতীয় 'প্রগতি লেখক সংঘে'র এটি ছিল মুখপত্র) প্রকাশিত ড. মুল্‌করাজ আনন্দের এই লেখায়ঃ

It is almost uncanny to look back upon these dark, foggy November days of the year 1935 in London when after the

disillusionment and disintegration of years of suffering in India and conscious of the destruction of most of our values through the capitalist crisis of 1931, a few of us emerged from the slough of despond of the cafe's and garrets of Bloomsbury and formed the nucleus of the Indian Progressive Writers Association.

এঁদেরই কয়েকজনের উদ্যোগে ১৯৩৬ সনে প্রথম সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় লক্ষ্ণৌ শহরে। সম্মেলনে আশীর্বাণী পাঠান রবীন্দ্রনাথ ও সভাপতিত্ব করেন মুন্সি প্রেমচন্দ। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, বিখ্যাত উর্দু লেখক ও রাজনীতিজ্ঞ মৌলনা হসরৎ মোহানী প্রমুখ সুধীবৃন্দ সাগ্রহে যোগ দেন সম্মেলনে। এই সম্মেলনেই জন্ম হয় প্রগতি লেখক সংঘের।

লক্ষ্য করার ব্যাপার এই সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস মণ্ডপে এবং এতে যোগ দেন বেশ কিছু কংগ্রেস প্রতিনিধি অথচ তার জন্য সেদিন কোনো জবাবদিহি দাবি করা হয় নি উদ্যোক্তাদের কাছে। এ'ও লক্ষণীয় যে সর্বভারতীয় কৃষক সভা ও ছাত্র প্রতিষ্ঠানেরও জন্ম ঐখানেই। আসলে বাস্তব পরিস্থিতির যে অবস্থান্তরের তাগিদে ঐ দু'টির উদ্ভব, 'প্রগতি লেখক সংঘে'র জন্ম সেই মৌল চাহিদা মেটানোর নিমিত্তই—অবশ্য ভিন্নক্ষেত্রে।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রগতি লেখক সংঘ যোগাযোগ করে রলাঁ-বারবুস পরিচালিত 'World Congress for the Defence of Peace' নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। ঐ বিশ্ব সম্মেলনের প্যারিস, ব্রাসেল্‌স ও মাদ্রিদ অধিবেশনে ভারতীয় সংঘের পক্ষ থেকে ড. মুল্‌করাজ আনন্দ যোগ দেন প্রতিনিধি হিসেবে। ১৯৩৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাসেলস অধিবেশনে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষীদের একটি বাণী প্রেরিত হয়। 'প্রগতি লেখক সংঘে'র উদ্যোগে (পরে প্যারিসের সংস্কৃতি রক্ষা সম্মেলনেও এটি পাঠানো হয়েছিল)। এর প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র, মুন্সি প্রেমচন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল বসু, জওহরলাল নেহরু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এই বাণীতে ছিল ঃ

"......উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া এবং জঙ্গীবাদ আজ সভ্যতার ভাগ্য লইয়া খেলা করিতেছে এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং আমরা ইহার বিরুদ্ধে ভারতের লেখক ও শিল্পীগণের এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির

প্রতি যাঁহাদের দরদ আছে তাঁহাদের সকলের প্রতিনিধিরূপে প্রতিবাদ জানানো অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। এ সময়ে আমাদের নীরব থাকা অপরাধ হইবে, সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তাহার ঘোর ব্যত্যয় করা হইবে।"

ভারতবর্ষের মানুষকে যেভাবে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তা শুধু রাজনীতির দিক দিয়েই ক্ষতিকর নয়, সংস্কৃতি ও জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতি বিস্তারের চেষ্টাও যে তার ফলে বিপর্যস্ত হচ্ছে—এ বক্তব্যও ঐ বাণীতে ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কুখ্যাত **Sea Customs Act** অনুযায়ী প্রগতিশীল পুস্তক-পুস্তকাদি আটক, রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরাজী অনুবাদের উপরে নিষেধাজ্ঞা, ওয়েব দম্পতির সুপরিচিত **'Soviet Communism—a New Civilisation'** গ্রন্থের আমদানী বন্ধের নির্দেশ, খ্যাত নামা ব্যঙ্গ-চিত্রকর ডেভিড লো-র **'Russian Sketch Book'** বাজেয়াপ্ত করার কাণ্ডজ্ঞানহীন আদেশের উল্লেখ করা হয় এ প্রসঙ্গে।

('পরিচয়', ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬৭)

ফুল ও আগাছা

ফুল-ফোটানোর গান শেষ না হতেই এসেছিল আগাছা নিড়োনোর হাঁক। কেমন জানি বেয়াড়া ঠেকলেও কেউ কি সেদিন ভাবতে পেরেছিলেন দশ বছরে ইয়াংসির জল সত্যিই এতদূর গড়াবে?

চীন থেকে সম্প্রতি 'সংস্কৃতিবিপ্লবে'র যে সব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে স্বভাবতই সমাজতন্ত্রের শত্রুশিবিরে উল্লাসের বান ডেকেছে। ঘটনার উপরে কুৎসার রসান চড়িয়ে বেপরোয়া রটনা চলেছে—এই তো হল কমিউনিজমের স্বরূপ! আবার কিউবা থেকে মঙ্গোলিয়া, ফিনল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া—পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মার্কসবাদীরাও প্রত্যহ প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এ-তাণ্ডবের বিরুদ্ধে। ফলে সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ সর্বত্রই বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছেন—ব্যাপারটা তা হলে কি দাঁড়াল?

আমাদের দেশেও অবস্থা একই রকম। তবে সমাজতন্ত্রের আদর্শে আস্থাবান বলে পরিচিত কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী মহলে চীনের সংস্কৃতিবিপ্লবের প্রতি কিছুটা সমর্থন এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ কেউ তো 'কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ির' উল্লেখমাত্র করে প্রায় ষোল আনা মতৈক্য ঘোষণা করেছেন এ বিপ্লবের সঙ্গে—সে উল্লেখও ঘটেছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কৃতিবিপ্লব সংক্রান্ত প্রস্তাবে ও চীনা নেতাদের বক্তৃতায় অনুরূপ উল্লেখের পরেই। একটি সুপরিচিত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আসন্ন-যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এ-ধরনের কড়াকড়ি—যতই একদিকে হাস্যকর ও অন্যদিকে মর্মান্তিক ঠেকুক না কেন—আসলে অনিবার্য। শুধু অনিবার্য নয়, শেষপর্যন্ত ফলপ্রসূও বটে, কারণ উদ্যত ফ্যাসিস্ট মুষলের মুখোমুখি সোভিয়েত ইউনিয়নের রক্তক্ষয়ী purge-এর তারিফ ইতিহাস একদিন ঘাড়ে ধরে আদায় করে নিয়েছিল স্বয়ং চার্চিল সাহেবের কাছ থেকেও। আবার আর এক সুপরিচিত বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক 'চীনদেশের সাম্প্রতিক

সংস্কৃতি-বিপ্লবের আতিশয্যের' সমর্থক না হলেও এবং 'চীনাদের রাজনীতি, যুদ্ধনীতি' পছন্দ না করলেও এ আন্দোলনের মধ্যে 'পার্টীর শুদ্ধীকরণের' লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন আর তাই দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জমান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও চেয়েছেন অমনি এক সংস্কৃতিবিপ্লব।

এর মধ্যে প্রথমোক্তরা 'বাড়াবাড়ির' কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করলেও কিন্তু বিপ্লবের কোন অনুষ্ঠানটিকে যে তাঁরা 'বাড়াবাড়ি' মনে করছেন তা বিশদ করে বলেন নি, ঠিক যেমন চীনা পার্টির সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবে বা তাঁদের নেতাদের ভাষণেও তা বলা হয় নি (চু এন-লাই মাদাম সুন্-এর উপরে হামলা করতে 'রেড গার্ডদের' বারণ করেছেন—এ খবরটি কতদূর সঠিক বলতে পারি না)। কাজেই অনির্দিষ্ট ধরনের 'বাড়াবাড়ির' উল্লেখের ভিতরে যে সমালোচনাটুকু আছে তা নিতান্তই মোলায়েম ও তুচ্ছ।

ইংরেজি সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় মন্তব্যে কিন্তু বিষয়টিকে কিছুটা বিশদ করা হয়েছে, যেমনঃ 'Revolutionary vigilance does not mean physical attacks on such persons ('capitalists') by the heady young, some of whom tend to be hooligans when entrusted with too much responsibility and when admissions to educational institutions have been put off for a while', 'No doubt many innocent people will suffer in the process,' 'Inevitably, aberrations will accompany the cultural revolution,' 'Shakespeare and Bethoeven will survive their denigrators just as the denigrators themselves will soon be short of breath' ইত্যাদি। চীনে সংস্কৃতিবিপ্লবের নামে কি ঘটছে এবং মোটের উপরে সে-বিপ্লবের সমর্থক হয়েও কাকে যে সম্পাদক মহাশয় 'বাড়াবাড়ি' মনে করেছেন, এর থেকে তা খানিকটা আঁচ করা চলে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিপ্লবের সাফাই দেওয়া হচ্ছে এইভাবেঃ 'If this time the vigilance is prolonged and harsh, it will be because of the war tension' আর এই প্রসঙ্গেই তোলা হয়েছে ফ্যাসিস্ট তাণ্ডবের সম্মুখীন সোভিয়েত ইউনিয়নের purge-এর কথা।

তুলনাটি সঠিক কিনা জানি না। বরঞ্চ 'প্রলেট্ কাল্ট' পর্বের কাণ্ডকারখানা বা ঠাণ্ডা যুদ্ধের শুরুতে জ্দানভ নীতি ও আচরণের সঙ্গেই যেন এই চীনা সংস্কৃতি বিপ্লবের মিল খুঁজে পাই বেশি। তবু সে আলোচনায় না গিয়েও

সাধারণভাবে 'war tension' সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা চলে। মার্কিন যুদ্ধপিপাসুদের তরফ থেকে আজ ভিয়েতনামের আগুন আরো ছড়িয়ে দেবার অপচেষ্টার যে বিরাম নেই তা বলাই বাহুল্য। তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নের চারিদিকে অজস্র মার্কিন সামরিক ঘাঁটির বেড়াজাল গুটিয়ে ফেলার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না কিছুমাত্রও। আবার বার্লিনে দেওয়াল তুলেই কি আর নিশ্চিন্তে ঘুমোনোর যো আছে পূর্ব-জার্মানির? আর খাস মার্কিন মুল্লুক থেকে ৯০ মাইল দূরে কাস্ত্রোর অতন্দ্র প্রহরীরা যে বন্দুকের ঘোড়া থেকে তাঁদের আঙুল তুলবারও ফুসরৎ পাচ্ছেন না—তাও তো কারো অজানা নেই। এই অতি বাস্তব 'war tension'-এর চাপে নিশ্চয়ই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাজেটে সামরিক খাতের খরচ আগের থেকে বেড়েছে কারণ অপ্রস্তুত অবস্থায় মার খেতে কে চাইবে? কিন্তু এর মধ্যে কোথাও কি দেশনেতারা এমন গণ-হিস্টিরিয়ার প্ররোচনা যোগাতে আসরে নেমেছেন সংস্কৃতিবিপ্লবের দোহাই পেড়ে? যুদ্ধের আশঙ্কা-গ্রস্থ শুধু নয়, পৃথিবীর সবচাইতে পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রচণ্ড সামগ্রিক যুদ্ধে পুরোপুরি ব্যাপৃত ভিয়েতনামেও তো কই এমন ঘটনা শোনা যায় নি, এখনো যাচ্ছে না?

তাছাড়া ঘনায়মান ফ্যাসিস্ট বিভীষিকার মুখোমুখি সোভিয়েত ইউনিয়নেও ঐরকম ঘটেছিল—এমন কি এর চাইতেও বেশি মাত্রায় ঘটেছিল, সুতরাং চীনে আজ ৩০ বছর পরে যদি তাই ঘটে তবে বলার কিছু নেই—ঐ সহজ যুক্তিটাকেই ১৯৫৬ সনে প্রবলভাবে খণ্ডন করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নেরই কমিউনিস্টরা—তাঁদের পার্টির ২০-তম সম্মেলনে। তাঁরা বলেছিলেন দেশের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখার জন্য কঠোরতর বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রয়োগ এক জিনিস আর দেশের সমাজতান্ত্রিক আইন বেমালুম লঙ্ঘন করে নির্বিচারে চণ্ডনীতি প্রয়োগ ও সন্ত্রাসসৃষ্টি আর এক ব্যাপার। তাঁদের মতে সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৩৪ সনের পর থেকে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল নিশ্চয়ই কিন্তু নিরাপত্তারক্ষার নামে এক স্বৈরাচারী শাসনও গড়ে উঠেছিল উত্তরোত্তর ও তার ফলেই উদ্ভব হয়েছিল নানা অনাচার, নানা অনর্থের। কাজেই তাঁদের সেই মর্মান্তিক পর্বকে অন্যের পক্ষে অনুসরণীয় নজীর হিসাবে তুলে ধরতে তাঁরা অস্বীকার করেছিলেন সজোরে।

শুধু তাঁরাই বা কেন সারা পৃথিবীর কমিউনিস্টরাই বহু আলাপ-আলোচনা

তর্ক-বিতর্কের পর মূলত মেনে নিয়েছিলেন সে-বিশ্লেষণের সারবত্তা এবং সোভিয়েত পার্টির ২০-তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির যাথার্থ্য। এমনকি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেস (১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসটিই এখন পর্যন্ত চীনা পার্টির শেষ কংগ্রেস) উদ্বোধন করতে গিয়ে স্বয়ং মাও সে-তুং-ও সেদিন বলেছিলেন ঃ...'At its 20th Congress held not long ago, the Communist Party of the Soviet Union formulated many correct policies and criticized shortcomings which were found in the Party. It can be confidently asserted that very great developments will follow on this in its work.

The tasks confronting us today are in general similar to those confronting the Soviet Union in the early period following its foundation. In transforming China from a backward, agricultural country into an advanced, industrialized one, we are confronted with many strenuous tasks and our experience is far from being adequate. So we must be good at studying. We must be good at learning from our fore-runner, the Soviet Union...'ইত্যাদি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ দূরে থাক, কিছুদিন পর থেকেই তাঁরা ক্রমশ দূরে সরে গেছেন সোভিয়েত তথা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সিদ্ধান্ত ও তার পিছনকার চিন্তাধারা থেকে। তাঁদের কথায়, কাজেও উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের মনোভাব। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৩ সনের মাঝামাঝি নাগাদ তাঁরা খাড়া করেছেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এক বিশ্লেষণ ও কর্মকাণ্ডের প্রস্তাব।

এই কর্মকাণ্ডেরই এক অপরিহার্য অঙ্গ হল সাম্প্রতিক 'সংস্কৃতিবিপ্লব'। আর তাই বাংলা সাপ্তাহিক সম্পাদক মহাশয়ের 'চীনের রাজনীতি, যুদ্ধনীতি' বাদ দিয়ে শুধু তাঁদের সংস্কৃতিনীতি স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অবাস্তব। কারণ সেই রাজনীতি ও যুদ্ধনীতিরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ এই উন্মত্ত সংস্কৃতিনীতি। আর 'স্পার্টান শুদ্ধীকরণ' বলতে তিনি কি বোঝেন জানি না, সেটা কতখানি কাম্য সে-সম্পর্কেও নিশ্চিত নই, কিন্তু তার নামগন্ধও যে এই হুল্লোড়বাজির দ্বারা সম্ভব নয়, এ-বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে এ বিপ্লব সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'The great proletarian cultural revolution now unfolding is a great revolution that touches people to their very souls and constitutes a new stage in the development of the socialist revolution in our country, a deeper and more extensive stage'। অথচ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এমন একটা নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর সম্পর্কে বিবেচনার জন্য—বিশেষ করে যখন আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে ব্যবধানটা উত্তরোত্তর দুস্তর হয়ে উঠেছে—তখনো তার জন্য পার্টি কংগ্রেস ডাকার প্রয়োজন হল না। দশ বছর আগে শেষ (অষ্টম) কংগ্রেসে যে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়েছিল, যার থেকে আবার ইতিমধ্যে বেশ কিছু নেতা বিতাড়িত হয়েছেন 'for taking the capitalist road,' সেই কেন্দ্রীয় কমিটিই সাব্যস্ত করল যে মহাবিপ্লব ঘটাতে হবে সরকারী প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন স্তরের পার্টি কমিটি মারফৎ নয়, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষাণ সমিতি মারফৎ নয়, এমন কি 'ইয়ং কমিউনিষ্ট লীগে' সংঘবদ্ধ তরুণদের দিয়েও নয়—বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলি অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রেখে অর্বাচীন ছাত্র ও তরুণদের দিয়েই। বলা বাহুল্য ১৯৫৬ সনের পর থেকে সারা পৃথিবীর কমিউনিস্টরা অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতায় ঠেকে যা কিছু শিখেছিলেন এবং যে আচরণবিধি স্থির করেছিলেন তার প্রত্যেকটিই লঙ্ঘিত হচ্ছে এ-সবের ফলে।

তাই ইটালিয়ান কমিউনিস্ট নেতা, ন্যাপলিটানোর ভাষায় "not only 'excesses,' but also the very criteria which serve as a basis for the 'proletarian cultural revolution' are at variance with the correct view of the building of a socialist society and a socialist civilisation"।

রাজনীতির বিচার বাদ দিয়ে, শুধু সংস্কৃতি সম্পর্কিত মার্কসবাদী বিচারের নিরিখেও ঐ সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য ধরা পড়ে। গত কয়েক বছর ধরে চীন দেশে এ ক্ষেত্রে যে ভাবগত পরিমণ্ডলটি গড়ে তোলা হয়েছে তার দু'টি অঙ্গ। প্রথমটি হল একটি প্রবল ও উদগ্র জাতীয় আত্মম্ভরিতা যা উত্তরোত্তর প্রকট হয়ে উঠেছে ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নির্বিশেষে পশ্চিমের সমস্ত জাতির প্রতি বিদ্বেষ প্রচারে, মাও সে-তুং থেকে শুরু করে ছোট বড় মাঝারি সমস্ত নেতা ও কর্মীদের সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে, 'East wind will prevail over the west

wind'—এই অসার মন্ত্র আওড়ানোয়, মাও সেতুং-এর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী লিন পিয়াও-এর—চীনে যেমন গ্রামাঞ্চল থেকে শহর দখলের দিকে এগোনো হয়েছিল তারই অনুসরণে সারা গ্রাম-পৃথিবী কর্তৃক নগর-পৃথিবী জয়ের 'গ্র্যান্ড স্ট্রাটেজির' মধ্যে এবং শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতি বিপ্লবের আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে সেকস্‌পীয়র-তলস্তয়-রলাঁ সাহিত্য, বেঠোভেন-মজার্ট-বাখ্‌-সঙ্গীতের নির্বাসনে এবং 'রেড গার্ডদের' হাতে বিদেশী রাজপুরুষদের লাঞ্ছনায়। সংস্কৃতি বিপ্লবকে 'সর্বহারা' নামাঙ্কিত করা হলেও আসলে এর মধ্যে কৃষকের একান্ত সংকীর্ণদৃষ্টি গ্রাম্যতার দিকটাই বিশেষ পরিস্ফুট।

আর চীনা সংস্কৃতি বিপ্লব যে ভাবগত পরিমণ্ডলে সংঘটিত হচ্ছে তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই অন্ধ বিশ্বাস যে সারা পৃথিবীর এবং ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমানের সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেচনা ও প্রজ্ঞা বিধৃত হয়েছে একটি ত্রিকালজ্ঞ মানুষের মগজে। চীনে তাই আজ ভক্তির বন্যা বইছে নব অবতারকে ঘিরে। কানু বিনা যেমন গীত নেই মাও সে-তুং ছাড়াও তেমনি সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা কোন কিছুরই স্থান নেই হালের চীনে। সুপরিচিত পুরানো আর্টের দোকান থেকে বিখ্যাত সব প্রাচীন ছবি নামিয়ে, পিকিং মিউজিয়ামের গ্রীক, রোমান ও প্রাচীন চীনা আর্ট সম্পদ ধ্বংস করে, এমনকি আধুনিক কালের চি পাই-শি বা জু পেয়ঁর ছবি সরিয়ে টাঙানো হচ্ছে মাও সেতুং-এর ছবি।

অর্থাৎ চীন আজ তার সংস্কৃতি-বিপ্লব সমাধা করছে 'বিশুদ্ধ মার্কসবাদে'র এক অচলায়তনের আড়ালে দেশকাল উভয় দিক থেকেই নিজেকে সংকুচিত করে। এই অপপ্রয়াস যে যুক্তিবিরোধী, মানবতাবিরোধী ও তাই মার্কসবাদ-বিরোধীও, তা বলাই বাহুল্য। মার্কস-এঙ্গেলসের সেকস্‌পীয়র-প্রীতি, বছর বছর ইস্কাইলাস পাঠ বা Critique of Political Economy-র ভূমিকায় মার্কসের গ্রীক নাটকের কালজয়ী আকর্ষণ সম্পর্কে বক্তব্যের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে। মনে পড়বে তলস্তয় সম্পর্কে লেনিনের 'বিপ্লবের দর্পণের,' তরুণ কমিউনিস্ট সংঘের তৃতীয় কংগ্রেসে তাঁর বক্তৃতা ('...Unless we clearly understand that only by an exact knowledge of the culture; created by the whole development of mankind, that only by studying this culture, is it possible to build proletarian culture; unless this is understood, we shall not be able to solve our problem. Proletarian culture is not something that has

sprung from nowhere, it is not an invention of those who call themselves experts in proletarian culture. This is all nonsense. Proletarian culture must be the result of the natural development of the stores of knowledge which mankind has accumulated under the yoke of capitalist society, landlord society and bureaucratic society.)। অথবা 'প্রলেটকাল্ট' কংগ্রেসের জন্য তাঁর খসড়া প্রস্তাবের ('Marxism won for itself its world historical significance as the ideology of the revolutionary proletariat by the fact that it did not cast aside the valuable gains of the bourgeois epoch but on the contrary assimilated and digested all that was valuable in the more than two thousand years of development of human thought and culture') বা ক্লারা জেটকিনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের কথাও আমরা মনে করতে পারি।

এমন কি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্তেও বলা হয়েছিল: '...It is wrong to impose restrictions and arbitrary measures on science and art through administrative channels. We must continue to criticize the feudal and capitalist ideologies, but we must inherit and assimilate all useful knowledge, whether it is a legacy from Old China or has been introduced from abroad'।

সংস্কৃতি-বিষয়ক এই মূল মার্কসবাদী ধারণা ও আচরণের আজ সরাসরি বিরুদ্ধতা করছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। সুতরাং মার্কসবাদবিরোধী চিন্তা বা কার্যকলাপ হিসাবেই তার সঙ্গে আজ মার্কসবাদকে সংগ্রাম করতে হবে। একটা প্রশ্ন কিন্তু এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই উঠবে—কেমন করে এমন ঘটনা সম্ভব হল? মনে আছে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে যখন স্তালিন নায়কতার শেষ পর্বের বহু অনাচারের কথা উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল তখনও নানা দেশের বহু কমিউনিস্টের মনের ঠিক এই প্রশ্নটিকেই তুলেছিলেন ইটালিয়ান নেতা, তোগ্‌লিয়াত্তি। ব্যক্তি-পূজার ম্যাজিক সূত্র দিয়ে সব অনর্থের ব্যাখ্যা যে তিনি শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে পারেন নি, সে কথা তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত জবানবন্দীতে দেখা যায়। 'ব্যক্তিপূজা' নিশ্চয়ই ঘটেছে, ব্যাপক

ভাবেই ঘটেছে, তার ফলাফলও খুবই হানিকর হয়েছে কিন্তু সেটা তো আর রাতারাতি গজিয়ে ওঠেনি—নিশ্চয়ই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা চিন্তার কোন রন্ধ্র দিয়েই ঐ শনির সমাজদেহে প্রবেশের সুযোগ ছিল। কি সে রন্ধ্রের স্বরূপ? কেমন করে তাকে বন্ধ করা যাবে? আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সেদিন তোগলিয়াত্তির এই জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়নি বরঞ্চ তাকে এড়িয়েই গিয়েছিল। কিন্তু দশ বছরের মধ্যে চীনে অন্যান্য জটিলতার মধ্যে সেই প্রশ্ন আজ আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। এটিকে তাই এড়াবার চেষ্টা করলে ভুল হবে আর সে মারাত্মক ভুলের মাশুল গুণতে হবে আগামী দিনের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে।

কয়েকটি কথা মনে হয় এ প্রসঙ্গে। ১৮৯০ সনের ২১-২২ সেপ্টেম্বর এঙ্গেলস ব্লককে একটি চিঠিতে লেখেন: '...According to the materialist conception of history, the *ultimately* determining element in history is the production and reproduction of real life. More than this neither Marx nor I have ever asserted. Hence if somebody twists this into saying that the economic element is the *only* determining one, he transforms that proposition into a meaningless, abstract, senseless phrase...

'Marx and I are ourselves partly to blame for the fact that the younger people sometimes lay more stress on the economic side than is due to it. We had to emphasize the main principle *vis-a-vis* our adverseries, who denied it, and we had not always the time, the place or the opportunity to give their due to the other elements involved in the interaction.'

এ-চিঠি লেখার পরের প্রায় ৭৫ বছরের কমিউনিস্ট আন্দোলনের দিকে তাকলে এ কথা কি জোর করে বলা যাবে যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তাদের এই সতর্কবাণীর প্রতি পরবর্তী 'younger people'-রা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন আর তাঁদের ভাবনা ও কর্মধারাকে বাঁধতে চেষ্টা করেছেন তারই সুরে? পূর্বসূরীদের চিন্তায়, শেষ নিরিখে যা চূড়ান্ত তাকে কি সর্বক্ষণই প্রায় 'একমাত্র' গণ্য করা হয়নি কার্যক্ষেত্রে? সারা পৃথিবীর

কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিশ্রাম তৎপরতার প্রায় সাড়ে পনেরো আনাই কি একাগ্র হয়ে ওঠেনি উৎপাদন যন্ত্রের উপরে সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠার ও তারই জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে? বলাবাহুল্য ঐ দায়গুলি প্রাথমিক ও তার উপরে প্রধান জোর পড়াটা শুধু স্বাভাবিক নয়, সমুচিতও বটে। কিন্তু ঐ প্রধান প্রাথমিক দায়গুলি বাদে বা বড় জোর ঐ দায়নির্বাহের সঙ্গে সরাসরি জড়িত অন্য কাজগুলি বাদে জীবনের অন্যান্য দিকের প্রতি প্রায় নিস্পৃহ থাকার সঙ্গে মার্কসবাদের অখণ্ড চৈতন্যের ধারণার বা সমগ্রতাবোধের সঙ্গতি কোথায়? ideology-র উপরে জোর নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে ideology-চর্চাও কি প্রধানত আন্দোলনের সামনেকার আশু ও অব্যবহিত রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গেই জড়িত নয়? অথচ আশু ও অব্যবহিতের সঙ্গে সুদূরপ্রসারী দায়িত্বপালনের সামঞ্জস্যবিধান তো মার্কসবাদের পক্ষেই সম্ভব।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের একটি পর্বের কথা এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে। গান্ধীজীর সঙ্গে স্বরাজসাধনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বতন্ত্র মতটি সেদিন উপস্থিত করেছিলেন এইভাবেঃ '...দেশকে যদি স্বরাজসাধনায় সত্যভাবে দীক্ষিত করতে চাই তা হলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্তি প্রত্যক্ষগোচর করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অল্পকালেই সেই মূর্তির আয়তন যে খুব বড়ো হবে, এ কথা বলি নে; কিন্তু তা সম্পূর্ণ হবে, সত্য হবে, এ দাবি করা চাই। প্রাণবিশিষ্ট জিনিসের পরিণতি প্রথম থেকেই সমগ্রতার পথ ধরে চলে। তা যদি না হত তা হলে শিশু প্রথমে কেবল পায়ের বুড়ো অঙুল হয়ে জন্মাত; তারপরে সেটা ধীরে ধীরে হত হাঁটু পর্যন্ত পা; তারপরে ১৫।২০ বছরে সমগ্র মানবদেহটা দেখা দিত। শিশুর মধ্যে সমগ্রতার আদর্শ প্রথম থেকেই আছে, তাই তার মধ্যে আমরা এত আনন্দ পাই।

'...স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সমক্যভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোটো ছোটো আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক করে নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে ('স্বরাজসাধন'—কালান্তর, ২৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা)।

মনে হয় দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করে প্রকৃত স্বরাজসাধনের জন্য যে সমগ্রতাবোধ বা অখণ্ড দৃষ্টি আয়ত্তের কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন, সমাজের আমূল রূপান্তরের ক্ষেত্রে তা আরো বেশি করে প্রযোজ্য। অজস্র আশু ও গুরুতর সমস্যার চাপে যদি আমরা ক্রমাগত আমাদের তৎপরতাকে শুধু তার সঙ্গে ঠেকা দেবার পথেই একরোখা ধাবিত হতে দিই, তাহলে অবশেষে সেটা একটা মানসিক অভ্যাসে পরিণত হয়। আর এর সঙ্গে মার্কসবাদের সমগ্র দৃষ্টির আমরা আপোষ করি এই বলে যে এখন আমাদের কথা ও কাজ যতই একপেশে হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে যাবে উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানা ব্যক্তির হাত থেকে সমাজের হাতে এলে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হলে পরেই। আমাদের সমস্ত অসম্পূর্ণতা বা দীনতা নাকি তখন নিঃশেষে দূর হবে আর আমাদের খণ্ডিত সমাজ ও ব্যক্তিজীবন পূর্ণ হয়ে উঠবে শতদলের মতো।

এ-প্রসঙ্গে আবার আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করতে পারি: "...আগে আমাদের বাহিরের বাধা দূর হবে, তার পরে আমাদের দেশপ্রীতি অন্তরের বাধা শেষ করে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন আত্মবিড়ম্বনার কথা আমরা যেন না বলি। যে মানুষ বলে 'আগে ফাউন্টেন-পেন পাব তার পরে মহাকাব্য লিখব,' বুঝতে হবে তার লোভ ফাউন্টেন-পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়"। আর সমাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার বেলায় মনে রাখতে পারি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০-তম কংগ্রেসের কথা যেখানে উদ্‌ঘাটিত বহু তথ্য ভুল প্রতিপন্ন করেছিল ঐ সহজ সরলীকরণটিকে। দেখা গিয়েছিল সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার বহু বছর পরেও সোভিয়েত মানুষের চিন্তা ও আচরণের সঙ্গে তার গুরুতর অসঙ্গতি থেকে গিয়েছিল নানা দিক থেকে। সে-অসঙ্গতি দূর করার জন্য প্রয়োজন পৃথক আর-এক ধরনের সাধনার। শুধু জাতীয় আন্দোলন নয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের কথাটা মনে রাখা দরকার: '...স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথাও...সত্যহীন এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।'

শুধু মাটি খুঁড়লেই ফুল ফোটে না, ফুল ফোটানোর মন্তর পড়লেও ফোটে না, তার জন্য চাই বিশিষ্ট আর এক সাধনা। নইলে মাঝে মাঝেই আগাছা নিড়োনোর হাঁক শুনতে হবে আর সে আগাছার তালিকায় স্থান পাবেন রবীন্দ্রনাথের মত যাঁরা এবারও হয়তো রেহাই পেয়ে গিয়েছেন কোন মতে।

('পরিচয়', আশ্বিন, ১৩৭৩)

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ প্রসঙ্গে

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে'র শেষ অবধি কী হাল দাঁড়াল, এ-নিয়ে মাথা ঘামানো নাকি ঘোর অন্ধের ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ঘরে অনুপস্থিত কালো বেড়াল তল্লাসের সামিল—অনেকে এই রব তুলেছেন ! আবার জবাবে পাল্টা প্রশ্নও শোনা যাচ্ছে—'ভালোবাসি' কথাটির বহু (কবির মতে 'টু অফন') অপব্যবহার হয়েছে বলে কি হৃদয়বান ও বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তি ঐ সনাতন কথাটিকে বাতিল করে দেন ? সূত্রের অপপ্রয়োগে চটে গিয়ে স্নানের জল ফেলতে কি খোকাকেও ভাসিয়ে দেওয়া সমীচীন ?

এই দুই মতই বাজারে বেশ চালু। তার কারণ, পরস্পরবিরোধী হলেও দুটিই বেশ মানসিক আরামদায়ক। এর যে কোন একটি পোষণ করে আমরা দিব্যি নিশ্চিন্তমনে ভাবতে পারি—যাক, তা হলে আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই এ-ব্যাপারে।

ঠিক এই নিশ্চিন্ততারই কিন্তু কোন কারণ নেই আসলে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেই বহু-বিতর্কিত ২০-তম কংগ্রেস দশ বছর আগে মার্কসবাদী মানসসরোবরে যে তরঙ্গভঙ্গের উদ্রেক করেছিল, তীব্রতার বিচারে যদি বা তার কিছুটা উপশম ঘটে থাকে এতদিনে, সে-আবর্তের পরিধি কিন্তু নিত্য-প্রসার্যমান আজকেও। আর সাহিত্যের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে তো প্রচণ্ড বিতণ্ডা শুরু হয়েছিল এর আগে থেকেই, ১৯৪৯-৫০ সনে হাঙ্গেরিয়ান মার্কসবাদী লুকাচের নন্দনতাত্ত্বিক মতামতকে ঘিরে। ২০-তম সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেস, হাঙ্গেরির অভ্যুত্থান প্রভৃতি ঘটনা যে তাতে আরো বেগ সঞ্চার করেছিল তা বলাই বাহুল্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ইটালি, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বৃটেন, আমেরিকার বহু মার্কসবাদী এই তর্কজালে জড়িয়ে পড়েন দেখতে দেখতে।

---

* এ-প্রবন্ধ রচনাকালে 'নিউ হাঙ্গেরিয়ান কোয়াটার্লি' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা থেকে বহু সাহায্য পেয়েছি।—লেখক।

তর্কযোদ্ধাদের মধ্যে কিছু নাম আমাদের পরিচিত, যেমন, আরাগঁ, গারোদি, শোলোকভ, লুকাচ, আর্নস্ট ফিশার। এঁরা ছাড়া আরো অনেকে যোগ দিয়েছেন বিতর্কে, একাধিক বই ও সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে এ-বিষয়ে। কোন একটি দেশের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি আলোচনা এবং তা ক্ষান্ত হওয়ার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না আপাতত।

তবু বিতর্ক চলার মাঝপথেই এতাবৎ যে মতবিনিময় ও সংঘাত ঘটেছে তার কিছুটা অন্তবর্তীকালীন পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করা যেতে পারে। তারও অবশ্য অসুবিধা রয়েছে দু'দিক থেকে। প্রথমত, বিতর্কসংশ্লিষ্ট বহু গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা এ-দেশে পাওয়া খুবই দুরূহ, পেলেও ভাষার ব্যবধান অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে খুবই দুরতিক্রমণীয়। দ্বিতীয়ত, দুই প্রতিপক্ষই এখানে একে মার্কসবাদী, তায় আবার সাহিত্যিক। তাই যুক্তিপরম্পরার সূত্রে তাঁরা এত অবলীলাক্রমে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে দিশে পাওয়া খুবই কঠিন। যেমন, 'বাস্তবতা'র আলোচনাসূত্রে নামা হয়েছে বস্তুবাদী দর্শনের গভীরে, আবার উঠেছে 'বিষয়' ও 'আঙ্গিকে'র ডায়ালেকটিক সম্পর্কের কথা এবং শেষ পর্যন্ত এসে গেছে আধুনিক কালের অনিবার্য সেই 'অনন্বয়' ('এলিয়েনেশন') ও 'অবক্ষয়' ('ডেকাডেন্স') প্রসঙ্গ।

এইসব শাখা-প্রশাখার আলোচনাকে কিছুটা জোর করেই সরিয়ে রেখে যদি মূল প্রসঙ্গের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের' সূত্রটিকে বেমালুম উড়িয়ে দেবার ঝোঁক এখন কিছুটা যেন কমে এসেছে আগের চেয়ে। যাঁরা মনে করতেন যে ঐ সূত্রটি গ্রহণের অর্থ সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক ধরনের রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া, তাঁরা বিতর্কের ফলে আশ্বস্ত বোধ করছেন কিছুটা। এমন কি আর্নস্ট ফিশারের মতো (তাঁর 'পেলিকান' প্রকাশিত 'দি নেসেসিটি অফ আর্ট',—১০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) যাঁরা 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে'র চাইতে 'সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য' বা 'শিল্প' কথাটা পছন্দ করতেন, তাঁরাও এ-সূত্রের প্রয়োজনীয়তাকে একেবারে উপেক্ষা করছেন না এখন। যদিও গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শ ও সংস্কৃতিবিষয়ক খসড়া প্রস্তাবে দেখছি শিল্পপ্রসঙ্গে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে'র উল্লেখমাত্রও নেই ('মার্কসিজম টুডে,' মে, ১৯৬৭)।

লুকাচের 'গ্রেট রিয়ালিজম' তত্ত্ব

আসলে ঐ সূত্রের প্রতি এ-ধরনের বিরূপতা বা সন্দেহের পিছনে জ্দানভ আমলে প্রকট অনাচার ও বিকৃতিগুলি ছাড়া আরো একটি কারণ ছিল। সেটি হল লুকাচের 'গ্রেট রিয়ালিজম'-তত্ত্ব সম্পর্কে বহু মার্কসবাদীর সংশয়। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' সম্পর্কিত সাম্প্রতিক আলোচনায় ঘুরে-ফিরে বারবার উঠেছে লুকাচ ও তাঁর এই মতামতের কথা। তাই এ-সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা দরকার এইখানে।

লেনিনের প্রতিফলন ('রিফ্লেকশন') তত্ত্ব ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা স্বীকারের (অবশ্যই নির্বিচার নয়। মনে রাখতে হবে লেনিনের একটি প্রবন্ধের নাম—'দি হেরিটেজ উই রিনাউন্স') প্রয়োজনীয়তা—এ দুই বনিয়াদী প্রত্যয় অবলম্বন করে লুকাচ খাড়া করেছিলেন তাঁর বাস্তববাদ-সংক্রান্ত তত্ত্বের মূল কাঠামোটি। সে-কাঠামো প্রতিষ্ঠাকালে লুকাচ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন আর্টে বাস্তবতা প্রতিফলন ব্যাপারটিকে আরো বিশদ করে তোলার জন্যে। যেমন তাঁর 'প্রগাঢ় সমগ্রতা'র ('ইনটেন্সিভ টোটালিটি') সংজ্ঞা দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন যে প্রকৃত বাস্তববাদী আর্টের ক্ষমতা থাকে কোন এক শিল্পকর্মে যে বিশেষ সামাজিক ঘটনার টুকরোটি প্রকাশিত হয় তাকে সমাজবাস্তবের গোটা এক বিন্যাসের ভিতরে বিধৃত করার। আর সেজন্যই শিল্পকর্মে সমগ্রতার প্রগাঢ় রূপ ফুটে ওঠে এবং আমরাও খণ্ডের মধ্যেই আস্বাদ পাই সমগ্রের। এই ভাবনার সূত্রে লুকাচ ব্যবহার করেছেন আর একটি সংজ্ঞা—'বিশিষ্ট' ('দি স্পেসিফিক') যা নাকি তাঁর দৃষ্টিতে সামান্য ও বিশেষের ডায়ালেকটিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত। আর লুকাচের চোখে বাস্তবতার লক্ষণ 'মানবকেন্দ্রানুগতা' ('এনথ্রপসেনট্রিজম') যার মধ্যে পরিস্ফুট তার মানবিকতাসাধক চরিত্র। সব মিলিয়ে তাঁর এই তত্ত্ব বাস্তব প্রতিফলনের একটা সাধারণ মাপকাঠি তুলে ধরতে সমর্থ হয়।

লুকাচের এই মৌল তত্ত্বের গুরুত্ব প্রতিপক্ষেরাও স্বীকার করেন। তাঁদের আপত্তি সেখানে নয়। তাঁদের সংশয় লুকাচের ঐতিহ্যবিচারের ব্যাপারে। লুকাচ শুধু উনিশ শতকের 'বৈচারিক বাস্তবপন্থার' ('ক্রিটিকাল রিয়ালিজম') সাহিত্যের মধ্যেই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে'র গ্রহণযোগ্য উপাদান খুঁজে পান— এই হল তাঁদের অভিযোগ। সে-সাহিত্য যে সত্যই সমগ্র মানবতার এক

গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার—একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' শুধু সেই উত্তরাধিকারকেই স্বীকার করবে, একথা বললে উনিশ ও এই বিশ শতকের অন্যান্য—এমনকি আদৌ বাস্তবতাবাদী নয়, এমন সাহিত্যিক ঐতিহ্যের মূল্য বেমালুম অস্বীকার করা হয় আর তার ফলে প্রশ্রয় পায় এক ধরনের একদেশদর্শী গোঁড়ামি।

এই অভিযোগ সত্ত্বেও একথা মানতেই হবে যে অন্তত তত্ত্বের দিক থেকে লুকাচ তাঁর বাস্তববাদের তত্ত্বকে উনিশ শতকের বাস্তবতাপন্থী রচনাশৈলীর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন নি। বরং 'বাস্তববাদের সমস্যা' পুস্তকে তিনি ১৯৩৪ সনে লেখেন ঃ 'অতীত যুগের মহৎ লেখকেরা—শেক্সপীয়র, সার্ভেন্তিস্, বালজাক, তলস্তয় তাঁদের শিল্পে পূর্ণ, পর্যাপ্ত ও জীবন্তভাবে প্রতিফলিত করেছেন তাঁদের কাল—পুরনো যুগের মহৎ লেখকদের কাছ থেকে এটাই আমাদের শিক্ষণীয়—বহিরঙ্গ বা আঙ্গিক নয়। আজকে কেউই শেক্সপীয়র বা বালজাকের মত করে লিখতে পারবেন না, লেখা উচিতও না। আসল কথা তাঁদের মূল সৃষ্টিশীল কৌশলের রহস্য আমাদের উদ্ঘাটন করতে হবে। আর সে-রহস্য সঠিকভাবে নিহিত রয়েছে বিষয়ানুগত্যের মধ্যে, তাঁদের কালের জীবন্ত ও উদ্দীপনাময় প্রতিফলনের মধ্যে, তার সব চাইতে মৌল বৈশিষ্টগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের ভিতরে, আধার ও আধেয়ের সাযুজ্যে আর বহির্বাস্তবের ব্যাপকতম পারস্পরিক সম্পর্কাদির প্রগাঢ় প্রতিফলনস্বরূপ আঙ্গিকের বিষয়াশ্রয়িতার মধ্যে'।

লুকাচের গোঁড়ামি

তবুও গারোদি, ফিশার এবং ভিত্তোরিও স্ত্রাদা প্রমুখ ইটালিয়ান মার্কসবাদীরা লুকাচের বাস্তবতার ধারণা সম্পর্কে যে কিছুটা সংশয় পোষণ করেন তার কারণ তাঁরা মনে করেন ঐতিহ্যবিচারে আর আধুনিক কালের বুর্জোয়া সাহিত্যিক বা শিল্পসংশ্লিষ্ট ঝোঁকগুলির মূল্যনির্ধারণে লুকাচ বড়ই কৃপণ। যেমন তিনি 'আভাঁ গার্দ' (avant grade) এবং সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝোঁকগুলির প্রতি স্পষ্টতই বিরূপ। এর জন্যই তিরিশের কোঠার গোড়ার দিকে তাঁর বিরোধ বাধে বের্টোল্ট ব্রেশ্ট ও তথাকথিত হেরইমার শ্রমিক লেখকগোষ্ঠির সঙ্গে। বিতর্কের ফলে ইদানীং অবশ্য তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী

হিসাবে ব্রেশ্‌টকে স্বীকার করছেন কিন্তু তাও "শুধু লিরিক-লেখক ও দ্বিতীয় পর্বের নাট্যকার ব্রেশ্‌টকে, 'জেচুয়ানের ভালোমানুষ' থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত!" ব্রেশ্‌ট ঐ নাটক লেখেন ১৯৪০ সনে। তাই লুকাচের এই হিসাবমতো 'গ্যালিলিওর জীবন' বা 'মাদার কারেজ'এর মতো নাটক 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' সম্মত নয়। আসলে ব্রেশ্‌ট সম্পর্কে লুকাচের এই দৃষ্টিকার্পণ্যের কারণ ব্রেশ্‌ট 'গ্রেট রিয়ালিজমে'র পথ অনুসরণ করেন নি এবং ক্লাসিকাল থিয়েটরের কোন কোন ঐতিহ্যকেও ভাঙা হয়েছে ব্রেশ্‌টের নাটকে।

লুকাচের এই গোঁড়ামিতেই আসলে অনেকের আপত্তি। গারোদি তাঁর একটি রচনায় দেখিয়েছেন আধুনিক ফ্রান্সের মহৎ লেখক আরাগঁ কি-ভাবে 'সাররিয়ালিজম' থেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় পেঁাছন। নেরুদার সাহিত্যিক উত্তরণও সেই পথেই। ব্রেশ্‌ট তেমনি 'এক্সপ্রেশনিজম' থেকে আসেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিবিরে। কাজেই নির্মোহদৃষ্টিতে ঐতিহ্যবিচার করলে দেখা যায় শুধু 'গ্রেট রিয়ালিজম' নয়, এমনকি আমাদেব এই বিশ শতকের বহু সাহিত্য ও শিল্পধারা থেকেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ রসদ সংগ্রহ করেছে কার্যক্ষেত্রে। সে বিচারে 'গ্রেট রিয়েলিজমের' অবদান নিশ্চয়ই সর্বাগ্রগণ্য। তবু অন্যগুলিকেও যে উপেক্ষা করা চলে না, তার প্রমাণ মেলে আরাগঁর মত সার্থক কমিউনিস্ট শিল্পীর এই জবানবন্দীতেঃ '...যে-সব বই মোটেই এইরকম ভান করে না যে তারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেইসব বইয়েই আমি এমন সব জিনিস খুঁজে পেয়েছি যেগুলিকে অবিকল সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের আলোয় পরীক্ষা করে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং নিজেকে বাড়াতে পেরেছি। আমার সব কিছু বিশ্বাসের ফলে যেটিকে আমি সকল আর্টের শেষ লক্ষ্য বলে মনে করি, সেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের দিকে এই সব বই-ই আমার বিচারশক্তিকে চালিত করেছে। যে পথের সন্ধান করছি তা খুঁজে পেতে যে লেখক অজ্ঞাতে আমাকে সাহায্য করেছেন, মতামতের দিক থেকে তাঁর সঙ্গে আমার কোন মিল না থাকতেও পারে; এমন কি তার ধ্যানধারণা হয়তো আমাকে শত্রুর মত আঘাতও করতে পারে' ('নতুন চোখে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ'—লুই আরগঁ, পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৬৬)।

মনে হচ্ছে, বিতর্কের ফলে লুকাচও সমস্যাটি নিয়ে নতুন করে ভাবছেন। ইদানীং একটি বিবৃতিতে তিনি স্বীকার করেছেন যে ফ্রান্ৎস কাফ্‌কা সত্যই একজন 'বিপুলে তাৎপর্যমন্ডিত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী'।

গারোদির 'বাঁধভাঙা বাস্তববাদ'।

আবার মার্কসবাদী লেখকশিবিরে লুকাচের ঠিক বিপরীত কোটিতে সম্ভবত গারোদির অবস্থিতি (আর্নস্ট ফিশারেরও মতামতও প্রায় তাঁরই কাছাকাছি)। ১৯৬৩ সনে গারোদি 'দ্য রিয়ালিজম সাঁ রিভাজ' (অর্থাৎ 'বাঁধভাঙা বাস্তববাদ') নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সে-প্রবন্ধের মূল্য এইখানে যে, গারোদি তাতে প্রতিফলন তত্ত্বের যান্ত্রিক অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বেশ জোরালোভাবে খাড়া করে ধরেছেন স্রষ্টার সক্রিয় ভূমিকা আর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার গুরুত্ব। কিন্তু প্রতিফলন ব্যাপারটা যে একটা নিষ্ক্রিয়, যন্ত্রবৎ ব্যাপারমাত্র নয়—একথা প্রমাণ করেই গারোদি ক্ষান্ত থাকেন নি। শিল্পীর নিজস্ব তৎপরতা ও বাস্তব অবস্থার ডায়লেকটিক সম্পর্ক থেকেই শিল্পকর্মের উদ্ভব—একথা বলেও গারোদি এ-দুয়ের মধ্যে শেষোক্তটি যে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত, সে কথাটি আর মনে রাখলেন না। শিল্পীর সৃষ্টিশক্তিকে এত একান্ত করে তিনি দেখলেন যে আমাদের চেতনানিরপেক্ষ বাস্তব সত্তা তাঁর কাছে গৌণ হয়ে দাঁড়াল। এরই সূত্রে তিনি পৌঁছলেন এই সিদ্ধান্তে যে, 'এমন শিল্প নেই যা বাস্তববাদী নয়, অর্থাৎ যার মধ্যে শিল্পীনিরপেক্ষ বহির্বাস্তবের উল্লেখ নেই'। ফলে যে যুক্তিকে তিনি খন্ডন করতে গিয়েছিলেন তাকেই তিনি সমর্থন করলেন ঘুরপথে। শুধু বাস্তববাদের গোঁড়া প্রবক্তারা বহু গুণ সত্ত্বেও অনেক শিল্পকর্মকে বাস্তববাদী নয়, আর তাই শিল্প হিসাবেও ধর্তব্য নয় বলে মনে করতেন। আর গারোদির চোখে এ-সবই হল বাস্তববাদী আর তাই শিল্পও। অর্থাৎ শিল্প ও বাস্তবতাকে উভয় পক্ষই একাকার করে ফেললেন। গারোদি বললেন—'স্তাঁদাল ও বালজাক, কুর্বে ও রেপিন, তলস্তয় ও মার্তিন দুগার্দ, গাঁকি আর মায়াকোভস্কি—এঁদের ভিতর থেকে আমরা 'গ্রেট রিয়ালিজমের' লক্ষণ গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করতে পারি। কিন্তু কাফ্‌কা, সাঁ-জন পার্স বা পিকাসোর শিল্প যদি সে লক্ষণের সঙ্গে না মেলে তবে আমরা কী করব? আমরা কি তাহলে বাস্তববাদ থেকে অর্থাৎ আর্টের ক্ষেত্র থেকে তাঁদের নির্বাসন দেব? না, বরঞ্চ আমরা বাস্তববাদের সংজ্ঞাকে

উন্মুক্ত ও প্রসারিত করব আর আমাদের এই শতকের বৈশিষ্ট্যসূচক শিল্পকর্ম-গুলির আলোকে বাস্তবতার নব দিগন্ত আবিষ্কার করব যাতে এই নব অবদানগুলিকেও আমরা যুক্ত করতে পারি অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে ?'

গারোদির এই বক্তব্যের মধ্যে নিশ্চয়ই অন্যতর ভাবনামাত্রকেই বাদ দেওয়ার, বিরোধমাত্রেরই সম্ভাবনা বেমালুম অস্বীকার করার সংকীর্ণ কূপমণ্ডূক দৃষ্টির প্রতিবাদ খুবই জোরালো। কিন্তু আসলে এর মধ্যেও একটি জিনিস প্রচ্ছন্ন রয়েছে—সেটি হল নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যকে বাস্তববাদের সঙ্গে এক করে দেখার গোঁড়ামি। তিনি ধরে নিয়েছেন যে, সীমাবদ্ধ মাত্রার মধ্যেও কোন শৈল্পিক গুণ সম্ভব নয় যদি না তা বাস্তববাদী হয়। ফলে বাস্তববাদের সীমানা প্রসারিত করতে গিয়ে তিনি তাকে প্রায় অর্থহীন করে ফেলেছেন শেষ পর্যন্ত।

গারোদি নিজেও তুষ্ট নন তাঁর তত্ত্বে। তিনি তাই বারবার এ প্রসঙ্গ, বিশেষ করে এরই সূত্রে অবক্ষয় আলোচনায় ফিরে ফিরে আসছেন আর প্রতিবারই সমস্যার নতুন নতুন জটিলতার দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করছেন।

সুতরাং 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে'র আলোচনার মোটেই নিষ্পত্তি হয় নি। আর বাস্তবের নিত্য নব নব উন্মেষপ্রবণতার দিক থেকে অমন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটবেও না কোনদিন।

('পরিচয়', কার্তিক, ১৩৭৪)

বাংলা সাহিত্য আন্দোলনের অব্যবহিত পৃষ্ঠপট

যতই শূন্যবিহারী হোন না কেন মানুষ হিসেবে তো বটেই, এমন কি শিল্পী হিসেবেও সাহিত্যিকদের জীবনের মূল দেশ কালের বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই প্রোথিত। তাই সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তুলতে গেলে কোন বাস্তব অবস্থায় সে আন্দোলনের চিন্তা করা হচ্ছে তার পরিচয় গ্রহণ প্রথমেই প্রয়োজন। অবশ্য অন্য যে কোন তৎপরতার মতই এখানেও সাধারণ পটভূমি নিশ্চয়ই পশ্চিবঙ্গের বিশিষ্ট সামাজিক অবস্থা; তারই ভিত্তিতে এ রাজ্যে বর্তমানে যে সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সেটিই হল ঐ আন্দোলনের অব্যবহিত পৃষ্ঠপট ও তাইই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

কয়েকটি গোড়ার কথা

কয়েকটি গোড়ার কথা গোড়াতেই বলে রাখা দরকার এ প্রসঙ্গে। কারণ কথাগুলি সর্বদা মনে জাগরূক না থাকলে আন্দোলনের লক্ষ্য ও সার্থকতা শেষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ তো বটেই, একপেশেও হতে বাধ্য।

সারা ভারতবর্ষে অক্ষরজ্ঞানের হার ১৯৬৬ সনে ছিল শতকরা ২৮.৬। পশ্চিম বাংলায় ঐ হার সামান্য বেশি—শতকরা ৩২-এর অল্প উপরে। অর্থাৎ প্রতি তিন জনে দু'জনেরও বেশি এখানে নিরক্ষর।

বাকি জনকে নিয়েই সাহিত্যের অর্থাৎ লিখিত সাহিত্যের কারবার আর সে-কারবারের প্রধান বাহন—বই। ১৯৬৩ সনে সারা পৃথিবীতে মোট ৩,৯৪,০০০টি* স্বতন্ত্র বই (অর্থাৎ 'title'—এক বইয়েরই বহু মুদ্রণসংখ্যা ধরে নয়) প্রকাশিত হয়েছিল।

এর মধ্যে এশিয়ার ভাগে পড়েছিল ৯০,০০০এর মতো অর্থাৎ মোট

---

* পরবর্তী রাশিগুলি নেওয়া হয়েছে কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরির সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুটি প্রবন্ধ থেকে ('ইণ্ডিয়ান লিটারেচার' পত্রিকার ১৯৬২,৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা ও ঐ পত্রিকার ১৯৬৬, অক্টোবর ডিসেম্বর সংখ্যা)।

প্রকাশনার শতকরা ২২.৮ ভাগ। প্রকাশন তালিকার সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ৭৭৫৯৯-টি বই প্রকাশ করে। তারপর যথাক্রমে বৃটেন, আমেরিকা, জার্মান ফেডারল রিপাবলিক, জাপান ও ভারতবর্ষের স্থান।

আমাদের এই ষষ্ঠ স্থানলাভে কিন্তু উল্লাসের তেমন কোন কারণ নেই। কারণ আমরা যেখানে প্রতি ২১০০০ জন ভারতবাসীর জন্য বছরে পুরো একখানি বইও প্রকাশ করতে পারিনি সেখানে তালিকায় আমাদের উপরে যাদের স্থান তাদের কথা বাদ দিয়ে যারা আমাদের ঠিক পরেই রয়েছে সেই ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস, চেকোশ্লোভাকিয়া ও স্পেনের দিকেই যদি তাকাই, তা হলেও দেখা যাবে তাদের ক্ষেত্রে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ৪১২২, ১২৪৮, ১৫৬৬ ও ৩৫৪২ জন পিছু।

আরো কিছু হিসেব দেখা যেতে পারে। পাঁচ বছর আগে (১৯৬১-'৬২) ভারতবর্ষে মোট বই প্রকাশিত হয়েছিল ২১,০৭৬টি।* আর ১৯৬৫-৬৬ সনে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা হল ২০,১৮৫ অর্থাৎ, পাঁচ বছরে প্রকাশন সংখ্যা বাড়ার বদলে কমে গেছে ৮৯১টি।

অথচ ঠিক ঐ পাঁচ বছরেই এ-দেশে ইংরেজীতে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বেড়েছে ৯,৩৬১ থেকে ১,০৩৪৭-এ, অর্থাৎ মোট প্রকাশনের ৪৪.৪% থেকে ৫১.২%-এ।

আবার গত ছ'বছরে বিদেশ থেকে আমদানি বেড়েছে মোট আমদানির ১৯% থেকে ২৩%-এ। আসলে এই আমদানি গত ৭৬ বছরে (১৮৮৯-৯০ থেকে ১৯৬৫-৬৬) বেড়েছে প্রায় ১৫ গুণ, যেখানে দেশের অক্ষরজ্ঞান পুরো ৫-গুণও বাড়েনি (৬% থেকে ২৮.৬%)।

তবু অন্তত এই খাতে আমদানি বৃদ্ধি অত উদ্বেগের কারণ হত না যদি দেশের নিজস্ব প্রকাশন, আর তার মধ্যে বিশেষ করে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশনও

---

* শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে **Delivery of Books (Public Libraries Act, 1954)** অনুসারে ন্যাশনাল লাইব্রেরি দেশের প্রত্যেকটি বই পাওয়ার অধিকার। সেখান থেকেই এই সংখ্যাগুলি সংগৃহীত। তাঁর অনুমান, হয়তো আইন সত্ত্বেও শতকরা ১০টি বই এখনো সেখানে জমা পড়ে না। দ্বিতীয়ত এই হিসাবে সংবাদপত্র ও অন্যান্য ধারাবাহিক প্রকাশনগুলিকে ধরা হয় না। এ দুটি কথা মনে রেখে এই অঙ্কগুলিকে গ্রহণ করতে হবে।

দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকত। অথচ বাড়া দূরের কথা আমরা এখনি দেখলাম যে গত পাঁচ বছরে স্পষ্ট লক্ষণ ঠিক উল্টো দিকেরই। আমাদের বাংলা ভাষায়ও ১৯৬১-৬২ সনে বই প্রকাশিত হয়েছিল ২০৪৩টি আর ১৯৬৫-৬৬ সনে বেরিয়েছে মাত্র ১৪২২টি অর্থাৎ বাংলা বইয়ের প্রকাশন গত পাঁচ বছরে কমেছে ৬২১টি। 'দেশ' পত্রিকার এবছরের সাহিত্য সংখ্যায় বলা হয়েছে যে ১৯৬৬-৬৭ সনে সেই সংখ্যা আরো কমে দাঁড়িয়েছে 'কিঞ্চিদধিক এক হাজার।'

তবু এত সব সত্ত্বেও একটি ব্যাপার হয় তো আমাদের খাস সাহিত্যিকদের আনন্দদান করতে পারে কিছুটা। ১৯৬৫-৬৬ সনে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের মধ্যে যেগুলিকে বিষয়ের দিক থেকে নির্দিষ্ট করা যায় তাদের সংখ্যা ১০৩৮। এর মধ্যে 'সাহিত্যের' (অর্থাৎ সীমাবদ্ধ অর্থে) বই ৫৮৪টি, অর্থাৎ মোটের ৫৬.২%। তারপর আসে ইতিহাস, ভূগোল ও জীবনীগ্রন্থ—১১৬টি, তার পর ধর্মপুস্তক ১০০টি। কিন্তু এরই সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় বিজ্ঞানের ২৩টি ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ২২টি মাত্র বইয়ের, তাহলে সেই আনুপাতিক অসামঞ্জস্যের মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে ঘোরতর জাতীয় অস্বাস্থ্যের। আর তাই সাহিত্যের প্রতি পক্ষপাতে (অনুবাদের ক্ষেত্রেও পক্ষপাত সুস্পষ্ট—সেখানে ১৯৭৫ সনে প্রকাশিত মোট ১০৪টি বইয়ের মধ্যে ৫৪টি বই-ই সাহিত্য বিষয়ক) উল্লসিত হওয়ার যো নেই আমাদের।

অথচ দেশে শিল্পায়নের তাগিদে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বই বাড়বারই কথা। বেড়েওছে, কিন্তু তার অধিকাংশই ইংরেজী ভাষায়। আর বিদেশ থেকে আমদানি ইংরেজী বইও আমাদের চাহিদা মেটাচ্ছে এদিককার।

এবার বাংলায় প্রকাশিত সাহিত্যের বইয়ের আভ্যন্তরিক অনুপাতের পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। চিত্তরঞ্জনবাবু হিসেব দিয়েছেন এই রকমের ঃ

	কবিতা	কথাসাহিত্য	নাটক	বিবিধ	মোট
১৯৬৪-৬৫	৭৩	২৮৭	১০৫	৮০	৫৪৫
১৯৬৫-৬৬	৯৯	৩৭৬	৩৬	৭৩	৫৮৪

এর থেকে দেখা যায় যে কথাসাহিত্যের ও কবিতার বই প্রকাশনের দিকে ঝোঁক বাড়ছে আর বাঙালীর প্রবল নাট্যামোদের প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা কমেছে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের মতো। অথচ নিরক্ষর দেশে নাটকের

অভিনয় খুবই ফলপ্রদ একটি শ্রাব্য-চাক্ষুষ (audio-visual) পদ্ধতি হিসাবে গণ্য। তবে এর থেকে প্রতিকূল সিদ্ধান্ত পুরোপুরি টানা ঠিক হবে না। তার একটি কারণ সম্ভবত অভিনয়ের ক্ষেত্রে পুরনো নাটকের জনপ্রিয়তা। আর একটি কারণ একটু পরেই আমরা দেখব।

সব মিলিয়ে তা হলে ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে এই রকম ঃ

* আমাদের প্রতি তিনজন মানুষের মধ্যে দু'জনই নিরক্ষর। সেই দু'জনার কাছে লিখিত সাহিত্যের সরাসরি কোন আবেদন নেই। এঁদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের দূরত্ব হ্রাসের উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

* এদেশে প্রকাশিত ও বিদেশ থেকে আমদানি ইংরেজী বইয়ের উপরে আমরা আনুপাতিকভাবে অতিরিক্তমাত্রায় নির্ভরশীল। আমাদের শিক্ষা, সরকারী দপ্তর ও আদালত কাছারির কাজকর্মে ইংরেজীর পাকা আসন যে মানসিকতার ফল এবং যে মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেয় ও পুষ্ট করে, প্রকাশনার ক্ষেত্রেও এই লক্ষণটিও এসেছে তারই সূত্রে। এর দরুণ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের স্বচ্ছন্দ, স্বনির্ভর ও স্বাভাবিক অগ্রগতি আজো বহুলাংশে বিড়ম্বিত। ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষাশ্রয়ী সাহিত্যের অনুপাতে তাই দ্বিতীয়োক্তের অনুকূলে পরিবর্তন আনতে হবে—ইংরেজীর পরিমাণগত মাত্রা কমিয়ে নয়, অন্য পক্ষের তরফে ঐ মাত্রার প্রভূত বিকাশ ঘটিয়ে।

* আমাদের প্রকাশনের ঝোঁক অতিরিক্ত মাত্রায় 'সাহিত্যে'র দিকে। এর জন্য আবেগপ্রবণতার প্রাবল্যে এবং বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তার দৈন্যে আমাদের সমগ্র সাহিত্য পীড়িত—তার সুস্থ, সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস বিকাশ বহুলাংশে ব্যাহত। এখানেও প্রয়োজন আনুপাতিক পরিবর্তনের—'সাহিত্য' প্রকাশনের মাত্রাহ্রাসের নয়।

* সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নাটকের মতো শ্রাব্য-চাক্ষুষ পদ্ধতি হিসাবে প্রযোজ্য ধারার দুর্বলতা আর বহুলাংশে পুরানো নাটকেই সীমাবদ্ধ থাকার প্রবণতা। আমদের নাট্য আন্দোলন প্রবল ও সুস্থ পথে এগোলে তবেই এই দুর্বলতা কাটানো সম্ভব হবে।

বটতলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের আর এক বৈশিষ্ট্য—বটতলা সাহিত্য। এ-দেশে মুদ্রণযন্ত্র আমদানির একেবারে গোড়ার যুগে, ১৮১৮-২০ সনের মধ্যে শোভাবাজারের বিখ্যাত এক বটতলার আশেপাশে প্রথম বটতলার ছাপাখানাটি গজিয়ে ওঠে। তারপর

চিৎপুর, আহিরিটোলা, জোড়াসাঁকো, গরাণহাটা, চোরবাগান প্রভৃতি এলাকাতেও ঐ ধরনের ছাপাখানা ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে গলিঘুপচির অন্ধকার কুঠুরিতে, নড়বড়ে কাঠের তৈরী মুদ্রণযন্ত্রে ছেনিকাটা ছাঁচে-ঢালা হরফে ও হাতে-তৈরি কাগজে সেদিন থেকে লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে আজো অবধি। ছাপার কেরামতির দিক থেকে ঐ ছাপাখানাগুলি মোটের উপর রয়ে গেছে মান্ধাতার যুগেই।

বটতলার সাহিত্যকে বিনয় ঘোষ তাঁর 'কলকাতা কালচারে' পাঁচভাগে ভাগ করেছেন: ১। ধর্মগ্রন্থ—যেমন রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, পুরাণ, বৈষ্ণব গ্রন্থ, লক্ষ্মীর পাঁচালী প্রভৃতি; ২। যাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, জ্যোতিষ ইত্যাদি—যেমন অদ্ভুত ইন্দ্রজাল, কামশাস্ত্র, রাক্ষসীতন্ত্র, গুপ্তমন্ত্র প্রভৃতি; ৩। বিচিত্র বিদ্যার্জনের গ্রন্থ—যেমন হোমিওপ্যাথি, কম্পাউন্ডারী, কবিরাজি, পশুচিকিৎসা, নাড়ীবিজ্ঞান, পেটেন্ট ওষুধ, কম্পোজিটারি, ইংরেজি ভাষা, বাগান তৈরি, তবলাতরঙ্গিনী, বেহালা শিক্ষা ইত্যাদির বই; ৪। উপন্যাস,—যেমন 'রুচিতে অরুচি,' 'ঠকাঠকি তরজা,' 'প্রেমের লুকোচুরি,' 'বাসরে বিপাক,' 'জীবনসঙ্গিনী' 'একালের মেয়ে,' 'মডেল প্রেম' প্রভৃতি এবং ৫। নাটক ও প্রহসন—যেমন 'মহারাজ নন্দকুমার,' 'নীলকুঠী,' 'নারী রাক্ষসী,' 'প্রেমের গুলবাগ,' 'মিলনমন্দির' 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি। কাজেই বটতলা সাহিত্য বলতে আমরা যে শুধু আদিরসাত্মক বইয়ের কথা ভাবি, তা ঠিক নয়। তবে সমগ্র পরিবেশ তার মধ্যযুগীয়।

বিনয়বাবু বলেছেন, এই সব বইয়ের খবর পাওয়া যায় পঞ্জিকার পৃষ্ঠায়, ওলকপির বীজ ও বশীকরণ আংটির বিজ্ঞাপনের পাশে, আর পঞ্জিকার বহুদূর-বিস্তৃত গ্রাম্য পাঠকেরাই এগুলির খদ্দের। মান্ধাতার আমলের ছাপাখানায় ছোট ছোট, অত্যন্ত সস্তাদরের এই পুস্তিকাগুলি আজো অজস্র কপি ছাপা হয় এবং গ্রামের মেলা ও হাটে, গঞ্জে, বাজারে লাটের হিসাবে বিক্রী হয় হাজারে হাজারে। নাটকগুলির অজস্র অভিনয় হয় গ্রামে ও মফঃস্বল শহরে, যাত্রার দল ও মঞ্চের থিয়েটারের দৌলতে।

আমাদের দেড়শ বছরের রেনেসাঁস, জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার, স্বাধীনতালাভ, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নির্দেশ ও শিল্পায়ন সত্ত্বেও বটতলা কিন্তু আজো বেঁচে আছে। শুধু তাই নয়, সংখ্যাতত্ত্বের প্রয়োগ এখানে এতাবৎ অচল থাকলেও (বটতলার বই নিশ্চয়ই Delivery of Books Act-এর পরোয়া করে না) নানা লক্ষণ থেকে অনুমান হয় যে বটতলা সাহিত্য

কলেজ স্কোয়ার-কেন্দ্রিক আধুনিক সাহিত্যের চাইতে খাটো নয়, না পরিমাণের অংকে, না প্রভাবের বিস্তৃতির বিচারে। লক্ষ লক্ষ গ্রামের ও শহরের স্বল্পশিক্ষিত মানুষ আজো তাঁদের মানসতৃষ্ণার খোরাক এর থেকেই পান—তাঁদের সমগ্র জীবনযাত্রার উপরে এর প্রভাব এখনো অপরিসীম।

সাম্প্রতিককালে অক্ষর জ্ঞানের যে প্রসার ঘটেছে তার ফলে খুব সম্ভবত এই বটতলা সাহিত্যেরই আসর আরো সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। কারণ তার কোন সত্যকার সুস্থতর বিকল্প ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি যার সাহায্যে গ্রামের স্বল্পশিক্ষিতেরা তাঁদের সাহিত্য তৃষ্ণা মেটাতে পারেন অন্তত কিছুটাও।

একচেটিয়া সংবাদপত্র

স্বাধীনতালাভের পরে পশ্চিমবঙ্গে আর এক নতুন দুর্গ্রহ দেখা দিয়েছে যার দুষ্টপ্রভাব ইতিমধ্যেই রীতিমত মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী রূপ ধারণ করেছে—শুধু সাংবাদিকতা নয়, খাস সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। সেটি হল বাগবাজার ও সুতারকিন স্ট্রীটের দুই একচেটিয়া সংবাদপত্রগোষ্ঠীর উদ্ভব। স্টেটসম্যান, বসুমতী ও কালান্তরের মত পার্টি পত্রিকাগুলি নিশ্চয় কিছু প্রভাব বিস্তার করে থাকে পাঠকমহলে কিন্তু তার মধ্যে প্রথমটির পাঠক ইংরেজী-নবিশমহল এবং শেষোক্ত-দের আর্থিক শক্তি কম বেশি সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাগবাজার ও সুতারকিন গোষ্ঠির সে-ভাবনা নেই। তাঁদের পত্রিকার বিশাল পাঠকমহলকে তাঁরা প্রতিদিন প্রভাবিত করে থাকেন নিছক রাজনৈতিকভাবেই নয়, সাংস্কৃতিক ও ও মতাদর্শের দিক দিয়েও। তাঁদের দৈনিক পত্রিকায় 'কমলাকান্তের আসর' বা 'হাফজান্তার এলোমেলো'র মত 'ফিচার' বা গল্প কবিতা তো থাকেই, তার উপরে দৈনিকের আনুষঙ্গিক হিসাবে আছে সাপ্তাহিক 'দেশ' বা 'অমৃতে'র মত সরাসরি সংস্কৃতি পত্রিকা। এর মধ্যে বিশেষ করে 'দেশ' পত্রিকার পাঠক মণ্ডলী বিপুল—পশ্চিম বঙ্গের যে কোন সাপ্তাহিকের চাইতে বেশি। এরা প্রায় প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য পশ্চিম বঙ্গের প্রতিক্রিয়াশীল মহলের। লেখার মারফৎ পাঠকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার ছাড়াও এই পত্রিকাগুলি আর একদিক থেকে বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করে—এরা বহু বাঙালী লেখককে অন্ন যুগিয়ে থাকে—কাউকে চাকুরীতে বহাল রেখে, কাউকে দিয়ে নিয়মিত 'ফিচার' লিখিয়ে, কারো বা মাঝে মাঝে গল্প, কবিতা ছাপিয়ে। আমাদের দেশের অনুপাতে দক্ষিণার ব্যবস্থাও মোটের উপর ভালোই। আর তাই পশ্চিম বাংলার বহু লেখকই বাধ্যবাধকতার সূত্রে এ দুই গোষ্ঠির কাছে বাঁধা—তাদের ঘোরতর

প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকেও তাঁরা হজম করেন বিনা বাক্য ব্যয়ে, নিজেরাও কলম ধরেন সে-দুনীতির সমর্থনে।

যেমন ১৯৬২-৬৩ সনের চীনা আক্রমণের সময়ে 'দেশ' পত্রিকা একটি নিয়মিত 'ফিচার' বার করে 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শিরোনামায়। সেখানে লেখকদের আমন্ত্রণ জানানো হয় ঐ জটিল সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের মতামত খোলাখুলি ব্যক্ত করার জন্য নয়, কেন তাঁরা কমিউনিজমে বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন তারই বিশদ বিবরণ দানের জন্যে। এতে সব লেখককেই ডাকা হল, অবশ্য পরিচিত কমিউনিষ্ট লেখকদের ছাড়া। তার ফলে যে দৃশ্যটি দেখা গেল তা সত্যই মর্মান্তিক—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত রাঘব বোয়াল থেকে নেহাৎই চুনো পুঁটি পর্যন্ত, কেউ সানন্দে বুক ফুলিয়ে, কেউ বা বিরসবদনে, মাথা নিচু করে যোগ দিলেন গড্ডালিকা প্রবাহে, অবশ্যই 'শিল্পীর স্বাধীনতার' ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে। কমিউনিস্ট লেখকেরা ছাড়া সেদিন অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমরেশ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রভৃতি যাঁরা সেই সাহিত্য-লাঞ্ছনার মিছিলে যোগ দিলেন না, তাঁদের তো প্রায় হাতে গোণা যায়। সে মিছিলে এমনো দু'চারজন ছিলেন যাঁরা কমিউনিজমে কেন বীতশ্রদ্ধ হলেন সে-কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেও, তাঁদের কমিউনিজমের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণের কথা কেউ কিন্তু এতদিন ঘুণাক্ষরেও টের পাননি !

আবার তার বছর খানেকের মধ্যে যখন দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল স্বাধীনতালাভের ১৭ বছর পরে, তখন ঐ দুই সংবাদপত্রগোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফের শুরু করল জঘন্য সাম্প্রদায়িকতা প্রচার—নিজ নিজ পত্রিকার প্রচার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে।

একচেটিয়া সংবাদপত্রগোষ্ঠীর এই হল কাজ—পত্রিকার প্রচারবৃদ্ধির জন্য জঘন্যতম প্রতিক্রিয়াশীলতায় প্ররোচনাদান, মানুষের শুভবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে তাঁদের মনকে দিনের পর দিন নানা ভেদবুদ্ধির বিষে বিষিয়ে তোলা আর দু'হাতে টাকা ছড়িয়ে শিল্পী সাহিত্যিকদের বিবেক কেনা, তাঁদের নৈতিক ও ক্রমশ সাহিত্যিক অপমৃত্যু ঘটানো। যুক্তফ্রন্ট শাসনে এরা বাধ্য হয়ে আজ কিছুটা সমঝে চলছে কিন্তু স্বভাব তাদের বদলায়নি এতটুকুও। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের উপরে প্রচণ্ড দুষ্টপ্রভাব এই একচেটিয়া গোষ্ঠীদ্বয়ের।

শুধু সাহিত্য নয়, এরা নাট্যসংস্থা বা যাত্রার দলগুলিকেও হাত করার চেষ্টা করছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।

প্রকাশক মহল

কিছু কিছু রাঘববোয়াল থাকলেও সৌভাগ্যক্রমে প্রকাশক জগতে এখনো কোন একচেটিয়া গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়নি। তবু পূর্ব পাকিস্তানের বইয়ের বাজার হাতছাড়া হওয়ার প্রচণ্ড আঘাত বাংলা প্রকাশনকে স্বাধীনতার পর থেকেই এমন অভিশপ্ত করেছে যে সংকটের তীব্রতা তার দরুণ মোটেই কমেনি। সেকেলে 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' বা 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়' থেকে সুরু করে মাঝামাঝি সময়কার 'ডি. এম. লাইব্রেরী', তারপর 'সিগনেট' 'কবিতাভবন' এবং হাল আমলের 'জিজ্ঞাসা', 'ভারবি' পর্যন্ত সকলেই কমবেশি সে-সংকটের শিকার। এমন কি 'বিশ্বভারতী,' যার কথা মূলত স্বতন্ত্র, সে-ও এর আওতা থেকে একেবারে মুক্ত নয়। তবু অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় যে 'লেখক সমবায়ের' সঙ্গে একদিন জড়িত ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানটি নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাসের' মত উল্লেখযোগ্য প্রকাশনের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যে বহু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও 'ভারত-কোষ' প্রকাশ করছেন বা কিছু দিন আগে দুই খণ্ড 'বিজ্ঞানের ইতিহাসের' মত বই বাংলা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব হয়েছে—এও কম কথা নয়।

প্রগতিশীল লেখকেরা সাধারণ প্রকাশকদের কাছে তেমন আমল পান না যদিও বিশ বছর আগের মত দরজা এখন হয়তো একেবারে বন্ধ নয়। অথচ রাজনৈতিকভাবে প্রগতিশীলেরা যখন প্রকাশনায় উদ্যোগী হন তখন তাঁদের নজর থাকে প্রধানত রাজনৈতিক প্রকাশনের উপরে—অনেক সময়েই বিদেশী মার্কসবাদী বই বা সোভিয়েত বইয়ের তর্জমার উপরে। আনুপাতিকভাবে আমাদের লেখকদের লেখা সাহিত্যের বই এতাবৎ প্রকাশ হয়েছে সামান্যই—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, ননী ভৌমিক, গোলাম কুদ্দুস—হয়তো আরো দু'চারজন লেখকের কিছু রচনা। সেদিক থেকে তেমন কোন ধারাবাহিক পরিকল্পনার কথা এখনো পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না ঐ মহলে।

সরকারের ভূমিকা

সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব কিন্তু সরকারি তৎপরতার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সরকার এখনো পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ধরণের যে-সব টুকরো টুকরো কাজ করছেন তা এই ধরণের ঃ

১। বাংলা-ভাষাকে এ রাজ্যের সরকারী ভাষা করার প্রাথমিক ধাপ

হিসেবে আমলাদের নথিপত্রে বাংলায় নির্দেশ লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (প্রাথমিক উৎসাহের পর তা' কিন্তু আজ অনেকাংশেই উপেক্ষিত, বিশেষ করে বড় আমলা মহলে), বাংলা টাইপরাইটারের 'কি-বোর্ড' উদ্ভাবনের জন্য কিছু টাকা খরচ করা হয়েছে, মাঝে মাঝে দু'চারটি বিলের বাংলা তর্জমা প্রকাশ করা হয়েছে, ২। জরাগ্রস্ত ও দুর্গত কোন কোন লেখক শিল্পীর জন্য কিছুটা সরকারি পেন্সনের ব্যবস্থা হয়েছে, ৩। উৎকৃস্ট গ্রন্থ প্রকাশের জন্য লেখক ও প্রকাশকদের কিছুটা পুরস্কৃত করা হয়েছে, ৪। 'লেখক সমবায়কে' কিছুটা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, ৫। অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ সেনের 'বিজ্ঞানের ইতিহাস', ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের 'চিন্ময় বঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশনের সময়ে আর্থিক সহায়তা করে বইয়ের দাম কমানো হয়েছে ইত্যাদি।

এ-কাজগুলি যে ভালো তা'তে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু পুরস্কার বা সাহায্যদানের সময় রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ছাড়াও এগুলি কোন সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীন সাহিত্যপোষকতা পরিকল্পনার অঙ্গ নয়, নেহাৎই কতগুলি খুচরো, ভালো কাজ। আর সেজন্যই ঐগুলির সার্থকতা খুবই সীমাবদ্ধ।

এবারে তাই আশা করব, যুক্তফ্রন্ট সরকার বাঙালি লেখকসমাজের সঙ্গে পরামর্শ করে সেই পরিকল্পনা রচনা করবেন আর তার পরিচালনার ভার ন্যস্ত করবেন লেখকসমাজের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের উপরেই।

সাহিত্য সংঘ

বাঙালির সাহিত্য সংঘ গড়ার বাতিকের কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু মুস্কিল এই যে তার কোনটাই ঠিক যেমনটি চলা দরকার তেমন চলে না—সাবেকী বা হালের, বনেদী বা অর্বাচীন সব সাহিত্য সংঘেরই মোটের উপর একই হাল। তা ছাড়া সমস্ত বা অধিকাংশ লেখককে নিয়ে কোন প্রকৃত প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন নেই বাঙালি সাহিত্যিকদের।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' বা বাংলাদেশের 'পি. ই. এন'এর মত বনেদী প্রতিষ্ঠান হয়তো কোনমতে চলছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষদের যে রূপের কথা বারবার আমাদের শুনিয়েছেন তা বহুলাংশে আকাশকুসুমই রয়ে গেল। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে 'সাহিত্য অকাদেমি' নেই, 'প্রগতি লেখক সংঘও' উঠে গেছে ১৯৫৩ সনের পর। ১৯৬৪ সনের দাঙ্গার পর একবার চেষ্টা হল একটি 'পশ্চিম বঙ্গ লেখক সমাজ' গড়ার। চলল না।

বরঞ্চ ওদিকে 'ইন্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রিডম' যথেষ্ট তৎপর। মাঝে মাঝে তার উদ্যোগে সভা, সেমিনার, কবিতা পাঠের আয়োজন হয়। সেখানে অনেকেরই, এমন কি প্রগতিশীল বা কমিউনিস্টদেরও ডাক পড়ে সময়ে সময়ে। ভাষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশের সময় দেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত্ত হিন্দীবিরোধ ভাঙিয়ে ঐ কমিটির সদস্যরা হঠাৎ একসময়ে খুব তৎপর হয়ে ওঠেন—'মাতৃভাষা সংরক্ষণের' নামে আসলে ইংরেজী ভাষা সংরক্ষণের চেষ্টায়। সেই সময়ে ঐ কমিটি কিছুটা লেখকসাধারণের মধ্যে আসর জমাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার প্রকট কমিউনিজম-বিরোধিতা ও মার্কিন-স্তাবকতা অল্প দিনের মধ্যেই অনেকের মোহমুক্তি ঘটায়।

তারপর ১৯৬২-৬৩ সনের চীনা আক্রমণের সময়ে উন্মত্ত কমিউনিজম-বিরোধিতার ঝান্ডা উড়িয়ে ঐ কমিটি দেশ-আনন্দবাজার গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করে।' 'সাহিত্য শিল্পের স্বাধীনতা'র পতাকা ওড়ালেও আসলে যে সেটা নিছক কমিউনিজম-বিরোধিতা ছাড়া আর কিছু নয়—এবারেও তা ধরা পড়ে। অল্পকালের মধ্যেই 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজে'র এই চরিত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ায় সম্প্রতি এঁরা কিছুটা ম্রিয়মান, তবু মোটাই হতোদ্যম নন—USIS ও Max Muller Bhavan এর সহযোগিতায় নানা প্রলোভনের টোপ ফেলে বুদ্ধিজীবীদের গাঁথবার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলসভাবে।

প্রগতি লেখক আন্দোলনের এই হল অব্যবহিত পৃষ্ঠপট।

('কালান্তর,' শারদীয়, ১৩৭৪)

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা প্রসঙ্গে

১। পশ্চিম বাংলায় প্রতি দশজনে সাতজন নিরক্ষর। বাকী তিনজনের মধ্যে দু'জনের শিক্ষা অক্ষর-পরিচয় অবধি, বড়জোর তার একটু উপরে। দশজনের মধ্যে সাতজনের কাছে তাই সাহিত্যের, অন্তত লিখিত সাহিত্যের কোন সরাসরি আবেদন নেই। আরো দু'জনের কাছে তার দরজা সামান্য একটু খোলা। আর বাকী একজনকে নিয়েই আমরা সচরাচর যাকে বাংলা সাহিত্য বলে জানি, তার কারবার। সংক্ষেপে এই হল বাংলা সাহিত্য পাঠকের পরিচয়।

আমাদের সাহিত্যের উপরে এ ঘটনার প্রভাব দু'দিক দিয়ে। প্রথমত, বইয়ের বাজার এর ফলে গুরুতরভাবে সীমাবদ্ধ। এটাকে বলা যেতে পারে সংখ্যাগত বিচার। দ্বিতীয়ত, এর দরুন নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত কোটি কোটি দেশবাসীর সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর এক দুস্তর সামাজিক ও মানসিক ব্যাবধান গ'ড়ে উঠে গত দেড়শ বছরে সে-বিচ্ছেদ আরো পাকাপোক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা হল সমস্যার গুণগত দিক। আরো দশটা দিকের মতো বাংলা সাহিত্যে প্রাণশক্তিকেও বিড়ম্বিত করছে ঐ বাস্তব ও মৌল বিচ্ছিন্নতার গোড়ার গলদ।

২। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা, আদালত-কাছারী, শিল্পবাণিজ্য, চাকুরি, রাজনীতিচর্চা, দৈনন্দিন চলাফেরা, কথাবার্তা—অর্থাৎ সমগ্র সমাজজীবনে ও মানসিকতায় এখনো ইংরেজীর আধিপত্য বহুলাংশেই অব্যাহত। ইংরেজী-শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এখনো পর্যন্ত আমাদের প্রকৃত সমাজপতি। ফলে যাঁরা ইংরেজী শেখার সুযোগ পাননি বা কম পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে মজ্জাগত হয়ে রয়েছে এক ধরণের হীনমন্যতা। এই অস্বাভাবিক পরিবেশ যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের স্বাস্থ্য ও অগ্রগতির উপযোগী নয়, তা বলাই বাহুল্য।

৩। দেশবিভাগও বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যের উপরে এক প্রচণ্ড আঘাত। বাংলা বইয়ের বাজার এর ফলে অন্তত অর্ধেক কমে গেছে একচোটেই। অন্যদিকে দুই বাংলার স্বাভাবিক যোগসূত্র ছিন্ন ক'রে দেশবিভাগ বাঙালী সাহিত্যসেবীদের

ভিতরে নিয়মিত ও ধারাবাহিক তথ্য ও ভাব-বিনিময় অসম্ভব করে তুলেছে। এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে গোটা বাংলা সাহিত্যই।

উপরের ঐ তিন দফা বিড়ম্বনাই আমাদের উপরে দু'শ বছরব্যাপী সাম্রজ্যবাদী শাসনের উত্তরাধিকার। তবে এর প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতার রন্ধ্রপথেই প্রবেশ করতে পেরেছে সাম্রাজ্যবাদের সর্বনাশা শনি।

৪। আশা করা গিয়েছিল স্বাধীনতার স্পর্শে ভারতবর্ষের সব ক'টি ভাষা ও সাহিত্য দেখতে দেখতে আরো জীবন্ত ও ফলন্ত হয়ে উঠবে। তা যে হয়নি তার একটি কারণ ভারতীয় রাজনীতিতে ও কেন্দ্রীয় সরকারী ব্যবস্থার উপরেও উগ্র হিন্দীপ্রেমিকদের সর্বগ্রাসী প্রভাব। এরই দাপটে অন্যান্য ভাষার মতো বাঙলা ভাষা তথা সাহিত্যের অবস্থাও আজ কিছুটা কোণঠাসা। অন্যান্যদের তুলনায় হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারের উদার দাক্ষিণ্য চোখে পড়ার মতো, তবে সরকারের মধ্যেও এধরনের পক্ষপাতের বিরোধী মনোভাবও আছে। আবার উগ্র হিন্দীপ্রেমিকদের দাপটে ত্রস্ত আর সরকারের ঐ একচক্ষুতায় হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও লেখক মহলে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে ফের নতুন করে ইংরেজীকে আঁকড়ে ধরার। ফলে এ রাজ্যের সমগ্রজীবনে বাংলাভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠ করার সুস্থ, স্বাভাবিক, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যহত হচ্ছে পদে পদে।

৫। তবে সাহিত্য অকাদেমীর মতো প্রতিস্ঠান তার একান্ত সীমাবন্ধ সামর্থ্য এবং যথেষ্ট সাংগঠনিক দুর্বলতা সত্ত্বেও মোটের উপর সুস্থ, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল নীতি অনুসরণের চেষ্টা করছে কিছুটা। ভারতীয় ভাষাগুলিতে পরস্পরের সাহিত্য অনুবাদ, ভারতীয় ভাষায় বিদেশী চিরায়ত সাহিত্যের তর্জমা, বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনা, অভিধান ও লেখকজীবনী প্রকাশ প্রভৃতি উদ্যম তারই নমুনা।

৬। সাহিত্যের দিক থেকে এখনো প্রতি দশজন বাঙালীর ভিতরে দু'জনের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের স্বল্পশিক্ষিতদের মনের খোরাক অনেকটাই যোগায় বটতলা। সস্তা কাগজে, চিৎপুরের গলির মধ্যে সেকেলে ছাপাখানায় ছাপা সস্তা দরের বটতলার বই আজো হাটেবাজারে, মেলায়, গঞ্জে বন্দরে লাটের দরে বিক্রী হয়ে থাকে হাজারে হাজারে। রামায়ণ, মহাভারত, হিন্দু বা মুসলমান পুরাণের কাহিনী, লক্ষ্মী বা সত্যপীরের পাঁচালি, আরব্য উপন্যাস, হাতেমতাই বা

লায়লা-মজনুর কিস্‌সা, ব্রতকথা, সামাজিক ক্রিয়াকর্মের নিদান, লতাপাতার গুণাগুণ, বশীকরণ, নানাধরণের তুকতাক প্রভৃতিই হল বটতলার প্রধান উপজীব্য। আবার কালের গতির সঙ্গে তাল রাখার জন্য 'আধুনিক' ছাঁদে 'বিবি বউ', 'মডেল প্রেমে'র মতো শিরোনামার বইও প্রকাশিত হয় বটতলা থেকে। রামায়ণ, মহাভারত, পাঁজি আর বটতলার বই আজো গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে ছড়ানো। আবার আধুনিক পলেস্তারা লাগিয়ে শিশুদের জন্য যে 'দেবসাহিত্য কুটিরের' বই প্রকাশিত হয় তার বাইরের চটক সত্ত্বেও চরিত্রের দিক থেকে সেগুলি বটতলারই সগোত্র।

বটতলা মারফৎ রামায়ণ, মহাভারত বা কারবালা যুদ্ধের চিরায়ত কাহিনী অসংখ্য মানুষের কাছে পেঁছিলেও তার প্রভাব মূলত সামন্ততান্ত্রিক, প্রতিক্রিয়াশীল ও কুসংস্কার-পন্থী।

৭। তবে গ্রাম বাংলাতেও মধ্যযুগ আজ আর অচল, অনড় হয়ে নেই। সেখানেও পেঁছেছে নতুন কালের ডাক। খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা তো আছেই, তার উপরে রেডিও, ফিল্ম, থিয়েটরের দাপট এখন মফঃস্বলেও বহুদূর বিস্তৃত। আমাদের মতো নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিতদের দেশে প্রতি দশজনের মধ্যে ন'জনের কাছেই সাহিত্যের আবেদন সরাসরি চাইতে যে ঐ রকম ফলিত রূপেই বেশির কার্যকর হবে, সে'তো স্বভাবিক। সে যাই হোক, ঐ সবের দাপটে 'সেই সনাতন ভারতবর্ষের ট্রাডিশন' এখন বেশ কিছুটা বিপর্যস্ত। আর সে-দিক থেকে সাধারণ মানুষের কাছে নতুন ধরণের জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনা পেঁছানোর পক্ষে অবস্থা খুবই অনুকূল। কিন্তু সে-দিক থেকে সুসংগঠিত চেষ্টার অভাবে নতুনের আবির্ভাব সেখানে যে-ভাবে হচ্ছে তা'তে তার রূপ ও চরিত্র জনসাধারণের কাছে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে না—মানুষের মনে ছায়াপাত করলেও তার প্রভাব তাই এখনো গভীর বা দৃঢ়মূল নয়। বরঞ্চ তার ফলে উদ্রেক হয়েছে কিছুটা বিভ্রান্তি, অস্থিরতা ও আধুনিকতার বহিরঙ্গ-চর্চার।

৮। দশজনের মধ্যে বাকী একজনকে নিয়েই আমাদের পরিচিত বাংলা সাহিত্য। সেই একজনের উপরে সংগঠিত প্রভাব হিসেবে সব থেকে শক্তিশালী ও ধারাবাহিক হয়তো প্রধান দৈনিক পত্রিকা দু'টি এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা ও প্রকাশন সংস্থা। এই বহুল-প্রচারিত পত্রিকা দুটি প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

তার উপরে আবার অনেক লেখকই এদের বেতনভুক কর্মচারী; আরো অনেকে তাঁদের লেখার জন্য এদের কাছ থেকে—আমাদের দেশের মাপকাঠিতে—ভালো দক্ষিণা পেয়ে থাকেন মাঝে মাঝে। অনেকে তাই কমবেশী মাত্রায় মালিকদের চিন্তার সঙ্গে কিছুটা আপোষ করতে বাধ্য হন। সাধারণভাবে বলা চলে সে চিন্তা প্রতিক্রিয়াশীল। তার চরম পরিচয় প্যাওয়া যায় হয় তো দাঙ্গার সময়ে যখন দুই পত্রিকাগোষ্ঠী পাল্লা দিয়ে বিষ ছড়াতে থাকে সাম্প্রদায়িক প্রাদেশিক বা ভাষাগত বিদ্বেষের অথবা চীন-ভারত সংঘাতের দিনে যখন দেশপ্রেমের দোহাই পেড়ে একদিকে চূড়ান্ত জাতিবিদ্বেষ প্রচার চলেছিল প্রবন্ধে, কবিতায় ও গল্পে, আবার সেই সঙ্গে 'শিল্পীর স্বাধীনতার' মহৎ শিরোনামার নিচে ছোট বড় লেখকদের হুমকি দিয়ে বাধ্য করা হয়েছিল 'কেন তাঁরা কমিউনিজমে বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন,' সেই মর্মে জবানবন্দী দিতে। সাধারণ অবস্থাতেও এই দুই পত্রিকার পাতায় চমৎকার সহঅবস্থান দেখা যায় ধর্ম, অতীন্দ্রিয়তা, চূড়ান্ত কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, সব রকমের মধ্যযুগীয় চিন্তার পাশাপাশি মার্কিনী ঢং-এ গুন্ডামি, ধর্ষণ, যৌনবিকার, রোমাঞ্চকর গোয়েন্দাগিরি, গাঁজা ও সাধুভক্তি 'হিপিয়ানা', বিচ্ছিন্নতার গালভরা তত্ত্বের আড়ালে নিছক সমাজবিরোধিতার, এবং গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও মানবপ্রগতিতে ঘোর অবিশ্বসের। তবে হাওয়া বুঝে চলার ব্যাপারেও ওদের ওস্তাদি লক্ষণীয়।

৯। তৃতীয় বাংলা সংবাদপত্রটিও বহুলপ্রচারিত। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে অন্য দুই পত্রিকার মতো আচরণ করলেও কোন কোন ব্যাপারে এই পত্রিকা কিছুটা প্রগতিশীল দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে থাকে—যেমন সাধারণভাবে বলা চলে এর মনোভাব মার্কিনবিরোধী ও সোভিয়েত সমর্থক। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পর্কেও মোটের উপর ঐ কথাই বলা যায়। আর এদের সঙ্গে যে প্রকাশন সংস্থা জড়িত সেটি সুলভে কিছু কিছু চিরায়ত সাহিত্য প্রকাশ করে থাকে।

এ-ধরণের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিন্তু একটা কথা বলা দরকার। মালিকপক্ষের চাপে এদের সম্পাদকীয় নীতি রাতারাতি বদলে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

১০। সাময়িক পত্রিকার মধ্যে 'প্রবাসী', 'মাসিক বসুমতী'-র মতো কাগজগুলি ঠিক সাহিত্য-পত্রিকা নয়। সর্বার্থসাধক পত্রিকা হিসেবেও 'প্রবাসী' তার পুরানো চরিত্র ও গৌরব হারিয়েছে। 'বিশ্বভারতী পত্রিকায়' মাঝে মাঝে দু'একটি ভালো লেখার সন্ধান পাওয়া গেলেও তার সম্পাদনায় কোন ধার নেই।

'চতুরঙ্গ' কোনমতে চলছে। অর্থাৎ পুরানো কাগজগুলির সব ক'টিই শ্রীহীন-গতানুগতিক। আসল বাজার চালু পত্রিকা এখন 'নবকল্লোল,' 'গল্পভারতী'র মতো ঢাউস সাময়িকী যাতে মেলে অজস্র হাল্কা, চটুল গল্প ও উপন্যাস অথবা 'উল্টোরথ', 'জলসা'র মতো পুরো বা আধা সিনেমা পত্রিকা। কলকাতা ও মফঃস্বলের মধ্যবিত্ত মনের নিয়মিত খোরাক এই সব কাগজ—এমন কি ডালহাউসি স্কোয়ারের সংগ্রামী কর্মচারীরাও বাদ পড়েন না। আর আছে নানান ছাঁদের অসংখ্য ক্ষুদে পত্রিকা—তার কোনটির ঝোঁক কবিতার, কারো বা ছোটগল্পের, কোন কোনটিতে থাকে 'হাংরি-এংগ্রি'দের ঝাঁঝালো কবিতা, চুটকি রচনা। আর বেশ কিছু আছে বামপন্থী পত্রিকা। তাদের প্রসঙ্গ পরে আসবে।

ক্ষুদে পত্রিকার পরমায়ু সাধারণত বেশি নয়। তবে পিছনে কোন বামপন্থী দল বা গোষ্ঠী থাকলে কোনমতে কিছু কিছু কাগজ চলতে থাকে প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও।

১১। প্রকাশনার ক্ষেত্রে কিছু বনেদী ও কিছু হালের বড় বড় প্রতিষ্ঠান থাকলেও এখনো পর্যন্ত এক্ষেত্রে কোন অতিকায় সংস্থা একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অল্প পুঁজির মালিকেরাও তাই কিছুটা ইচ্ছামতো বই প্রকাশ করতে পারেন এখনো। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' 'জিজ্ঞাসা' 'ফার্মা কে·এল'-এর মতো প্রতিষ্ঠান চিরায়ত সাহিত্য বা সাহিত্যবিষয়ক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ করে। 'বিশ্বভারতীর' প্রকাশনা স্বভাবতই রবীন্দ্র-নাথকে ঘিরেই। অধিকাংশ প্রকাশকেরাই কিন্তু প্রধানত কথাসাহিত্য ও রম্যরচনার উপরে নির্ভর করেই ব্যবসা চালান। কবিতা বা নাটকের চাহিদা তুলনায় অনেক কম হলেও সম্প্রতি সেদিকে তরুণ কবিতারসিক বা নাট্য-মোদীদের কিছুটা দৃষ্টি গেছে। বীরবল বা অতুলচন্দ্র গুপ্তর মতো মনস্বী লেখকের 'পার্সনাল এসে' ধরনের রচনা আজকাল বিশেষ প্রকাশিত হয় না। তবে আনন্দের কথা গুরুতর বিষয় নিয়ে লেখা বেশ মোটা দামের বইয়েরও একটা বাজার হয় তো গড়ে উঠেছে। ইতিহাস, বিশেষ করে কলকাতার বা উনিশ শতকের বাংলার সমাজচিত্র অথবা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের কোন বিশেষ পর্বের বৃত্তান্ত বেশ কিছুটা চলে। দুর্ভাগ্যক্রমে তার চাইতেও বেশী চলে ইতিহাসের নামে রোমাঞ্চকর, ডিটেকটিভ ধাঁচের সব মনগড়া কাহিনী। বিজ্ঞানের জনপ্রিয় বই 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' ছাড়াও আরো কোন কোন

প্রকাশক অন্যরকমের বইয়ের পাশাপাশি প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন হয় তো কিছুটা পরীক্ষামূলকভাবেই। ভ্রমণকাহিনীর কিছুটা রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে কিছু দিন থেকে।

১২। বাংলা দেশের আর এক বৈশিষ্ট্য এখানকার অসংখ্য সাহিত্য বা সংস্কৃতি সংঘ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সুকান্তের জন্মদিন পালন ছাড়া এদের অধিকাংশেরই নিয়মিত কোন কাজের ব্যবস্থা নেই—বড় জোর মাঝে মাঝে কোথাও হয়তো সাহিত্য আলোচনার বৈঠক বা গানের আসর বসে। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র প্রধান কাজ প্রকাশনা ও তাঁদের বিখ্যাত লাইব্রেরিটি চালানো হলেও মাঝে মাঝে তাঁরা বক্তৃতারও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মানতেই হবে ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাধারণ বাঙালী লেখকের তেমন প্রাণের যোগ নেই। 'প্রগতি লেখক সংঘ' উঠে গেছে ১৯৫৩ সনের পরে। কবি সম্মেলন থেকে উদ্ভূত নতুন সংস্থাও সব কবির আস্থা অর্জন করতে পারেনি। ফলে সাহিত্য সংগঠনের ব্যাপারে কিছুদিন থেকে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, যদিও তার প্রয়োজনের কথা অনেকেই মানেন মনে মনে, এমন কি প্রকাশ্যেও।

তবে ছোট বড় সাহিত্য পত্রিকাকে ঘিরে যথারীতি চলে সাহিত্যিকদের আড্ডা। আপাতত সংগঠনে নয়, আড্ডাতেই প্রাণ ও মুখ খুলে তৃপ্তি পাচ্ছেন বহু বাঙালী সাহিত্যিক।

১৩। ওদিকে কিন্তু 'কমিটি ফর কালচারাল ফ্রীডম' সক্রিয়। তবে সি. আই. এ'র সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ায় সম্প্রতি এরা কিছুটা ম্রিয়মাণ ও সতর্ক। এদের আলোচনার বৈঠকে খুব একটা তেমন ভীড় হয় না। তবে চীনের সঙ্গে সংঘাতের সময়ে এরাই ছিল 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজের' একদিকের উদ্যোক্তা—অন্য প্রধান উদ্যোক্তা ছিল 'আনন্দবাজার'। সব মিলিয়ে 'কমিটি ফর কালচারাল ফ্রিডম' ততটা নয়, আসল বিপদ হচ্ছে খোদ মার্কিন 'ইউসিস' বা পশ্চিম জার্মান ম্যাক্সমুলর ভবনের' কাজকর্ম। নানারকম সভা আলোচনা, ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি ছাড়াও এরা অনুবাদের জন্য মোটা টাকা দিয়ে, স্কলারসিপের ব্যবস্থা করে, আমেরিকা বা পশ্চিম জার্মানী বেড়াবার আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের হাত করার অবিশ্রাম চেষ্টা চালায়—বেশ কিছুটা সমর্থও হয়।

১৪। বাংলাদেশের আর এক বৈশিষ্ট্য এখানকার অসংখ্য বামপন্থী পত্রিকা এবং সাহিত্য, নাট্য ও সংস্কৃতি সংঘ। এর মধ্যে 'পরিচয়', 'নন্দন,' 'ক্রান্তি'র

মতো পত্রিকার পিছনে বিভিন্ন বামপন্থী পার্টির সমর্থন আছে আর 'এক্ষণ', 'সাহিত্যপত্র' 'কম্পাস', 'সপ্তাহে'র মতো পত্রিকা চলে প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যমেই। এরা সকলেই কমবেশি আনুগত্য জানায় মার্কসবাদের প্রতি। পার্টি হিসেবে আমাদের কথায় পরে আসছি। অন্য পার্টির মধ্যে সি. পি. (এম) ও আর. এস. পি এ-ব্যাপারে সব থেকে অগ্রণী। যতদূর মনে হয় 'নন্দন' ছাড়াও সি. পি. (এম)-এর প্রভাবে আরো কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা আছে। তা ছাড়া সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাদের হাতে আছে গণনাট্যের একাধিক সংস্থা, একটি যাত্রার দল, সিনেমা-সংশ্লিষ্ট দু'টি ইউনিয়ন (তার মধ্যে একটির অবস্থা এখন কিছুটা পড়ন্ত) আর রবীন্দ্রসদন ও ফিল্ম-সংক্রান্ত কমিটিতে এবং সাধারণভাবে সংস্কৃতি সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের উপরে সব থেকে বেশি প্রভাব। আর. এস. পির হাতে 'ক্রান্তি' ছাড়াও আছে 'সংস্কৃতি পরিষদ' ও 'ক্রান্তি শিল্পী সংঘের' কর্তৃত্ব এবং লেখক সমবায়ের উপরে যথেষ্ট প্রভাব।

১৫। আর আমাদের পার্টির সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্ম চলে 'পরিচয়', 'দৈনিক কালান্তরের' রবিবারের পাতা, 'সাপ্তাহিক কালান্তর' ও আরো কিছু ঘনিষ্ঠ পত্রিকা এবং 'ইস্‌কাস্‌', 'ইন্দো-জি. ডি. আর,' 'মনীষা,' 'যুবসংঘ' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান মারফৎ। কয়েকটি নাট্যসংস্থা, একটি ফিল্মসংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও একটি ব্যাপকতর ফিল্মপ্রতিষ্ঠানেও আমাদের কমবেশী প্রভাব রয়েছে। তা ছাড়া সাধারণ বুদ্ধিজীবীসমাজ ও লেখকমহলে আমাদের কোন কোন কমরেডের সুনাম ও যোগাযোগও রয়েছে যথেষ্ট।

১৬। সর্বোপরি মনে রাখা দরকার পশ্চিমবাংলায় সাধারণভাবে যুক্তফ্রন্টের ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিপত্তির কথা, যুক্তফ্রন্ট সরকারের কথা আর বিশেষভাবে ঐ ফ্রন্ট ও সরকারের মধ্যে আমাদের পার্টির প্রভাবের কথা। এ সবের বিচারে সাধারণভাবে নিশ্চয়ই বলা চলে যে অবস্থা আজ খুবই অনুকূল, তবে সংগঠনের অভাবও আবার চূড়ান্ত রকমের। শুধু তাই নয়, এ'ও মনে রাখা দরকার যে গত কয়েক বছরে আমাদের রাজনীতি যেমন একদিকে উত্তরোত্তর চড়তে থেকেছে বামপন্থার পর্দায়, তেমনি আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিক্ষেত্রে দেখা গেছে এক ধরনের অর্থহীন হাল্কা হুল্লোড়বাজি। আর এই দুই প্রক্রিয়া যুগপৎ চলার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক কিম্ভূত পরিস্থিতির। সব চাইতে আশঙ্কার কথা বামপন্থার শিবিরও আজ পুরোপুরি

মুক্ত নয় ঐ হুল্লোড়বাজির সংক্রমণ থেকে। এ-ব্যাপারে চেতনার অভাবই শুধু নয়, ঔদাসীন্য অনেক সময়ে পৌঁছয় প্রায় অল্পবিস্তর প্রশ্রয়ের পর্যায়েও।

১৭। সুতরাং আমাদের কাজ হবে অবিলম্বে এই সব দুর্বলতা কাটিয়ে আমাদের নিজস্ব সংস্থা ও প্রয়াসগুলিকে সুসংবদ্ধ করা এবং তার ভিত্তিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফ্রন্ট রচনার চেষ্টা শুরু করা—অন্তত ব্যাপক সাহিত্য সংগঠন গড়ে তোলা। সে সংগঠনের নাম যাই আমরা স্থির করি না কেন তার ভিতরে সংহত করার চেষ্টা করতে হবে এই চারটি ধারাকে :

ক। উনিশ ও বিশ শতকের মূল সংস্কৃতি ধারা,

খ। লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির ধারা,

গ। আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী চিন্তাভাবনা,

এবং ঘ। ঐ তিন ধারাকে সাধ্যমতো আত্মস্থ করে, চল্লিশের যুগে যে প্রগতি লেখক ও গণনাট্য আন্দোলন চলেছিল, সেই ধারা।

মার্কসবাদী হিসেবে এর প্রত্যেকটি ধারারই যথার্থ মূল্য যাচাইয়ের চেষ্টা করতে হবে, নির্বিচারে সব কিছু গ্রহণের কথা নিশ্চয়ই ওঠেনা। কিন্তু সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বিশিষ্ট রূপ ও চরিত্র গড়ে উঠবে এই চার ধারার সুসমন্বয়ের চেষ্টার উপরেই। ধৈর্য ধরে সেই দুরূহ কাজ চালাতে হবে। তবে রাজনৈতিক সংকট যে দ্রুতগতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে চলেছে তা'তে এক্ষেত্রেও দ্রুত কাজ সমাধা করার উপরেই সাফল্য নির্ভর করবে শেষ পর্যন্ত।

(১৯৬৮)

'এষা' সম্পাদক সমীপেষু

বিমল,

তোমার 'এষার মুকুরে' তো দেখি সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের তাবৎ সমস্যারই প্রতিফলন। কিছু তার নিজস্ব, আভ্যন্তরিক সমস্যা, কিছু বা তার সামাজিক বা ভাবনাগত পরিমন্ডলের। তবে ও দুই-এর সম্পর্ক আবার এত নিবিড় আর ঘাত-প্রতিঘাত এত নিরবচ্ছিন্ন যে আসলে তাদের অমন আলাদা করে বিচারের কোন অর্থই হয় না শেষ পর্যন্ত। তোমার ত্রৈমাসিক বিচারেও সে-কথা পরিষ্কার।

সেই ভরসায় আরো একটা জরুরী কথা তোমার দরবারে পেশ করি। যদিও সংস্কৃতির ব্যাপকতর ক্ষেত্র জুড়েই হয় তো এর প্রযোজ্যতা, তবু সাহিত্যের নির্দিষ্ট পরিসরেই যে এখানে আমার বক্তব্য সীমাবন্ধ রাখছি তার কারণও স্বতঃপ্রতীয়মান হবে আশা করি। কথাটা এই: ছাপাখানার দৌলতে গত প্রায় পৌনে দুশ বছর ধরে বাংলা ভাষায় যে সাহিত্য রচনা ও চর্চা চলে এসেছে বরাবরই তার অব্যবহিত পৃষ্ঠপট হিসেবে থেকেছে দেশজোড়া নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার একটা ঘন কালো পর্দা। ফলে তার সামনে নব্য সাহিত্যের দীপশিখাটিকে যত বেশি উজ্বল ঠেকেছে, ঠিক ততটাই যেন তার প্রতি-তুলনায় আরো নিবিড় ও নিঃসীম হয়ে উঠেছে পিছনকার অন্ধকার। ক্রমে ব্যাপারটা অখন্ডনীয় এক বিধির বিধানের মতোই গা-সওয়া হয়ে এসেছে আমাদের। বিশ বছর আগে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির লগ্নে যদি বা একবার ক্ষণেকের তরে একটা ঘোর লেগেছিল—তবে বুঝি পুরানো দিনের দেনা এবার অবশেষে চুকলো—তা সে ঘোর কাটতেও দেরি লাগল না খুব একটা। নয়া সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও নির্দেশসূচক নীতির তালিকাভুক্ত হলেও শিক্ষার অধিকার ফলানো গেল না কার্য্যক্ষেত্রে। সংবিধান চালু হওয়ার দশ বছরের মধ্যে ১৪ বছর বয়স অবধি সমস্ত ছেলেমেয়েদের নি-খরচায় আবশ্যিক শিক্ষালাভের যে প্রতিশ্রুতি ছিল

সংবিধানের মধ্যেই, তা পূরণের যথোচিত প্রয়াস তো দূরের কথা, এমনকি একটা লোকদেখানো, দায়সারা চেষ্টাও তেমন দেখা গেল না সরকারী, বে-সরকারী কোন মহলেই। কাজ এগোনোর পর অবস্থাগতিকে হাল ছাড়া তবু বোঝা যায় কিন্তু এক্ষেত্রে যা হল তা হচ্ছে একেবারে গোড়ার থেকেই হাল না ধরে নিছক স্রোতে গা ভাসানো।

ফলে স্বাধীনতার বিশ বছর পরেও আজ দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা ৩৬ কোটি আর সে সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। কারণ বছর বছর যে ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দোরে এসে দাঁড়াবার বয়সে পৌঁছয়, তাদের মধ্যে অনেকেই তার চৌকাঠ পেরোনোর সুযোগ পায় না পর্যাপ্ত ব্যবস্থার অভাবে। ফি বছরই তাই সাবেকী নিরক্ষরদের দল ভারি করে একদল নয়া-নিরক্ষর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শতকরা আনুপাতিক হিসেবে কমলেও, মোট নিরক্ষর সংখ্যা তাই ক্রমাগত বেড়ে চলতে থাকে বছরের পর বছর। এর সঙ্গে ধরতে হবে নামমাত্র অক্ষরজ্ঞান আছে এমন সব মানুষকেও। তারাও নিশ্চয়ই কয়েক কোটি।

সুতরাং ঐ চল্লিশ কোটির মতো মানুষের কাছে সাহিত্যের অর্থাৎ লিখিত বা মুদ্রিত সাহিত্যের কোন আবেদন নেই—অন্তত সরাসরি। বড় জোর সিনেমা, থিয়েটার বা রেডিও মারফৎ তার হয়তো একটা পরোক্ষ মূল্য আছে তাদের কাছে। প্রতি চারজন বাঙালীর মধ্যে একজন মাত্র আমাদের বাংলা সাহিত্যের সম্ভাব্য পাঠক। বাকী তিনজনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই বাংলা সাহিত্যের।

সাহিত্যের প্রসঙ্গ ছেড়ে এইখানে একটা মূলগত প্রশ্ন তোলা যেতে পারে: এখন যে সব দেশে অক্ষরজ্ঞানের হার শতকরা একশ ভাগ বা তার কাছাকাছি তারা তবে ঐ অঙ্কে পৌঁছল কি করে? তাদের পথ কি আমরা ধরতে পারি না তাহ'লে? একটু খুঁজিয়ে দেখলে বোঝা যায় দু'ভাবে এ ব্যাপার সম্পন্ন হয়েছে বিভিন্ন দেশে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলিতে শিল্পবিকাশ ঘটেছে অপেক্ষাকৃত মন্থরগতিতে—বেশ কয়েক দশক তো বটেই, এমনকি এক বা দেড় শতক ধরেও, আর তারই তাগিদে, তারই সঙ্গে তাল রেখে অক্ষরজ্ঞান ও প্রাথমিক শিক্ষার মাত্রাও বেড়েছে মোটের উপর ধীরগতিতেই। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, মঙ্গোলিয়া বা হালে কিউবার মতো যে-সব দেশে শিল্পপ্রসার ঘটেছে সমাজতন্ত্রের বা অন্তত অ-ধনতান্ত্রিক পরিবেশে সেখানে দেখা গেছে শিল্পবিকাশের মতোই অক্ষরজ্ঞান ও প্রাথমিক শিক্ষাও এগিয়ে গেছে

অতি দ্রুতগতিতে—প্রায় 'forced march' বা জবরদস্তি ছুটে চলতে বাধ্য হওয়ার অবস্থায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে একমাত্র চেকোশ্লোভাকিয়াতেই সম্ভবত একদিকে শিল্পায়ন এবং অন্যদিকে অক্ষরজ্ঞান ও সাধারণ শিক্ষা যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছিল সমাজতন্ত্র পত্তনের আগেই।

এখন আমাদের বিপত্তি হয়েছে এই যে আমরা সমাজতন্ত্রের পথ না ধ'রে চলার চেষ্টা করছি বনেদী ধনতান্ত্রিক সড়ক ধরে অথচ এমন একটা অবস্থায় যখন আমাদের আর আঠারো বা উনিশ শতকের মতো ধীরে সুস্থে এগোনোর জো নেই, যখন আমাদের বিপুল জনসংখ্যার প্রত্যেকটি সমস্যাই পেকে উঠে পৌঁছানোর উপক্রম করছে একবারে বিস্ফোরণ-বিন্দুতে। এ হেন সঙ্গীন পরিস্থিতির সামাল দিতে হলে দেশকে তাই ঐ বনেদী সড়কের মায়া কাটিয়ে এগোবার চেষ্টা করতে হবে অন্য পথটি ধরে। এমন নয় যে এখন আমরা যে-ভাবে চলেছি তা'তে কোন সমস্যারই আর কিছুমাত্রও ঠেকা দেওয়া চলে না আরো কিছুদিন বা অক্ষরজ্ঞানের মাত্রা শতকরা একভাগও আর বাড়তে পারে না প্রতি বছর। কিন্তু একটা কথা খুবই পরিষ্কার যে এ অবস্থায় আলাদা করে এই সমস্যার বড় রকমের কোন সমাধান আর সম্ভব নয় এই পথে। কারণ যত দিন যাবে ততই আরো জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকবে অন্যান্য সমস্যার মতো এই সমস্যাটিও আর সমাধানের প্রত্যেকটি চেষ্টাই বিড়ম্বিত হতে থাকবে নতুন নতুন ও জটিলতর নানা সমস্যার উদ্ভবে।

সুতরাং আমাদের দেশে অন্য আরো দশটা মৌল সমস্যার মতোই এই ব্যাপক নিরক্ষরতা সমস্যারও সমাধান খুঁজতে হবে অ-ধনতান্ত্রিক পথেই। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে এ পথেও বাধা কম হবে না মোটেই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিক থেকে অনিবার্যভাবে যে বিরুদ্ধতা দেখা দেবে তা অনুমান করা চলে অনায়াসেই। কিন্তু তা বাদেও আরো একটি কথা আছে এখানে। গোড়ার থেকেই এই পথ হবে 'forced march'-এর পথ—কাজেই ব্যাপারটা আরামের হবে না আদৌ। 'সরকার সব করে দেবে', 'এই মাতব্বর বা ঐ মাতব্বরকে ধরতে পারলেই কাজ হাসিল হবে'—সেই ভরসায় হাত গুটিয়ে বসে থাকার জো নেই এ পথে। বরঞ্চ আত্মনির্ভরতা ও কঠিন পরিশ্রমই হবে এ পথের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক। এ পথে লাভবান নিশ্চয়ই হওয়া যাবে শেষ পর্যন্ত, কিন্তু তার জন্য দাম দিতে হবে পুরোপুরি। তবে এসব ঝামেলা এড়িয়ে তৃতীয় কোন সহজ পন্থা নেই এই দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক ব্যাধি

নিরাময়ের।

সাহিত্যের প্রসঙ্গে ফিরে গেলে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে এইখানে। আমাদের প্রতি চার জনে মাত্র একজনই বা যদি সাহিত্যের সম্ভাব্য পাঠক হয়, তা হলেও তো মোট সংখ্যা হিসেবে সেটা খুব কম দাঁড়াবে না—এক কোটির কাছাকাছিই হবে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যার মোট জনসংখ্যা এক কোটির কম অথচ যাদের সাহিত্য যথেষ্ট জোরালো, যেমন নরওয়ে বা সুইডেন। তাই যদি হয় তা হলে আমরা অন্তত সাহিত্যের দিক থেকে এত দুশ্চিন্তা করছি কেন? করছি এই জন্য যে সাড়ে তিন কোটির মধ্যে প্রায় এক কোটির অক্ষরজ্ঞান আর প্রায় এক কোটির ভেতরে সকলেরই অক্ষরজ্ঞান—এই দুই সমাজের পার্থক্য এতই মৌলিক যে অক্ষরজ্ঞানের মোট সংখ্যার কমবেশী দিয়ে তা আদৌ পরিমাপ করা চলে না। আসলে ব্যাপক নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, আশ্রয়হীনতা ক্ষুধা বা দারিদ্র্য—এ সবই এমন এক ধরনের সামাজিক ব্যাধি যা বিশেষ করেই পশ্চাৎপদ দেশগুলির অপরিহার্য সঙ্গী। সেই পশ্চাৎপদতা পরিস্ফুট হতে বাধ্য ঐ সব দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যেও, যতদিন না তারা ঐ কঠিন পরিশ্রমের পথে অগ্রসর হয়ে কাটিয়ে উঠতে পারে তাদের অনগ্রসরতার পিছুটান।

আমাদের বেলায় ঐ পশ্চাৎপদতা যে অনর্থের সৃষ্টি করছে মানসিকতার ক্ষেত্রেও, তার কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার শুনিয়েছেন শিক্ষিত সমাজকে। যেমন, "এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল। কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই অবাস্তব"।

সেই অবাস্তবতার ছোঁয়াচ তাই আমাদের সমস্ত চিন্তাভাবনায়, আমাদের সাহিত্যে শিল্পে, আমাদের সমগ্র আধুনিক সংস্কৃতিতে। এমন কি আমরা যখন অতি আধুনিক বিচ্ছিন্নতার সমস্যার আলোচনায় ক্ষণে ক্ষণে কামু, সার্ত্র বা উইলসনের দোহাই পাড়ি তখনো অনায়াসে ভুলে থাকি আমাদের এই গোড়ার গলদ, দেশের এই মূল বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ। অথচ প্রায় চল্লিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "কবি বলেছেন, 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে।' তিনি এইভাবেই বলেছিলেন যে, আমরা বিদেশীর শাসনে আছি। তার চেয়ে সত্যতর, গভীরতর ভাবে বলা চলে যে, আমাদের দেশে আমরা পরবাসী, অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য, আমাদের অস্পৃশ্য। যখন দেশকে মা বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি

তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা গুটিকয়েক আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব? শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ?"

যতদিন গেছে ততই এই দুস্তর ব্যবধান কবির মনকে পীড়িত করেছে তীব্র অন্তর্দাহে।

শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও সব থেকে অনুভূতি ও কল্পনাপ্রবন, অন্তর্দৃষ্টি ও তাই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলে লেখক ও শিল্পীদের সমাদর। সুতরাং সমস্যাটা যে শুধু এইমাত্র নয় যে দেশে অক্ষরজ্ঞানের প্রসার ঘটলে সাহিত্য পাঠকের সংখ্যাও বাড়বে (যদিও ও'টির অভাব এবং দেশ বিভাগের ফলে অধিকাংশ বাংলাভাষী পাঠককে হারানো বাংলা সাহিত্যের পক্ষে নিশ্চয়ই মস্ত বিপর্যয়), তার চাইতে অনেক গভীর—তা তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন মনে মনে। কিন্তু আরো কোন প্রত্যাশা কি আমাদের আছে তাঁদের কাছে এ প্রসঙ্গে? মুস্কিল হচ্ছে আরো দশটা ব্যাপারের মতো এখানেও হয়তো আমাদের খাঁই বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন ঐ রবীন্দ্রনাথই। কারণ শুধু সমস্যার উপলব্ধি নয়, মাথা-কোটা হাহুতাশ বা নিষ্ফল আক্ষেপ তো নয়ই—আত্মশক্তির পরে নির্ভর করে তিনি সরাসরি নেমে গিয়েছিলেন কাজে—লোকশিক্ষা, সমবায় সমিতি, কৃষি উন্নয়ন, সেচ, ম্যালেরিয়া ও জলকষ্ট নিবারণ—পল্লীসংস্কারের খুঁটিনাটি কোন কাজই তিনি বাদ দেননি—বিশ্বভারতীর তুঙ্গে উঠতে গিয়ে ভোলেননি শ্রীনিকেতনের মাটির কাজ। অর্থাৎ আমাদের দু'শো বছরের নব্য সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ যাঁর মধ্যে তিনি সৃষ্টি কর্মের নিরন্তর প্রবল তাগিদ সত্ত্বেও তুচ্ছ করেননি ঐ সব মামুলী সংগঠনের কাজ, বরঞ্চ অনেক সময়েই সে কাজেও প্রচণ্ড কল্পনাশক্তির সঙ্গে যুক্ত করেছেন প্রখর বিচারবুদ্ধিকে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দেখতে দেখতে ২৭ বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে সারা পৃথিবীতে আর আমাদের দেশেও। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও কিছুটা শিল্পপ্রসারও ঘটেছে দেশে। তবু নিরক্ষরদের সংখ্যা আজো ৩৬ কোটি এবং সে-সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান।

এই বিপুল সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাহিত্যিকেরা তবে আজ কি করবেন? অবশ্যই কাজটা তাঁদের একার নয়। তবে দেশের বড়বড় ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, ছাত্র ও নারী সংস্থা, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি

সংঘ—সকলে মিলিতভাবে এব্যাপারে অগ্রসর হলে সরকারও নিশ্চয়ই নড়তে বাধ্য হবে শেষ পর্যন্ত। এদের সকলের সঙ্গে মিলে সাহিত্যিকেরা একটা মস্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন সেই আন্দোলনে। তাঁরা বিশেষভাবেই যে কাজ-গুলি করতে পারেন মনে হয় সেগুলি হল ঃ

১। আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে দেশের লোককে যথাযথভাবে জানানোর জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখা। তাঁদের এই ধরনের লেখার অধিকাংশই যে সাহিত্যকর্ম না হতেও পারে তা বলাই বাহুল্য। তবে নাটক, ছড়া, গান বা কবিতাও খুব কাজে লাগতে পারে এ ক্ষেত্রে।

২। সদ্য-সাক্ষরদের জন্য পুস্তিকা রচনা। এ কাজ হয়তো অন্যেরাও পারে। তবু সাহিত্যিকেরা হাত লাগালে আরো ভালো হবে কারণ প্রথমত, তাঁদের কল্পনাশক্তি প্রবল, দ্বিতীয়ত, তাঁদের ভাষার উপরে দখল বেশি ও তৃতীয়ত, এ-ধরণের পুস্তিকায় তাঁদের নাম থাকলে তা'তে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে সহজেই। তবে এ কাজ করতে গেলে তাঁদের আগে আলোচনা করে নিতে হবে সেই সব কর্মীদের সঙ্গে যাঁদের হাতেনাতে অভিজ্ঞতা আছে এই কাজের।

৩। সাহিত্যিকেরা যে-সব সংস্কৃতি সংঘের সঙ্গে যুক্ত সেই সংস্থাগুলিকে তাঁরা উৎসাহিত করতে পারেন নিরক্ষরতা দূর করার নিয়মিত কাজকে তাঁদের কর্মসূচীর মধ্যে স্থান ও অগ্রাধিকার দিতে।

২৭. ৭. ১৯৬৮

('এষা', শারদীয়, ১৩৭৫)

গ্রহণ করতে হবে সময়ের চ্যালেঞ্জ

'অশোককুমার নাইট'-এর তাণ্ডবের পর উত্তমকুমারের রাইটার্স বিলডিংস অভিযান—চমকপ্রদ সব ঘটনা ঘটছে আমাদের এই আজব শহর, কলকাতায়! তবু এই নিয়ে লঘু পরিহাসে মাততে বা প্রবীণদের মতো "দেশটা সত্যিই গোল্লায় গেল"-র সস্তা ধুয়োয় গলা মেলাতেও মন সরে না। কারণ ব্যাপারটা বাস্তবিকই গুরুতর। এতো গুরুতর যে, এ-প্রসঙ্গে হাল্কা রসিকতা বা অভ্যস্ত হা-হুতাশের আর অবকাশ নেই। বরঞ্চ হালে চারদিকেই যে হাল্কা মনোভাবের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে—ঠিক তার বিরুদ্ধেই এই বক্তব্য পেশ করছি বাঙলাদেশের বামপন্থী অভিমানের দরবারে।

যে-সংস্থার নাম **'Young's Corner'** তারা তো **'Ashoke Kumar Nite'**-এর আয়োজন করতেই পারে। কিন্তু তাতে যখন বেলা দুপুর থেকে কলকাতার প্রতিটি পাড়া ও অনতিদূরের মফঃস্বল শহরগুলি পর্যন্ত ঝেঁটিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই তরুণ-তরুণীরাই চলচ্চিত্র তারকার টানে উন্মত্ত হয়ে ছুটে আসতে থাকেন—যাঁদের অনেকেই হয়তো রাজনীতির দিক থেকে বামপন্থার সমর্থক—তখন ব্যাপারটায় খটকা লাগে না কি? সে-অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সব অনাচার বা গুণ্ডামি ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে, সেগুলি এখন তদন্ত কমিশনের বিচার্য—তাই এখানে সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু অমন নামের সংস্থার অমন এক অনুষ্ঠানের সঙ্গে বামপন্থী মহলের কর্তাব্যক্তিদের নাম আদৌ জড়িত থাকে কেন? তেমনি, উত্তমকুমারকে দেখলে পাড়ার রকবাজেরা "গুরু, গুরু" করে ওঠে, সেটা বুঝি। কিন্তু রাইটার্স বিলডিংস-এর কর্মচারীরাও যখন ঐ তারকা দর্শনের উন্মত্ততায় ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ বন্ধ করে বসেন, তখন ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় নাকি? কারণ কেনা জানে যে ডালহাউসি স্কোয়ার অঞ্চলে তাঁরাই হলেন বামপন্থার সুবিদিত পৃষ্ঠপোষক? আর এটা যে ক্ষণিকের একটা স্খলনমাত্র নয়, তাও বোঝা যায় তাঁদের

অধিকাংশই কি বই পড়েন, কি নাটক অভিনয় করেন, কি সিনেমা দেখেন বা কি গান শোনেন, তার একটু খবর নিলেই।

একটা ব্যাপার ঘটে চলেছে চোখের সামনে। গত কয়েক বছরে আমাদের রাজনীতির সুর যেমন বামপন্থার পর্দায় উত্তরোত্তর চড়তে থেকেছে, তেমনি ঐ সময়ে অন্যদিকে এক ধরনের হাল্কা, অর্থহীন হুল্লোড়বাজি চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে আমাদের পেয়ে বসেছে। আর এই দুই প্রক্রিয়া যুগপৎ চলার ফলে এক কিম্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবে না যে—মানুষ, বিশেষ করে তরুণেরা, আনন্দ করবেন না, গোমড়া মুখে সর্বদাই তত্ত্বকথা আলোচনা ও দুরূহ কৃচ্ছ্রসাধন করবেন। কিন্তু আনন্দ মানে কি এই অর্থহীন হুল্লোড়বাজি? এ-ধরনের চ্যাংড়ামি, ছ্যাবলামির লক্ষণ সমাজে বরাবরই কিছুটা দেখা যেত। কিন্তু সেসব চলত আনাচে কানাচে, আড়ালে আবডালে, এখনকার মতো বুক ফুলিয়ে সমাজের গোটা আঙিনা জুড়ে নয়। এবং শুধু এইসব দুর্লক্ষণের ব্যাপকতাই নয়, সেইসঙ্গে আরো আশংকার কথা এই যে আজ বামপন্থার প্রভাবাধীন এলাকাও এর সংক্রমণ থেকে মুক্ত নয়। অবশ্য এমন নয় যে বামপন্থী প্রভাবের পরিধি এখন একাকার হয়ে গেছে এই হুল্লোড়বাজির পরিধির সঙ্গে। নিশ্চয়ই তা হয়নি। কিন্তু দুই বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করায় যে এখন দুই বৃত্তেরই অন্তর্ভুক্ত একটা এলাকার উদ্ভব হয়েছে—যার বাসিন্দাদের এক হাতে বিপ্লবের ঝাণ্ডা, অন্য হাতে ঢাউস সিনেমা অথবা 'জনপ্রিয়' পত্রিকা—সে কথা আর অস্বীকার করা চলে কি?

অথচ আমরা জানি যে বামপন্থা শুধু সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক কিছু কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি-আদায়ই নয়, একটি সমগ্র **way of life** বা জীবন-যাত্রা-প্রকরণ; আর তার পিছনে যে মতাদর্শ—তা'ও কতগুলি সর্বদোষহর মন্ত্র নয়, যার অবিরাম উচ্চারণেই সমস্ত মুস্কিলের আসান ঘটে। মানব সভ্যতা-বিকাশের গতিপথে উদ্ভূত বহু মূল্যবান মানবিক মূল্যবোধে সে-মতাদর্শ সুসমৃদ্ধ।

তবে এ-ধরনের বিপত্তি ঘটেছে কি করে, আর কি করেই বা একে প্রতিহত করা যাবে?

ঘটছে, আমরা ঘটতে দিচ্ছি বলেই। এ-কথা ঠিক যে অসমাপ্ত জাতীয় বিপ্লবজাত ব্যাপক হতাশা ও বিভ্রান্তি থেকেই এ-সবের জন্ম। এ'ও ঠিক যে,

দেশীবিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রীর দল এতে অবিশ্রাম সর্ববিধ ইন্ধন যোগাচ্ছে। দুর্ভাগ্য এই যে, পরিস্থিতির এই সঠিক বিশ্লেষণ থেকে আমরা এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত টানছি যে জাতীয় বিপ্লব সমাধা করার আগে এই সব গৌণ সমস্যার কোনো সমাধানই সম্ভব নয় এবং এ-প্রসঙ্গে তাই তার আগে আমাদের কিছু করণীয়ও নেই। আর একবার এই সহজসাধনের পথ ধরলে এমন কথাও ক্রমে মনে করা বিচিত্র নয় যে—এধরনের অর্থহীন হুল্লোড়বাজি বা নৈরাজ্যবাদী চিন্তা ও কর্ম হয়তো, এমনকি বিপ্লবের সহায়কও কিছুটা হতে পারে। এর থেকেই আসে এ-ক্ষেত্রে প্রশ্রয়, অন্তত ঔদাসীন্য ও নিশ্চেষ্টতার প্রবণতা।

এমন চিন্তা যে মারাত্মক তা বলাই বাহুল্য। কারণ, বাস্তব অবস্থা বিপ্লবের পক্ষে যতই হোক না কেন, তার সঙ্গে তাল রেখে বিপ্লবী চিন্তা যদি না অগ্রসর হতে পারে, বরং নানারকমের হাল্কা হুল্লোড়বাজির সঙ্গে আপোষ করেই চলে—তাহলে শেষ পর্যন্ত বিপ্লব নয়, প্রশস্ত হবে প্রতিবিপ্লবেরই পথ।

সুতরাং এই ব্যাপারে বামপন্থী মহলের প্রশ্রয় তো বটেই, এমন কি নিশ্চেষ্টতারও ফল আখেরে সাংঘাতিক দাঁড়াতে পারে।

তবে কি আইনের বা পুলিশের সাহায্যে এসব প্রতিহত করতে হবে? আমরা জানি চিন্তাভাবনা বা সাহিত্যসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপার নেহাতই চরমে না উঠলে আদালত বা পুলিশের হস্তক্ষেপ বিশেষ করে অবাঞ্ছনীয়। তাই পুলিশ দিয়ে 'মুক্তমেলা' বন্ধ করা বা সাহিত্যে অশ্লীলতা কতটা ঢুকল-না-ঢুকল তা পরখ করার জন্য লেখককে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সব সময় ঠিক নয় বলে মনে হয়। কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এ'ও নয় যে, ঐ হুল্লোড়বাজিকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া যেতে পারে অবাধে।

সুতরাং প্রয়োজন সমস্ত প্রশ্রয়ের মনোভাব ও নিশ্চেষ্টতা কাটিয়ে বামপন্থার তরফ থেকে অবিলম্বে এই ধরনের চিন্তা ও তৎপরতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও তার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় পাল্টা অভিযান পরিচালনা। সে-অভিযান নিশ্চই শুধু নেতিবাচক হবে না, বরঞ্চ মূলতই হবে সদর্থক। অর্থাৎ চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এটা চাই না বলাই শুধু নয়, হাতে কলমে দেখানো দরকার কি আমরা চাই। আর শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে যা চাই, তাকে যুক্তি দিয়ে তত্ত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই যথেষ্ট নয়। সেখানে সৃষ্টিকে উত্তীর্ণ হতে হবে রসের বিচারেও।

সেখানে তাই প্রভূত বৈচিত্র্য ও পরীক্ষার স্থান নিশ্চয়ই থাকবে—ছক ও বাঁধা বুলি সেখানে অচল।

ফরমাসটা নিশ্চয়ই বড়ো মাপের। কিন্তু উপায় নেই। কারণ এর বিকল্প হচ্ছে বর্তমানে চালু সহজসাধনের মারাত্মক পথ। তবে এক্ষেত্রে কি ধরনের যুক্তফ্রন্ট সম্ভব, সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকেই তার দু'টি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আর সে-দৃষ্টান্ত দূরেরও নয়। বাঙলাদেশ যখন অখণ্ড ছিল, তখন একদা এ-রাজ্যে বামপন্থীরা প্রেরণা পেয়েছিলেন মার্কসবাদী ভাবনার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত পশ্চিমের সাহিত্যলোক থেকে। প্রেরণা পেয়েছিলেন গর্কি, মায়াকোভস্কি, শোলোকভ, রলাঁ, আরাগঁ, এলুয়ার, কর্নফোর্ড, কডওয়েল, ফকস, স্টায়েনবেক, হেমিংওয়ে, ফাস্ট, নেরুদা, নিকলাস গীয়েন, নাজিম হিকমত-এর কাছ থেকে। তার পাশাপাশি তাঁরা তাকিয়েছিলেন আমাদের উনিশ শতকের ঐতিহ্যের সমর্থক দিকগুলির, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের দিকে। আর কিছুটা চেষ্টা হয়েছিল লোককলা-লোকসাহিত্যের গুপ্তধন সন্ধানেরও।

আর পদ্মার ওপারে আজ হয়তো আমাদের চাইতেও জটিল ও প্রতিকূল অবস্থায় যে-বামপন্থা ক্রমেই সংহত হচ্ছে—তার পতাকাতেও দেখি আন্তর্জাতিক মহারথীদের পাশাপাশি তাঁরা সগৌরবে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের নাম, প্রাণ দিয়েছেন অকাতরে বাঙলা ভাষার মান রাখতে। আর বাংলা একাডেমি মারফৎ সেখানে লোকসাহিত্যের ঐশ্বর্যসন্ধানের জন্য যে-কাজ চলছে, তার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠসূত্রে জড়িত রয়েছে সেখানকার বামপন্থা।

পদ্মার এপারে আমাদের তারুণ্য কি এ-থেকে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করবেন না?

('পরিচয়,' বৈশাখ, ১৩৭৬)

ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী আন্দোলনের পৃষ্ঠপট

ভাবগত দিক থেকে পরবর্তীকালের বিশিষ্ট চরিত্রের চাপে প্রগতি লেখক আন্দোলন ফ্যাসিস্টবিরোধী রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু ঘটনা পরম্পরার বিচারে দেখা যাবে যে ঐ রূপান্তর প্রতিক্রিয়ার ভিতরেও জটিলতা ছিল যথেষ্ট। তার মধ্যেও নিহিত ছিল বহু ক্ষয়, বিকাশ ও পুনরুজ্জীবনের কাহিনী। এ আলোচনার অবতারণা ঐ প্রসঙ্গেই।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় যে প্রগতি লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তারপর কিছুদিন প্রগতি লেখক সংঘের কাজকর্ম বেশ সোৎসাহেই চলে। তার শাখাগুলির তরফ থেকে কমবেশী নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় ঢাকায় 'প্রতিরোধ', কুমিল্লায় 'নবযুগ,' সিলেটে 'বলাকা' ও পাঁজিয়ায় 'প্রগতি' পত্রিকা। এর মধ্যে সবদিক থেকেই বিশিষ্ট ছিল 'প্রতিরোধ'। প্রথমত, অন্যগুলির তুলনায় এটি কিছুটা বেশি দীর্ঘায়ু হয়। দ্বিতীয়ত, সোমেন চন্দ, সর্দার ফজলুর করিম, রণেশ দাশগুপ্ত, মুনির চৌধুরী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, সত্যেন সেন প্রভৃতি বেশ কিছু শক্তিশালী লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ হত 'প্রতিরোধ' পত্রিকাটি।

কেন্দ্রীয় প্রগতি লেখক সংঘের তরফ থেকেও ঐ সময়ে **New Indian Literature** নামে একটি সংকলনের দুই সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এতে নতুন ধরনের গল্প ও কবিতা, প্রগতি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা, লেখক আন্দোলনের সমস্যা ও খবরাখবর সবই থাকতো কিছু কিছু।

কিন্তু সুষ্ঠু কর্মসূচী ও সাংগঠনিক তৎপরতার অভাবে ১৯৩৯ সালের শেষ দিকে এখানকার প্রগতি লেখক সংঘের কাজকর্ম কিছুটা ঝিমিয়ে আসে। জেলার পত্রিকাগুলি ক্রমেই অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ক্রমশই জেলা

শাখার সঙ্গে প্রাদেশিক কমিটির ও ঐ কমিটির সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। এমন কি সংঘের তরফ থেকে প্রকাশ্য বা কমিটি-গত আলোচনার ব্যাবস্থাদিও শিথিল হয়ে পড়ে অনেকখানি। কিন্তু এর থেকেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক হবে না যে অতঃপর প্রগতি রচনার প্রয়াস একেবারে বন্ধ হয়ে গেল সংঘের নিষ্ক্রিয়তায়। 'পরিচয়' পত্রিকা বহুদিন থেকেই এই ধরনের রচনার একটা মস্ত আশ্রয় ছিল—বিশেষ করে তার প্রবন্ধে ও গ্রন্থ সমালোচনার আসরে নতুন চিন্তা ও খবরাখবর পরিবেশিত হত নিয়মিত। নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন চন্দ্র সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সমর সেন, প্রমুখেরা ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এই পত্রিকার সঙ্গে। অন্যদিকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'ও তখন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বলিষ্ঠ সম্পাদনায় সাহিত্য ক্ষেত্রে অগ্রণী চিন্তার অন্যতম প্রধান বাহক ছিল। বিশেষ করে তার রবিবাসরীয় সংখ্যাগুলি অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, বিনয় ঘোষের লেখায় সমৃদ্ধ থাকত নিয়মিত। তৃতীয়তঃ ১৯৩৮ সাল* থেকে প্রকাশিত হয় 'অগ্রণী' পত্রিকা যার পৃষ্ঠাও গোড়ার থেকে মুক্ত ছিল প্রগতি সাহিত্য রচয়িতাদের কাছে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সরোজ দত্ত, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, অনিল কাঞ্জিলাল প্রভৃতি তরুণ লেখক তখন নিয়মিত লিখতেন 'অগ্রণী'র পাতায়। প্রগতি শিবিরের ভিতরে কিছুটা বিতর্কের সূত্রপাত করে এই পত্রিকা। যেমন প্রগতি লেখক সম্মেলনে বুদ্ধদেব বসুর বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা ('বৃহন্নলা ছিন্ন করো ছদ্মবেশ' প্রবন্ধ) প্রকাশিত হয় এখানে—আবার 'অবক্ষয়ীদের' সম্পর্কে কি করা উচিত এই নিয়ে সমর সেনের সঙ্গে সরোজ দত্তের তুমুল বাদানুবাদ চলে 'অগ্রণী'তে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উপলক্ষ্য ছিল New Indian Literature-এ প্রকাশিত সমর সেনের একটি প্রবন্ধ।

শুধু পত্রিকায় নয়, ঐ সময়ে প্রগতিশিবিরের এই আভ্যন্তরীণ সংঘাত প্রকট হয়ে ওঠে কোন কোন সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থের পাতাতেও। যেমন বিনয় ঘোষের 'শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ' ও 'নতুন সাহিত্য ও সমালোচন' প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে প্রগতিশীল মহলে। যে প্রগতি লেখক সংঘেরই বিশেষ দায়িত্ব ছিল এ ব্যাপারে সেটির তখন প্রায় অন্তিম দশা। অন্যদিকে যুদ্ধ বাধার কয়েকমাসের মধ্যেই 'অগ্রণী' বন্ধ হয়ে যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা'রও অধুনা-পরিচিত স্বরূপটি ক্রমশই প্রকট হতে থাকে।

* সঠিক প্রকাশ কাল জানুয়ারী ১৯৩৯—চ.স.।

'ফসিলে'র লেখক সুবোধ ঘোষের মতো কিছু কিছু লেখকের সহসা গোত্রান্তর ঘটে, এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ঔদাসীন্যের দরুণ 'পরিচয়' চলতে থাকে কিছুটা গতানুগতিক ভাবে। শুধু ছাত্রমহলের কিছুটা প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি চলতে থাকে প্রধানত Youths Cultural Institute (সংক্ষেপে YCI) নামক একটি তরুণদের প্রতিষ্ঠান মারফৎ ও কিছুটা ছাত্র ফেডারেশনের ঐ ধরনের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে।

'অরণি' ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় এর প্রকাশ। 'অরণি' সত্যই ছিল সেদিন সমস্ত প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনের বেসরকারী মুখপত্র। অবস্থার তাগিদে এর সুর ছিল প্রবলভাবে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী এবং সোভিয়েতের অনুকূল। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের পাকা হাতের বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় ছাড়া এর সব থেকে জনপ্রিয় বৈশিষ্ট্য ছিল সম্ভবত 'অনামী' বেনামিতে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের সপ্তাহে সপ্তাহে 'কথা প্রসঙ্গের' আলোচনা। এর মারফৎ তিনি সেদিন নিপুণ ও সরসভাবে নানা সাহিত্যিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গের বিচার করতেন প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে। 'অরণি'তেই সম্ভবত সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়।* কিন্তু সেটি কবিতা নয়—একটি নিপুণ সামাজিক নক্সা। 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ' সেদিন একদিকে সোভিয়েত জীবনের নানাদিক সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করে ও অন্যদিকে তীব্র প্রচার চালায় ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে। মুখ্যত এই তার কাজ হলেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা স্মরণীয়। যেমন সমবেতভাবে জাতীয় সঙ্গীত বা স্বরচিত গণসঙ্গীত গাওয়ার রেওয়াজ শুরু করে YCI কিন্তু তা আরো সংগঠিত ও ব্যাপক রূপ ধারণ করে 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘে'র উদ্যোগে। ঐ সংঘেরই বিশিষ্ট কর্মী, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় তর্জমা করেন ইতিহাসখ্যাত International গানটি। আমরা আজ যারা ঐ গান গাই তাদের অনেকেই হয়ত জানিনা এ কথা। সংঘের উদ্যোগেই প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসুর 'ফ্যাসিজম ও নারী' রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণের গ্রন্থ থেকে ফ্যাসিজম সংক্রান্ত একটি অধ্যায়ের বাঙলা বাঙলা তর্জমা, বিনয় ঘোষের 'সাংস্কৃতির দুর্দিন' প্রভৃতি বহু পুস্তিকা। দক্ষিণ কলকাতা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে 'প্রাচীর' নামে যে কবিতা সংকলনটি

* কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অরুণাচল বসুর কাছে পরে জেনেছি যে তার আগে সুকান্তর রচনা প্রকাশ হয়েছিল স্কুল পত্রিকায়—চ. স.

প্রকাশিত হয় ফ্যাসিস্ট বিরোধিতা প্রসঙ্গে সেটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েত সুহৃদ সংঘের প্রধান নায়ক ও কর্মী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতি বসু, স্নেহাংশু আচার্য প্রমুখেরা।

১৯৪২ সনের ৮ই মার্চ সোমেন চন্দ ঢাকায় গুপ্তঘাতকের হাতে শহীদ হন। তিনি ছিলেন একাধারে কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়নকর্মী ও শক্তিশালী লেখক। এই বর্বর হত্যাকাণ্ড সেদিন বাঙলাদেশের লেখকদের ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। পরিচয়ে প্রকাশিত তাঁর 'ইঁদুর' গল্পটি ইতিমধ্যেই তাঁকে লেখকমহলে যথেষ্ট পরিচিত করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরেই 'পরিচয়ে' সতীশ পাকড়াশী মহাশয়ের লেখা সোমেন চন্দের সংক্ষিপ্ত হৃদয়গ্রাহী জীবনী আরো ঘনীভূত করে তাঁদের বেদনা ও বিক্ষোভ। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ড. অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু থেকে শুরু করে ছোট বড় বহু লেখক এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি দেন খবরের কাগজে। আর দিন কয়েকের মধ্যেই তাঁদের এই বিক্ষোভই প্রকাশ পায় ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক সম্মেলনে।

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮শে মার্চ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরী হলে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে। এর থেকেই জন্ম হল 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের'। তার সভাপতি হলেন রামানন্দ বাবু এবং যুগ্মসম্পাদক—বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী আন্দোলনের এই হল পটভূমি।

('কাগজ,' শারদীয়, ১৩৮৫)

চীনের সংস্কৃতি বিপ্লব প্রসঙ্গে

১৩ বছর আগে চীনের সংস্কৃতি বিপ্লব প্রসঙ্গে 'পরিচয়' পত্রিকায় এক আলোচনা শুরু করেছিলাম এইভাবে ঃ

> ফুল-ফোটানোর গান শেষ না হতেই শোনা গিয়েছিল আগাছা নিড়োনোর হাঁক। কেমন জানি বেয়াড়া ঠেকলেও কেউ কি সেদিন ভাবতে পেরেছিলেন দশ বছরে (অর্থাৎ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসের বছর, ১৯৫৬ থেকে ঐ লেখার বছর ১৯৬৬ সাল অবধি—লেখক) ইয়াংসির জল সত্যিই এতদূর গড়াবে ?

তারপর এই ১৩ বছরে আরো বহু দূর গড়িয়েছে ইয়াংসির জল। 'সংস্কৃতি বিপ্লবে'র নেতা-নেত্রীবর্গ এখন শুধু মর্যাদার আসন থেকে বিতাড়িতই ন'ন, অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধও। স্বয়ং মাওৎসে-তুং-ও কিছুটা যেন অবহেলিত, পরোক্ষভাবে সমালোচিত এবং হতমান। অন্যদিকে 'সংস্কৃতি বিপ্লবে'র জোয়ারে ভেসে গিয়ে সেদিন যে-সব নেতা ও কর্মী উদ্বাস্তু হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই এখন রাজনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বাসন ঘটছে। লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে চীনের রাজনীতিতে চলছে প্রবল ক্ষমতা-দখলের লড়াই, যার ভিতর দিয়ে দেশ এখনো অবধি পৌঁছিতে পারেনি কোন সুস্থির ভারসাম্যে।

এ-সবের পাশাপাশি যখন মাঝে মাঝে খবর শুনি যে 'সংস্কৃতি বিপ্লবে'র আমলে পদচ্যুত ও লাঞ্ছিত সংস্কৃতি কর্মীরাও কেউ কেউ পূর্ব মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন অথবা দেশের বা পশ্চিমের খ্যাতনামা শিল্পী সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল বা প্রত্যাহৃত করা হচ্ছে, তখন তার তাৎপর্য ঠিক কি বা কতটা ?

ব্যাপারটা কি এই রকম যে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল, এখন সেটা শুধরে নেয়া হচ্ছে ? নিশ্চয়ই নয়, বরঞ্চ ইটালিয়ান কমিউনিস্ট নেতা, ন্যাপলিটানোর ভাষায়—"Not only 'excesses' but also the very criteria which

serve as a basis for the 'proletarian cultural revolution' (চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির প্রস্তাবে এই নামই দেওয়া হয়েছিল তাঁদের সংস্কৃতি বিপ্লবের—লেখক) are at variance with the correct view of the building of a socialist society and a socialist civilisatin') কারণ 'সংস্কৃতি বিপ্লবে'র বছরগুলিতে চীন দেশে যে ভাবগত পরিমণ্ডলটি বেশ সচেতন ভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল তার একটি অঙ্গ হল এক প্রবল ও উদগ্র জাতীয় আতম্ভরিতা যা উত্তরোত্তর প্রকট হয়ে উঠল ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নির্বিশেষে পশ্চিম দুনিয়ার সমস্ত জাতির প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ প্রচারে, মাও থেকে শুরু করে ছোট বড়ো মাঝারি সব নেতা ও কর্মীর সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে 'East wind prevailes over the west wind'—ক্রমাগত এই অসার মন্ত্র আওড়ানোয়, চীনে গ্রামাঞ্চল থেকে ক্রমে শহর দখল কৌশলের অনুসরণে সারা দুনিয়া জুড়ে গ্রাম-পৃথিবী কর্তৃক নগর পৃথিবী জয়ের 'গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটাজি' পরিকল্পনায়, 'সংস্কৃতি বিপ্লবে'র আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে সেক্সপীয়র-তলস্তয়-রলাঁ সাহিত্য, বেঠোভেন-মজার্ট-বাখ্ সঙ্গীতের নির্বাসনে এবং পিকিং মিউজিয়াম থেকে গ্রীক, রোমান, এমন কি প্রাচীন চীনা আর্ট সংগ্রহের অপসারণে।

আর চীনা 'সাংস্কৃতি-বিপ্লব' যে ভাবগত পরিমণ্ডলে সংঘঠিত হয়েছিল তার আর এক বৈশিষ্ট্য এই অন্ধ বিশ্বাস যে সারা পৃথিবীর এবং ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমানের সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেচনা ও প্রজ্ঞা বিধৃত রয়েছে একটি ত্রিকালজ্ঞ মানুষের মগজে।

এ-হেন নির্বিচার ভক্তি এবং তারই থেকে উদ্ভূত সব উদ্ভট আচরণের সঙ্গে যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের, তা বলাই বাহুল্য। কারণ 'সংস্কৃতিবিপ্লবে'র নামে চীন 'বিশুদ্ধ মার্কসবাদে'র, অচলায়তনের আড়ালে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও সংকুচিত করে রাখতে চাইছে দেশকাল উভয় দিক থেকেই। এই অপপ্রয়াস যুক্তিবিরোধী ও মানবতাবিরোধী আর তাই মার্কসবাদ-বিরোধীও। মার্কস-এঙ্গেলস্ প্লেখানভ-লেনিনের সংস্কৃতি চিন্তার সঙ্গে কোন মিল নেই চীনের এই 'সংস্কৃতিবিপ্লবে'র। প্রসঙ্গত মনে পড়বে মার্কসের প্রতি বছর মূল ভাষায় সেক্সপীয়র, গোয়েটে ও ইস্কাইলাসের রচনাপাঠের এবং Critique of political Economy-র ভূমিকায় গ্রীক নাটকের কালজয়ী আকর্ষণ বিষয়ে আলোচনার কথা। তলস্তয়ের সামাজিক মতামতের বিরোধী হয়েও লেনিন যে

তাঁকেই আবার অভিহিত করেছিলেন 'বিপ্লবের দর্পণ', তরুণ কমিউনিষ্ট সংঘের তৃতীয় কংগ্রেসে তিনি যে স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন—

Proletarian culture is not something that has sprung from nowhere, it is not an invention of those who call themselves experts in proletarian culture. This is all nonsense. Proletarian culture must be the result of the natural development of the stores of knowledge which mankind has accumulated under the yoke of capitalist society, landlord society and bureaucratic society—এ সব কথাও মনে রাখা দরকার। এমন কি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে (১৯৫৬) গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল।

...It is wrong to impose restrictions and arbitrary measures on science and art through administrative channels. We must continue to criticize the feudal and capitalist ideologies, but we must inherit and assimilate all useful knowledge, whether it is a legacy from the Old China or has been introduced from abroad.

আসলে 'সংস্কৃতিবিপ্লবে'র তাণ্ডব এখন আগের মতো না চললেও, এমন কি তার ফলে নির্যাতিত নেতা ও কর্মীদের মধ্যে কারো কারো সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটলেও—যে ভাব-পরিমণ্ডলে ঐ 'সংস্কৃতিবিপ্লব' সংঘঠিত করার চেষ্টা চলছিল, এখনো তা মুক্ত হয়নি দূষিত, মার্কসবাদ-বিরোধী চিন্তা ভাবনার ছোঁয়াচ থেকে। হালের চীনে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিতও দেখা যাচ্ছে না মৌল পরিবর্তনের। বরঞ্চ এই পর্বেই ঘটেছে একদিকে ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে চীনের অন্যায় অভিযান আর অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং চীনের নবনায়ক ডেন জিয়াও-পিং কর্তৃক সোভিয়েতের বিরুদ্ধে চীন-মার্কিন-পশ্চিম ইউরোপের একযোগে সংগ্রাম পরিচালনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

এই পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কোন প্রকৃত উন্নতির প্রত্যাশা তাই, মনে হয়, দুরাশা।

('আন্তর্জাতিক', শারদীয়, ১৩৮৬)

সাক্ষাৎকারঃ 'তীর'

[নভেম্বর বিপ্লবের ৬৩-তম বার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবাংলার কয়েকজন পরিচিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও শিল্পচর্চায় নভেম্বর বিপ্লবের প্রতিসরণের ক্ষেত্রফল জানাই ছিল উদ্দেশ্য। সময় সংক্ষেপের জন্য অনেকের কাছেই পেঁছানো সম্ভব হয়নি। যে প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে আলোচনা হয়, তা পাশে ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে দেওয়া হল। উত্তর-গুলি প্রশ্নের ক্রম অনুযায়ী পড়তে হবে। —'তীর' সম্পাদক]

প্রশ্ন ঃ

১। নভেম্বর বিপ্লব আপনাকে ছাত্র জীবনে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল?

২। আপনার শিল্প ও মনন চর্চায় নভেম্বর বিপ্লবের প্রেরণা কিভাবে বর্তমান?

৩। '৪০-এর দশকে দেশে গণমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যে জোয়ার ছিল, আজ তা নেই কেন?

৪। সময়োপযোগী ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আপনার পরামর্শ কি?

৫। আপনার শিল্প মাধ্যমের আগামী পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলবেন?

১। আমি যখন স্কুলের ছাত্র সে-সময় রাজনীতির থেকে খেলাধুলার ব্যাপারেই মাথা ঘামাতাম বেশী। রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহ হয় যখন কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হলাম তখন থেকে এবং রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে একটা তিন-টানা কাজ করতে লাগলো। এর প্রথম দু'টি আকর্ষণ হল, একদিকে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন এবং অন্যদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের বিপ্লবীদের আহ্বান। তৃতীয় টানটির সঙ্গে

নভেম্বর বিপ্লব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। সে সময় কাগজে প্রায়ই পড়তাম মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপার। শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহমদ, প্রভৃতি সেই মামলার আসামী ছিলেন। এঁদের কাগজে পাঠানো বিবৃতিতেই প্রথম রাশিয়ার কথা শুনলাম। এঁরা বললেন রাশিয়ায় শ্রমিকদের রাজ হয়েছে, গরীব-বড়লোকে ভেদ নেই, সব মানুষ সমান। কাজেই তৃতীয় আকর্ষণ হিসাবে কমিউনিস্টরা তাঁদের আশ্চর্য বাণী নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হলেন। আমার মতন ১৫/১৬ বছর বয়সের বালকের পক্ষে এদের কোনটিকেই ত্যাগ করা সম্ভব ছিলনা।

এরপর ১৯৩০এর শেষে কি '৩১-এর গোড়ায় 'প্রবাসী'র মাধ্যমে আমাদের হাতে 'রাশিয়ার চিঠি' এসে পেঁছিল। এর আগে রাশিয়া সম্পর্কে স্বল্পসংখ্যক মানুষ কমিউনিস্টদের কাছ থেকে কিছু শুনেছে এবং নেহেরুর রাশিয়া ভ্রমণের পর তাঁর লেখা বইও কিছু কিছু লোকের কাছে পেঁছেছিল। কিন্তু কবির বাণী আমাদের মত সাধারণ মানুষকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল। আগ্রহ নিয়ে পড়লাম রাশিয়ায় সাম্যের কথা। রাশিয়ার বিপ্লবকে বাইরের কিছু বলে আমার কখনই মনে হয়নি, আমাদের দেশে যে জাতীয় আন্দোলন চলছিল, নভেম্বর বিপ্লবকে দেখেছিলাম তারই একটা অঙ্গ হিসাবে। কাজেই এক কথায় বলতে গেলে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীদের বিবৃতি এবং 'রাশিয়ার চিঠি' ছাত্র-জীবনের প্রথম অবস্থায় নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে আমাকে প্রভাবান্বিত করেছিল। পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে অনেক বইপত্র পড়েছি এবং বিশদভাবে জেনেছি। এর পর আমার ইউনিভারসিটি-গতভাবে পড়াশুনা শেষ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার মার্কসীজমের শিক্ষা ঐখান থেকেই শুরু। যে দু'জনের কাছে আমি মার্কসীজমের পাঠ নিই তাঁরা হলেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ক্রিস্টোফার অ্যাকরয়েড।

২। শিল্পের কথা বলতে গেলে প্রথমে বলতে হয় আমি কোনদিন সত্যকার শিল্পচর্চা করিনি। তবে '৪০র দশকে যে ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক সংঘ তৈরী হয়েছিল সেখানে আমি ছোটখাট হলেও একজন সংগঠক হিসাবে পরিচিত ছিলাম। নিজেও অল্পসল্প লিখতাম। 'অগ্রণী' নামে একটি পত্রিকার পাঁচজন সম্পাদকের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আর এই সূত্রেই বেশ কিছু পরবর্তী কালের নামী লেখক, শিল্পীর সঙ্গে পরিচিতও হয়েছিলাম। যেমন সরোজ দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্র, সুভাষ। আমাদের মধ্যে সাহিত্যিক বিতর্ক

হতো। যেমন একবার হয়েছিল সমর সেনের সঙ্গে সরোজ দত্তর। আমরা এই ভাবেই সাহিত্যচর্চা করতাম। আমরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম স্পেনের গৃহযুদ্ধে। আপনাদের সময় যেমন ভিয়েটনাম, আমাদের সময় তেমন স্পেন। সেখানে সেসময় ক্রিস্টোফার কডওয়েল-এর মতো লোক 'ইলিউশন অ্যান্ড রিয়ালিটি'র মতো বই-এর খ্যাতি যাঁর পিছনে এবং তাঁর মতো আরো অনেক লেখক, বুদ্ধিজীবী স্পেনের 'ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড'-এ রাইফেল হাতে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সভ্যতাকে রক্ষা করতে। এই ঘটনাটা আমাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। সরোজ দত্ত একটি কবিতা লিখেছিল-'অসি ও মসী'। ঐ সময়ে আমাদের গভীরভাবে প্রেরণা দিয়েছিল রোমাঁ রলাঁর লেখা "I will not rest"। আর বিখ্যাত বিজ্ঞানী জে. ডি. বার্নালের লেখা "Social function of science"। কাজেই মননচর্চা বা শিল্পের প্রভাব বলতে গেলে বলতে হয় ওই ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ পরে যেটা ব্যাপক রূপ নেয় 'প্রগতি লেখক সংঘ' নামে এবং 'অগ্রণী' পত্রিকা এবং তারপরে 'অরণি' পত্রিকায় কিছু কাজ করেছি অন্যতম সংগঠক হিসাবে।

৩। দেখুন, আমি বরাবরই আশাবাদী। আপনারা বলছেন 'নেই'—আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আধ গ্লাস জল দেখলে কারো তার খালির দিকটাই চোখে পড়ে—কারো আবার ভর্তির দিকটা, আমি শেষের দলের। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর অনেক আছে কিন্তু মূলত সমস্যাটা হলো বিশ্বাস-বোধের, প্রত্যয়ের, আমাদের সময় আমরা যখন গান, নাটক, কবিতা, সাহিত্য করছি তখন কিন্তু এটার অভাব হয়নি। আমরা যখন ওই লেখক শিল্পী সংঘ-এ এসেছিলাম আসলে তখন আমরা সাহিত্য করবো, নাটক করবো, গান বাঁধবো, কবিতা লিখবো এই ভেবে আসিনি—আমরা এসেছিলাম এই ভেবে যে যা কিছুই করছি, সবই রাজনৈতিক কাজ। এবং এই গান, নাটক, কবিতার মধ্য দিয়ে আমাদের বক্তব্য আমরা বলবার চেষ্টা করেছি। এটা আমরা করেছি দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং একটি শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য। এক্ষেত্রে আমাদের ভিতর যে বিশ্বাসবোধ কাজ করতো তা কমিউনিজমে বিশ্বাস। কিন্তু এখনকার তরুণদের মধ্যে কমিউনিজম সম্পর্কে সেই প্রত্যয় নেই। প্রশ্ন উঠেছে কোনটা ঠিক, রাশিয়া না চীন? এ-ছাড়াও সংস্কৃতি বিষয়ে অনেকের অত্যন্ত rigid ধারণা। অবশ্য এটা আমাদেরও ছিল। আমাদের মধ্যেকার

এই সংকীর্ণ ধারণার জন্য আমরাও সংস্কৃতির আন্দোলন থেকে হয়তো কিছুটা পিছিয়ে পড়েছি সম্ভাবনার নিরিখে।

৪। বর্তমানে চলতি কথায় যাকে সাহিত্য করা বলে অর্থাৎ সৃজনশীল কাজ, আমি সেরকম কোন কাজ করছি না। আমি এখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু কাজ করবার চেষ্টা করছি। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে আমি সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেও যুক্ত করেছি। কাজেই সংকীর্ণ অর্থে সাংস্কৃতিক আন্দোলন নয়, ব্যাপক অর্থে জাতীয় আন্দোলন নিয়ে কাজ করছি কাজেই ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পরামর্শ দেবেন আজকে যাঁরা এ সমস্ত নিয়ে কাজ করছেন তাঁরাই। আর আমার এ-সম্পর্কে বক্তব্য হল সাংস্কৃতিক কর্মীরা যে যেখানেই কাজ করুন না কেন, তাঁদের প্রত্যেকের জানা উচিত যে তাঁদের কাজের একটা জাতীয়, এমন-কি আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত আছে। এটা বুঝতে পারলে তাঁর যে বিশিষ্ট কাজ তারও লাভ হবে এবং তিনি আরও ভালভাবে তার কাজটি সম্পন্ন করতে পারবেন।

৫। আগেই বলেছি যে, আমি কোনদিনই তেমন গভীরভাবে শিল্পচর্চা করিনি। যা কিছুই করেছি তার অধিকাংশই সংগঠক হিসাবে। কিন্তু এখন আমি আর এ ব্যাপারের অন্যতম সংগঠক হিসাবেও কাজ করছি না। বর্তমানে আমার আগ্রহ অন্যদিকে চলে গেছে। কিন্তু আমি যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করছি সেটা এই সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত তো নয়ই, বরং ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কাজেই এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে একত্র কাজ করার সুযোগ রয়েছে বলে আমার মনে হয়। ফলে আমরা যারা সচেতন সমাজকর্মী তাদের সঙ্গে সংস্কৃতিবিদদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে বলেই আমার মনে হয়।

('তীর,' নভেম্বর, ১৯৮০)

সাক্ষাৎকার : 'সত্যযুগ'

[চিন্মোহন সেহানবীশ এদেশের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত। তিরিশ দশকের শেষে ও চল্লিশের দশকে প্রগতি সাহিত্য ও গণনাট্য আন্দোলনের যে জোয়ার এসেছিল তারও তিনি অন্যতম সংগঠক ছিলেন। প্রকৃত অর্থে সৃজনশীল সাহিত্য রচনা না করলেও তাঁর ইতিহাসধর্মী গবেষণা এদেশের বিদ্বৎসমাজে বহুবার প্রশংসিত হয়েছে। মনের দিক থেকে তরুণ ৭০ বছর বয়স্ক এই বুদ্ধিজীবী এখন রোগাক্রান্ত হলেও সেদিনের কথা বলতে বলতে সটান, উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। —'সত্যযুগ' সম্পাদক]

'প্রগতি সাহিত্য'—এই কথাটিতে কি আপনার বিশ্বাস আছে? বললেন, কেন নয়? প্রায় আজন্ম এই ভাবধারায় বিশ্বাস করে এসেছি। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে লখ্নৌতে জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তা অনেক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। কারণ, ঐ অধিবেশনেই সারা ভারত কিষাণ সভা, সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন ও প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়। তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে কলকাতায় সাজ্জাদ জাহীরের সভাপতিত্বে প্রগতি লেখক সংঘের শাখা গঠিত হয়। প্রাদেশিক সংগঠন গঠিত হয় ১৯৩৬ সালেরই শেষ দিকে। পরে ৪২ সালের ২৮শে মার্চ এই প্রগতি লেখক সংঘ 'ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে' রূপান্তরিত হয়। '৪৩ সালে মে'তে বোম্বাইতে সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের সৃষ্টি হয়। ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ ও গণনাট্য সংঘ পরষ্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে থাকে। তাছাড়া ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সৃষ্টি হওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ ছিল ওপার বাংলায় তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দের ঘাতকের হাতে অপমৃত্যু। ৮ই মার্চ তিনি মারা যান। এই ঘটনা এ দেশের সর্বস্তরে বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ নাড়া দিয়েছিল। এরই ২০ দিন পরে প্রতিষ্ঠা হয় সংঘের।

এ-সব কাজের জন্য কমিউনিস্টপার্টির তরফ থেকে যে 'সেল' তৈরী হয় তাতে তিনজন ছিলেন ঃ বিনয় রায়, সুধী প্রধান ও আমি। যদিও প্রকৃত অর্থে আমি সাহিত্যিক ছিলাম না কিন্তু সংগঠনের কাজকর্মকে জোরদার করার জন্য, আর আমি কলকাতায় থাকতাম বলে আমাকেই 'সেল'এর সম্পাদক, নিযুক্ত করা হয়।

যাই হোক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে জার্মানী যখন রাশিয়াকে আক্রমণ করে তখন এ দেশের লেখক বুদ্ধিজীবীদের তরফ থেকে যে প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয় তার উদ্যোগ নিয়েছিল এই প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ। তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুন্সী প্রেমচন্দ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ স্বাক্ষর করেছিলেন। পরবর্তীকালে ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে প্রচুর লেখক ও শিল্পীকে আমরা টানতে পেরেছিলাম। লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখার্জি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সতীকান্ত ভাদুড়ী, বা তরুণ সুকান্ত ভট্টাচার্য যেমন ছিলেন, তেমনি শিল্পীদের মধ্যে সোমনাথ হোড়, চিত্তপ্রসাদ, জয়নুল আবেদিনের মতো মহৎ স্রষ্টাদের আমরা পেয়েছিলাম। পরে অবশ্য এর মধ্যে কেউ কেউ মনান্তর ও মতান্তরের দরুণ ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক সংঘের সংশ্রব ত্যাগ করেন। সে কথায় পরে আসব।

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন কি সর্বভারতীয় রূপ পেয়েছিল? প্রশ্ন করতেই চিন্মোহনবাবু বললেন, এ না হয়ে কোন উপায় ছিলনা। প্রথমত, তখন সারা দেশে ফ্যাসীবিরোধী মনোভাব দারুণ জোরদার হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক পট পরিবর্তন এদেশের জনমানসে দারুণ নাড়া দিয়েছিল। তার ওপর দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের কিছুটা প্রভাব ছিল তো বটেই। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাব বাংলায় যেমন পড়েছিল তেমনি উর্দু, মালয়ালম, তামিল, তেলেগু সাহিত্যেও পড়েছিল। হিন্দী ও মারাঠী সাহিত্যে এর প্রভাব পড়েছিল কিছুটা পরে। এই সেদিন যে দুই উর্দু কবি ও সাহিত্যিক মারা গেলেন—জোশ মলিহাবাদী ও ফিরাক গোরখপুরী এঁরাও প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ধাক্কায় প্রায় সব ভারতীয় ভাষাতেই আলাদা স্বাদের ও মেজাজের সাহিত্যরচনা হতে লাগলো। এটাই ছিক প্রধান বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন করেছিলাম, এদেশের বামপন্থী আন্দোলন ও প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন কি সত্যিই পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে? বললেন, এই দুই আন্দোলন পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ তো করেছেই? কারণ কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ছিল নাড়ীর যোগ। একথা অস্বীকার করার তো কোন উপায় নেই। কম্যুনিজমের মূল লক্ষ্য সর্বশ্রেণীর মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য। এই আধুনিক ও উন্নতমানের আদর্শ ভাবধারায় এদেশের তরুণ লেখক বুদ্ধিজীবীরা খুব স্বাভাবিক ভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একেবারে অতি-সাধারণ মানুষরা গল্পে-উপন্যাসে নাটকে নায়ক হয়ে উঠছিলেন। এরই ফলশ্রুতি বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্ন' নাটক, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান', সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এর কবিতা, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের গল্প উপন্যাস। কুলি, মজুর শ্রমিকের মতো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্রের স্বাদ বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা পেলেন। 'অগ্রণী, 'অরণি', 'প্রগতি' বা পরবর্তী-কালের 'পরিচয়'-এর মতো পত্রিকা ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার। অনেকে এই ধরনের সাহিত্যকে প্রোপাগাণ্ডা-মূলক সাহিত্য বা দলবেঁধে সাহিত্য রচনা হচ্ছে বলে উপহাস ও বিদ্রূপ করেছিলেন। এটা ঠিক এই ধরনের প্রায়সের জন্য হয়তো সব কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রকৃত সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এরকম উদ্যোগ না নিলে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা তো আমরা জানতে পারতাম না। অবশ্য এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ও শৈলজানন্দ। যাঁরা বলেন, রবীন্দ্র-শরৎ সাহিত্যে সাধারণ মানুষের কথা নেই তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই।

তুমি প্রশ্ন তুলেছ এদেশের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে চল্লিশের দশকের সার্থকতা ও ব্যর্থতা কোথায়? আগেই বলেছি, সার্থকতা অনেকখানিই ছিল। কিন্তু প্রশ্নটা হল এতবড় একটা আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী হল কেন? কেন শেষ পর্যন্ত টিকলো না? এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে নীহারবাবু মানে নীহার রঞ্জন রায়ের কথা। '৭০ সালে লেনিন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি সেমিনার হয়েছিল। তাতে নীহারবাবু এই প্রশ্নটা তুলেছিলেন। খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। আসলে এর জন্য আমাদের কম্যুনিস্ট পার্টির কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি

দায়ী। ঠিক যে কারণে আজ কম্যুনিস্ট পার্টি ত্রিধা-বিভক্ত হয়েছে ঠিক সেই কারণেই প্রগতি সাহিত্য ও গণনাট্য আন্দোলন এদেশে যে বিপুল সম্ভাবনার পরিবেশ তৈরী করেছিল তা কয়েক বছরের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেল। এজন্য আমি নিজে অন্তত দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগী। এই যে ষাট দশকের শেষে নকশাল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে সব তাজা তরুণ অকালেই প্রাণ দিল তাদেরকেও আমরা ঠিকমতো টানতে পারি নি। ফলে তারা দূরে সরে গিয়েছে। আজ যদি আমরা সবাই এক সঙ্গে কাজ করতে পারতাম তাহলে এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক গতিপ্রকৃতি কোন খাতে বইত তা ইতিহাস বলতে পারে। কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারিনা আমরা একটা অমূল্য সুযোগ হারিয়েছি।

চিন্মোহনবাবুর কাছে শেষ প্রশ্ন ছিল, একালের সাহিত্যের মূলধারা থেকে প্রগতি সাহিত্যের প্রবাহ কি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে? দ্বিধাহীন ভাবে বললেন, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে একথা বলা ঠিক হবে না। এখনো সমরেশ বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী তো প্রগতি সাহিত্যের ভাবধারাতেই লিখছেন। আমি মনে করি সমরেশ এখন শ্রেষ্ঠ লেখক * ওর মতো স্বচ্ছ চিন্তাধারা ও শক্তিশালী কলম খুব কম লেখকেরই আছে। তা ছাড়া এখন একটি অন্যতম কম্যুনিষ্টদল প্রভাবিত গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘর কাজকর্মের মধ্যে প্রগতি লেখক সংঘের ছায়া আছে। তবে ফ্যাসীবিরোধী লেখক বা গণনাট্য সংঘের যে ব্যাপকতা ছিল তা অবশ্য এঁদের এখনো নেই। তবু এরও যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলার আছে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে অপসংস্কৃতি বিরোধী আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই ভালো!

* কথাটা এভাবে বলিনি, কারণ আমার মতে **'We may be sure of the great but not of the greatest'**। তবে মুদ্রিত আকারে প্রকাশের পর লেখাটি পড়ে দেখিনি আর তাই ভুল শোধরাবার চেষ্টা করিনি যখন, তখন দোষটা আমারই। তবে ঐ বাক্যটির দ্বিতীয় অংশ থেকে সাধারণ বুদ্ধির যে কোন লোক ধরতে পারবেন যে আমি বলতে চেয়েছি যে সমরেশ বসু আমাদের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম। আর নারায়ণ চৌধুরীর মতো অসাধরণ বুদ্ধির মানুষের কথা স্বতন্ত্র। তবু তাঁর ভর্ৎসনা সত্ত্বেও আমি তাঁর সেই অসামান্য **equation**-টি মানতে পারব না যে:

সমরেশ বসু = যৌনতা = অপসংস্কৃতি। (চ. স.)

কিন্তু এই আন্দোলনে অনেক ক্ষেত্রে যে ভাবে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া হচ্ছে সেটা খারাপ, যেমন সমরেশ বসুর নাম করা হচ্ছে। কিন্তু সমরেশের আসল ব্যক্তিত্ব বা বক্তব্যকে এরা বুঝতে চান না বা চেষ্টা করেন না। এই মুহূর্তে স্টালিনের একটি চিঠির কথা মনে পড়ছে। চিঠিটি '৫৩ সালে স্টালিনের মৃত্যুর দু-একমাস পরে 'পরিচয়' এ ছাপা হয়েছিল। এক সময়ে রাশিয়ায় একটি অপসংস্কৃতিমূলক নাটক চলছিল। * তারই উল্লেখ করে এক ব্যক্তি স্তালিনকে লিখেছিলেন, আপনি ঐ নাটকটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করছেন না কেন? উত্তরে স্টালিন বলেছিলেন, 'ওটা ফরমানজারী করে হঠিয়ে দেওরা যায় ঠিকই। কিন্তু তাতে করে অপসংস্কৃতিমূলক মানসিকতাকে হঠানো যায় না। সত্যিকারের ভালো সাহিত্য বা শিল্পই এই মানসিকতাকে হঠাতে সক্ষম। আমারও ব্যক্তব্য সেটাই। বাংলা সাহিত্যে যদি অপসংস্কৃতিমূলক লেখার জোয়ার আসে তাকে হঠাতে পারে সত্যিকারের ভালো সাহিত্যই। ঐ ভাবে ব্যক্তি বিশেষকে চিহ্নিত করে তা দূর করা যায় না।

যাই হোক প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ৪০ বছর কেটে গেছে, কাজেই ৪০ বছর আগে তো আর ফেরা যাবে না। কথায় বলে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা। তাই সেটা করতে হলে ৪০ বছর আগেকার আন্দোলনের সার্থকতার দিকটা দেখলেই চলবে না, তার সীমাবদ্ধতা, অসম্পূর্ণতা, এমন কি তার ব্যর্থতার দিকেও নজর রেখে নতুন পর্বে, জাতীয় জীবনের নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। লেখক-শিল্পীকে পুরনোর উপর দাগা বুলিয়ে নয়, ভরসা করে নতুনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁদের নতুন ধরনের প্রগতি লেখক ও শিল্পী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সাক্ষাৎকার ঃ বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়

('সত্যযুগ,' মার্চ ২১, ১৯৮২)

---

* যতদূর মনে পড়ে 'পরিচয়ে' প্রকাশিত স্তালিনের লেখায় যে নাটকটির কথা উল্লিখিত হয়েছিল তার সমালোচনা অনেক করেছিলেন সেটি মতাদর্শগতভাবে দুর্বল ছিল বলেই। সুতরাং রাশিয়ায় একটি অপসংস্কৃতিমূলক নাটক চলছিল বললে মনে হয় ঠিক বলা হয় না। (চ. স.)

সাক্ষাৎকার : 'কলেজ স্ট্রীট'

প্রশ্ন : কবে এবং কি ভাবে প্রগতি লেখক সংঘ গড়ে উঠেছিল ?

উত্তর : এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে সংক্ষেপে হলেও আমাকে সংঘের জন্মকালের বৃত্তান্ত কিছুটা বলতে হবে। শুধু সন বা তারিখ দিয়ে এ প্রশ্নের জবাব হয় না। ১৯৩৬ সালে এপ্রিল মাসে লক্ষ্মৌতে জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় সেইখানে তিনটি নতুন সংগঠন জন্মগ্রহণ করে—'সারা ভারত কৃষক সভা,' 'সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন' এবং 'প্রগতি লেখক সংঘ'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনো শুরু হয় নি। কিন্তু বহু প্রগতিশীল দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে আমরা কমিউনিস্টরা ফ্যাসিজমের বিপদ এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা—এ দু'টোরই আঁচ পেয়েছিলাম। খুব স্পষ্ট ভাবে না হলেও আবছা ভাবে ভবিষ্যতকে দেখতে আমরা শিখি আমাদের সাম্যবাদী আদর্শের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ থেকে। মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। স্পেনে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে। 'ইন্টার-ন্যাশানাল ব্রিগেডে' দেশ বিদেশের কমিউনিস্টরা লড়ছেন স্পেনে গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের পক্ষে। সেই লড়াইয়ে প্রাণ দিলেন ডেভিড গেস্ট, রালফ ফক্স, কডওয়েল, ফেলিসিয়া ব্রাউন—প্রমুখ প্রগতিশীল সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবী লেখক শিল্পী। স্পেনের লড়াইয়ে এঁদের এই আত্মদান আমাদের ভীষণ-ভাবে নাড়া দিয়েছিল। এদেশে যাঁরা সেদিন কৃষক সভা ও ছাত্র ফেডারেশন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি লেখক সংঘ গড়ার তাগিদও অনুভব করেছিলেন, তাঁদের চিন্তায় সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক মুক্তির চিন্তা যে অনেকখানি কাজ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

১৯৩৬ সালে কলকাতায় 'প্রগতি, লেখক সংঘের' বাঙলা প্রাদেশিক শাখা গঠিত হয়। প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক সাজ্জাদ জাহীর এই উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসেছিলেন। তার মানে গোড়া থেকেই প্রগতি লেখক সংঘ

কোনো মাথাভারী সংগঠন হিসাবে গড়ে ওঠে নি। এর উদ্যোক্তাদের মনের মধ্যে যা ছিল তা হচ্ছে একটা নতুন সাহিত্য আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের স্বার্থেই ছিল সংগঠন। অর্থাৎ সংঘ ছিল একটা ভিন্ন ধরণের আন্দোলনের মুখপত্র, যে আন্দোলনের কথা ইতিপূর্বে সচেতন ভাবে আর কেউ ভাবেন নি—দলবদ্ধ হয়ে, কোমর বেঁধে তার জন্য তৈরিও হয় নি। এই দলবদ্ধতাটাকে পরবর্তীকালে কেউ কেউ নিন্দা বা পরিহাস করেছেন, বলেছেন, 'দল বেঁধে আর যাই হোক সাহিত্য হয় না'। সে যাই হোক, প্রগতি লেখক সংঘ গড়ে উঠেছে এই পটভূমিতে এবং তার রূপান্তরও ঘটেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে—এ কথাটা গোড়াতেই স্পষ্ট করে বলে রাখা দরকার।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে এই বাংলা প্রদেশে প্রগতি লেখক সংঘ 'ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে' রূপান্তরিত হয়। এ শুধু নতুন নামকরণ বা বহিরঙ্গের রূপান্তর মাত্র নয়। যে সংগঠন ছিল তা আরও ব্যাপক ও ব্যাপ্ত হল লেখক শিল্পী সংগঠনে। সংগঠনের আঙ্গিনা আরও বড় হয়। সেদিন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল সারা পৃথিবীতে তার শরিক হওয়ার প্রতিশ্রুতি পরিস্ফুট হল সংগঠনের নতুন নামের মধ্য দিয়ে। এর এক বছর বাদে ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে 'সারা ভারত গণনাট্য সংঘ' তৈরি হয়। 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ' ও 'গণনাট্য সংঘ' সহোদর হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। তাঁদের সঙ্গে চিত্রশিল্পীরাও যোগ দেওয়ায় আন্দোলনের পরিধি, আরো বিস্তীর্ণ হল সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই।

প্রসঙ্গত বলি, তখনকার পূর্ব বাঙলায় তরুণ লেখক ও ট্রেড ইউনিয়নিস্ট সোমেন চন্দর নিষ্ঠুর হত্যার ঘটনা সেদিন সমস্ত স্তরের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বিপুলভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। এই হত্যার ঘটনার ২০ দিন বাদে আমাদের সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। সোমেন কমিউনিস্ট ছিল। কমিউনিস্ট হিসাবে অযথা গর্বের অপচয় না করেও এখানে আবারো মনে করিয়ে দিচ্ছি—সোমেন কমিউনিস্ট ছিল। পরবর্তীকালে তেমনি গণনাট্য সংঘের দুই কর্মী, সুশীল মুখোপাধ্যায় ও ভাবমাধব ঘোষও নিহত হয়েছিল কমিউনিস্ট-বিরোধী রাজনৈতিক গুণ্ডাদের হাতে। আচ্ছা,

আমাকে দেখান তো এদেশে কটা লেখক শিল্পী নাট্য সংস্থা আছে যার পিছনে এতগুলি জীবনের দাম দিতে হয়েছে ? যে প্রতিশ্রুতি সোমেন তার স্বল্প পরিসর জীবনে গল্পে উপন্যাসে দেখিয়েছিল তাতে মনে হয় বেঁচে থাকলে সে বাঙলা সাহিত্যে নাম রেখে যেত পারত।

প্রশ্ন ঃ আপনি ব্যাপকতার কথা বলেছেন। তা কি শুধু সংগঠণের নামেই ছিল, না কার্যক্ষেত্রেও 'সর্বস্তরের লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের আপনারা টানতে পেরেছিলেন ?

উত্তর ঃ নিশ্চয় পেরেছিলাম আর তখন একমাত্র আমরাই তা পেরেছিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক বিশেষ পর্যায়ে, জার্মানী যখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে, তখন এদেশের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে সেই আক্রমণের নিন্দা করে এক প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয়। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগেই সেই প্রতিবাদলিপি প্রেরিত হয়েছিল। স্বাক্ষর করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুনসী প্রেমচন্দ, শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, সাজ্জাদ জাহীর প্রমুখেরা। প্রগতি লেখক সংঘ অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম দুর্লভ আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছে, যার জন্য তার গর্ব এবং যা তার সাফল্যের পুরস্কারও বটে। আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের তো আমরা আমাদের সংগঠনে টেনে আনতে পেরেছিলাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো আমাদের কর্মী ছিলেন প্রতিদিনের। অন্যদিকে শিল্পীদের মধ্যে সোমনাথ হোড়, চিত্তপ্রসাদ, জয়নাল আবেদিন, নীরোদ মজুমদারের মত মহৎ স্রষ্টাদেরও আমরা সঙ্গে পেয়েছিলাম। সুতরাং আমরা শুধু কমিউনিস্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলাম এ কথা কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু সেটা ভুল। ইতিহাসকে ঠকানো খুবই শক্ত। তবু এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা উচিত। ইতিপূর্বে যাদের নাম করেছি তারা যে চিরকাল আমাদের সংগঠনে বা আন্দোলনের শরিক হয়ে থেকেছেন তা নয়। মনান্তর ও মতান্তর সংঘের মধ্যে ছিল—তা নিয়ে আলোচনা বিতর্কও হয়েছে। এবং মনান্তর বা মতান্তরের জন্য এঁদের কেউ কেউ বিভিন্ন সময়ে সংঘের সংশ্রব ত্যাগ করেছেন এও সত্য। কেউ কেউ

প্রগতি সংঘ ছেড়ে পাল্টা সংগঠনও গড়েছেন বা তার প্রবক্তা হয়েছেন। অন্যদিকে আমরা কিন্তু সেই সংগঠনকে কোন কালেই অচ্ছুৎ বলে মনে করি নি। যখনই বৃহত্তর এবং ঐক্যবন্ধ আন্দোলন বা লড়াইয়ের প্রশ্ন এসেছে, 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে'র সঙ্গে একযোগে তা করেছি। রেডিও শিল্পীদের একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠান 'আর্টিস্ট এসোসিয়েশনে'র সঙ্গে আমরা 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'কেও দাঙ্গার বিরুদ্ধে মিছিলে ডেকে এনেছি। তাদের সঙ্গে একযোগে স্বাধীনতা দিবসও পালন করেছি।

প্রশ্ন ঃ চল্লিশের দশকে এই যে ব্যাপক শিল্প, সাহিত্য ও নাট্য আন্দোলন আপনারা গড়ে তুলেছিলেন তার মূলে প্রধানত ছিল কমিউনিস্টরা বা তাদের সহযাত্রীরা—এটা তো ঠিক ?

উত্তর ঃ শুধু কমিউনিস্টরা বললে হয়তো ভুল হবে। আসলে ব্যাপক বামপন্থীদের আন্দোলন ও প্রগতি সাহিত্য, শিল্প এবং গণনাট্য আন্দোলন ছিল পরস্পরের পরিপূরক। আন্দোলনের দৈনন্দিন কাজের মূল সংগঠক হিসাবে কমিউনিস্টরাই অবশ্য এগিয়ে এসে কাজ করেছেন, হাত লাগিয়েছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এই আন্দোলন গড়ে উঠতে পারত না। 'অগ্রণী', 'অরণি', ঢাকার 'প্রতিরোধ' এবং পরে 'পরিচয়' পত্রিকা ছিল প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের হাতিয়ার। এখানেও কমিউনিস্টদের মস্ত বড় ভূমিকা ছিল। তবে এও এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে কমিউনিজমের সমাজ-সাম্যের আদর্শ সে সময়ে তরুণ লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকভাবেই আকৃষ্ট করেছিল এবং সেই আকর্ষণের প্রতি-ফলনই দেখা গিয়েছিল তারাশঙ্কর, মানিক, সতীনাথ প্রমুখের সাহিত্যে—বিষ্ণু দে, সুভাষ, সুকান্তর কবিতায়, জ্যোতিরিন্দ্র মিত্রের নবজীবনের গানে, বিজন ভট্টাচার্যের নবান্নতে এবং শম্ভু মিত্রের অভিনয় ও নাট্য-পরিচালনায়—আরও অসংখ্য নাম করা যায় কিন্তু তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই।

সাধারণ মানষের দুঃখ-দুর্দশার বা জীবন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত সাহিত্যে রূপ দেওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, শৈলজানন্দ অবশ্যই পথিকৃৎ। কিন্তু ব্যাপকভাবে সাহিত্যে সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, সংগ্রামের প্রতিফলন আনতে যে প্রগতি সাহিত্য সাহায্য করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য তার সবই যে সাহিত্য হিসাবে উতরেছে তা

নয়। অনেক দুর্বল অক্ষম রচনাও রচিত হয়েছে। কিন্তু কালজয়ী সাহিত্যও রচিত হয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রগতি লেখক ও শিল্পী আন্দোলনের আর একটি মস্ত বড়ো কাজ লোককবি, লোক-শিল্পী, লোক সাহিত্যিকদের সংঘবদ্ধ করার এবং তাঁদের সঙ্গে বাইরের সাহিত্যিক বা শিল্পীদের যুক্ত করার চেষ্টায় হাত দেওয়া। মুর্শিদাবাদের শেখ গোমহানি, চট্টগ্রামের রমেশ শীলের মতো লোককবিকে কলকাতার নাগরিকদের সামনে তাঁদের শিল্প পরিবেশন করার সংযোগ ঘটানোর কৃতিত্ব তাঁদেরই।

প্রশ্ন : আপনারা মূলত চল্লিশের দশকে এই যে ব্যাপক প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন—যার মধ্য থেকে পরবর্তী কালের অনেক খ্যাতনামা শিল্পী সাহিত্যিক উঠে এসেছিলেন, সেই আন্দোলন বা সেই সংগঠন কেন এক দশক মাত্র টিকে থাকল? কেন স্থায়ী রূপ নিতে পারল না?

উত্তর : এ প্রশ্ন নিয়ে যখন ভাবি তখন প্রচণ্ড এক মানসিক যন্ত্রণা আমাকে পীড়িত করে। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের উদ্যোক্তা ও সংগঠক যেমন ছিল কমিউনিস্টরা তেমনি আবার প্রধানত তাঁদেরই ভুল ভ্রান্তির জন্য অত বড়ো আন্দোলন ও সংগঠন কালজয়ী হয়ে টিকে থাকতে পারে নি। অনেক ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের সংকীর্ণতা, (অবশ্য সংকীর্ণতাটা কমিউনিস্ট-দেরই একচেটিয়া নয়) যা আসলে তাঁদের আদর্শের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না, সেই সংকীর্ণতা তাঁদেরই তৈরী অনেক সংগঠনের ও আন্দোলনের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনও তারই একটি শিকার। দ্বিতীয়ত কমিউনিস্ট আন্দোলন নিজেই দ্বিধা, ত্রিধা এবং সম্প্রতি বহুধা-বিভক্ত হওয়ায় অনিবার্য্য ভাবেই এই সব সংগঠন ও আন্দোলনকে আঘাত করেছে।

কিন্তু তাই বলে আমি এখনও হতাশ নই। চল্লিশ বছর কেটে গেছে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের। আমার বয়সও সত্তর ছুঁয়েছে। কিন্তু আমি এখনও ভবিষ্যতের উপরে আশা রাখি। পুরানো ভুল, ত্রুটির দিকে নজর রেখে আজও সাহিত্য, শিল্প, নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলা যায়—সমাজের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে। তবে তা পুরানো দিনের সংগঠন ও আন্দোলনের ধাঁচের হুবহু অনুকরণ হবে না। জাতীয় জীবনে বহু অবস্থান্তর ঘটেছে, সূচনা হয়েছে আন্তর্জাতিক জীবনে

নতুন পর্বের, দেখা দিয়েছে নতুন নতুন সমস্যা। সে-সবের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পৃষ্ঠপটে চিনতে হবে এ-দেশের নতুন বাস্তবতাকে। আর তারই ভিত্তিতে রচিত হবে নতুন প্রগতি সাহিত্য, গড়তে হবে নতুন প্রগতি সাহিত্য সংগঠন ও আন্দোলন।

সাক্ষাৎকার : নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

('কলেজ স্ট্রীট', জানুয়ারী, ১৯৮৩)

আমরা ও ওরা

এবারকার ২৫শে বৈশাখের কয়েক মাস আগে থেকে কিছু সমালোচক কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এ-ধরনের তিন দফা অভিযোগ তুলেছিলেন ঃ

১। কমিউনিস্টরা আসলে রবীন্দ্রবিরোধী। তাঁরা কবিকে বুর্জোয়া বলে নিন্দা করে থাকেন।

২। তবু তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের কিছু বাছাই-করা অংশের সুবিধাবাদী অপপ্রয়োগ করে থাকেন তাঁদের কুমতলব হাসিল করার জন্যে।

৩। তাঁরা 'রাশিয়ার চিঠি' এবং বড় জোর 'ওরা কাজ করে'-গোছের কয়েকটি কবিতাই বোঝেন—রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টি সম্পদের মর্ম উপলব্ধি তাঁদের 'কম্ম' নয়।

এসব অভিযোগের পুরোদস্তুর জবাব এখানে দিতে বসিনি। তা ছাড়া আরো দু'টো কথা আছে এ প্রসঙ্গে। প্রথমত, রবীন্দ্র সৃষ্টির বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কমিউনিস্টরাও নিশ্চয়ই কিছু ভুল করেছেন অতীতে, ভবিষ্যতেও হয়তো করবেন—ঠিক যেমন করেছেন এবং করেন অকমিউনিস্ট সমালোচকেরাও। দ্বিতীয়ত, সাহিত্য অনুধাবনের ব্যাপারে দৃষ্টিকোণের দিক থেকে গভীর মিল থাকলেও এ-ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সব কমিউনিস্টের এক রা অতীতেও ছিল না, এখনো হয়তো নেই। তাতে আপত্তি কি?

আমার আলোচনা এখানে শুধু ৯ই মে (পঁচিশে বৈশাখের পরের দিন) তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত বিশেষ একটি রচনা প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ কারণ ঐ তিনদফা অভিযোগই সেখানে তোলা হয়েছে বেশ প্রকটভাবে। লেখাটির নামও দেওয়া হয়েছে—'বুর্জোয়া বলে নিন্দিত কবি এখন সংগ্রামী শিখা।'

লেখক শ্রীঅরুণ বাগচী স্পষ্টতই কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী। এটাই অবশ্য প্রত্যাশিত ঐ পত্রিকায়। কিন্তু তাই বলে অন্ধ বিদ্বেষ বশে ১৭০ লাইনের

লেখায় অতোগুলি ভুল—তথ্যগত ভুল—ঠিক আশা করিনি। শুনি 'আনন্দবাজার' মালিকদের অনেক টাকা। তবু ওঁদের টাকা ওঁরা অপচয় করবেন—তাতে আমার কি ?—এই ভেবে চুপ করে থাকা গেল না।

বাগচী মহাশয় লিখেছেন জন্মোৎসব 'প্রতি বছরই হয়ে আসছে, বেশ বারোয়ারী পুজো পুজো আবহ তৈরী হয়ে যায় প্রতিটি পঁচিশে বৈশাখে' কিন্তু এবার 'বেশ বড়, চোখে পড়ার মতো একটা পার্থক্য আছে। এবার দেখে শুনে মনে হবে যে অবশেষে প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র তথাকথিত প্রগতিশীল শিবিরের নয়নের মণি হয়ে উঠেছেন।...বিশেষ করে ফ্রন্ট সরকারের কাছে বুর্জোয়া বলে একদা নিন্দিত কবি এক সংগ্রামী শিখায় পরিণত হতে চলেছেন'।

কবির একশ-কুড়ি বছরের জন্মদিনের 'হাঁক-ডাকে' তিনি তাই বিশেষভাবেই বিচলিত।

একেবারে পুরানো দিনের কথা বাগচী মহাশয় জানবেন এমন আশা করি না। আর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ প্রচারের জন্য অতো সবের দরকারই বা কি ? যেমন ধরুন, ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে গঠিত **'League Against Fascism and War'** ও **'All India Civil Liberties Union'**—ঐ দুটি সংঘেই যে আরো অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে কমিউনিস্টরাও কবির সহযোগী ছিলেন অথবা ঐ বছরই মূলত কমিউনিস্ট উদ্যোগে লক্ষ্ণৌতে আয়োজিত প্রগতি লেখক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ যে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন, সে-সব 'তুচ্ছ খুঁটিনাটির' তিনি খবর রাখবেন—এমন আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায়। তেমনি অন্যায় আশা করা যে আরো পাঁচ বছর পর, সেই প্রথমবারকার ২২শে শ্রাবণে কবির দেহ সেনেট হলের সামনে রাখার সময়ে এবং পরে নিমতলার পৌঁছলে স্বতোতসারিত অগণিত পুষ্পার্ঘ্যের মধ্যে বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকেও দু'টি তরুণের সামান্য কিছু ফুল দিয়ে দ্রুতপদে সরে পড়ার কথা, আর পার্টির বে-আইনী ইংরেজী মুখপত্র, **'Communist'**-এ কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের খবর বাগচী মহাশয় জানবেন। আরো ছ'বছর পর ১৯৪৭ সালের ২৫শে বৈশাখে ডেকার্স লেনের কমিউনিস্ট পার্টি দপ্তরের ছাদে বেশ ঘরোয়া পরিবেশে যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদারের মতো পণ্ডিত রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ আলোচনা করেছিলেন আর সেখানেই সুচিত্রা মিত্রের (তখনো মুখোপাধ্যায়) কণ্ঠে প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে যে ধূর্জটিপ্রসাদ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন—'আনন্দবাজারে' কমিউনিস্ট-

বিশেষ প্রচারের জন্য তার খবর রাখারই বা প্রয়োজন কোথায় ?

কিন্তু মাত্র বিশ বছর আগে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে দেশব্যাপী উৎসব সমারোহের মধ্যেও এই কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে প্রধানত কমিউনিস্টদের উদ্যোগে যে দশদিন ধরে 'রবীন্দ্র শান্তিমেলা'র অনুষ্ঠান হয়েছিল সেখানে' তো বাগচী মহাশয়ের ভাষায় 'হাঁকডাক' আরো অনেক বেশী হয়েছিল। সে মেলায় সমাবেশ হয়েছিল শুধু এ রাজ্যের নয়, ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যের এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান, জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং কিউবার বহু বিশিষ্ট লেখক ও শিল্পীর। উদ্যোক্তারা সে উপলক্ষে **'In Homage to Tagore'** এবং **'Tagore and Man'** নামে যে দুটি প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছিলেন তার প্রথমটিতে কবি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী জে. ডি. বার্নাল নোবেল পুরস্কারজয়ী আইসল্যাণ্ডের লেখক হ্যালডর ল্যাক্সনেস, জার্মানি ও চেকোশ্লোভাকিয়ার দুই ভারততাত্ত্বিক, ওয়াল্টার রুবেন্স ও দুশান জাভিটেল, আমেরিকার সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ নিগ্রো ইতিহাসবিদ ও নেতা, ড. দুবোয়া, চীনের বিখ্যাত নট ও অপেরা পরিচালক, মেই লান-ফেঙ, বিখ্যাত ফরাসী এবং বিশ্ব নারী সম্মেলনের সভানেত্রী, মাদাম কতঁ, সুপরিচিত ক্যান্টার-বারির ডীন, ড. হিউলেট জনসন প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীরা আর দ্বিতীয়টিতে সংকলিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু মানবপ্রেমের বাণী। মেলায় যে-সব বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ অনুষ্ঠানে বা আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং জে বি এস হলডেনের মতো বিজ্ঞানী, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ এবং গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ ও খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞ; সোভিয়েত সুরকার বালাশানিয়ান এবং কিউবার প্রাইমা ব্যালেরিনা, এলিসিয়া এলোঞ্জোর মতো শিল্পী, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মত মনীষী; বাংলা সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার জন্য এ-দেশের পুরস্কার বিজয়ী, ভেরা নোভিকোভা ও দুশান জাভিটেল আর মেলার উদ্বোধন করেছিলেন কবিকন্যা, মীরা দেবী। এ কথাও মনে পড়ে যায় যে কবির ঐ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষেই 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সী' সেদিন গোপাল হালদারের সম্পাদনায় যে প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশ করেছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, চিত্রকল্প ও প্রতীক, ছোট গল্প, ছবি ও নাটক সম্পর্কে লিখেছিলেন যথাক্রমে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,

বিষ্ণু দে এবং হিরণ কুমার সান্যাল আর 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ', রবীন্দ্রনাথের 'স্বাদেশিকতা', 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' এবং রবীন্দ্রনাথের 'আন্তর্জাতিক চিন্তা' বিষয়ে লিখেছিলেন যথাক্রমে সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এবং চিন্মোহন সেহানবীশ। আর এতে রবীন্দ্রনাথের যে প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছিল সেটি শিল্পাচার্য যামিনী রায়ের আঁকা।

মনে হতে পারে বাগচী মহাশয় ঐ মেলার কথা যে ভুলে গেছেন তার কারণ বুঝি এ দুয়ের একটি ঃ

১। ১৯৬১ সালে তিনি জন্মাননি বা নেহাৎ নাবালক ছিলেন অথবা

২। তিনি সম্ভবত এখনকার মতোই তখনো শুধু 'আনন্দবাজারের'ই পাঠক ছিলেন। কারণ এ-রাজ্যের প্রত্যেকটি বাংলা ও ইংরাজী দৈনিকপত্র প্রতিদিন সবিস্তারে মেলার বিবরণ প্রকাশ করলেও 'আনন্দবাজার' সেদিন আমাদের 'বয়কট' করেছিল। তার সেদিনকার আচরণ হয়েছিল সেই অতি বাস্তববাদী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটির মতো যিনি কখনো আগে জিরাফ দেখেন নি এবং প্রথমবার জিরাফ দেখে যিনি চোখ কচলিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'না-না এ হতেই পাবে না, এমন প্রাণীব অস্তিত্বই অসম্ভব'!

কিন্তু বাগচী মহাশয় যে বয়সে নেহাৎই অর্বাচীন তাই বা বলি কি করে? কারণ বেশ মাতব্বরী চালে তিনি লিখেছেন ঃ 'অনেকেরই মনে থাকার কথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কসবাদী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় একটি বই বের করেছিলেন যার নাম 'টেগোর টুডে'—যতটুকু রবীন্দ্রচর্চাই যথেষ্ট।' আমার মতো অনেকেরই কিন্তু মনে আছে সেই ছোট বইটির লেখাগুলি সংকলন করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ন'ন, হিরণকুমার সান্যাল মহাশয়। আর হীরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে একটি বই লিখেছিলেন, ১৯৬২ সালে—তার নাম **'Himself a True Poem'**। আমার বয়স ৬৮ চলছে। অথচ দেখছি বইটি সত্যই কে সংকলন করেছেন, এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও হিবণকুমার সান্যাল যে এক ব্যক্তি ন'ন—এসব তুচ্ছ কথা বাগচী মহাশয়ের স্মৃতিতে শুধু আবছা নয়, বেমালুম লুপ্ত হয়ে গেছে। তাহলে কি তাঁর বয়স ৮০ কোঠায়?

তবে তাঁর বয়স ২০ ই হোক বা ৮০ ই হোক, তাঁর বক্তব্য **Puerile**ই হোক বা **Senile**ই হোক—আসলে বাগচী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের প্রতি কমিউনিস্টদের মনোভাবের অতীতকালের সর্বজনবিদিত দৃষ্টান্তগুলির খোঁজ করেন নি—

এবারেই প্রথম কমিউনিস্টদের তরফ থেকে কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের 'হাঁকডাক শোনা' যাচ্ছে—তাঁর এই একান্ত ভ্রান্ত মত প্রমাণের তাগিদেই।

আমি এ কথা জোর করেই বলছি ১৯৪৯/৫০ এই দু বছরে কমিউনিস্ট শিবিরে রবীন্দ্র সাহিত্য মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিতর্ক-ধারা যে বিসদৃশ রূপ ধারণ করেছিল—সেকথা মনে রেখেই। রবীন্দ্রসাহিত্য ও চিন্তাধারার মূল্যায়ন কমিউনিস্টরা ১৯৪৯-'৫০-এর আগেও করেছেন, পরেও করেছেন, এখনো করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। তবে তাতে শ্রদ্ধার অভাব ঘটে নি এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে না। ঐ দু বছরের ঘটনা তাই কবির প্রতি কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির দৃষ্টান্ত নয়, তার ব্যতিক্রমমাত্র। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে সেদিন কমরেড ভবানী সেনের মতো বড়ো মাপের নেতা ঐ বিতর্কে ভ্রান্ত মতের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও সেদিনও ঐ মত কমিউনিস্ট শিবিরে সর্ববাদীসম্মত হয়নি, আর অচিরে তিনি নিজেও সে মত বর্জন করেছিলেন পুরোপুরি। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তাঁর মতামতের বিবর্তন বিষয়ে যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁরা কমরেড ভবানী সেনের 'রচনা সংগ্রহে'র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত চারটি প্রবন্ধ—'রবীন্দ্রনাথের শেষ অধ্যায়,' 'একটি মনস্বী ও একটি শতাব্দী,' 'রবীন্দ্রনাথের একটি অমর অবদান' এবং 'রবীন্দ্র মানসের দু'একটি বৈশিষ্ট্য'—এই চারটি প্রবন্ধ পড়ে দেখতে পারেন, বিশেষ করে দ্বিতীয়টি।

বাগচী মহাশয় তাঁর প্রবন্ধ শুরু করেছিলেন একটি শ্লেষাত্মক প্রশ্ন দিয়ে—'রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিই জাতে উঠলেন'? জবাবে বলব 'না, তিনি ওঠেননি, 'সম্মানের চিরনির্বাসনে, সমাজের উচ্চ মঞ্চ' থেকে নেমে আসছেন, তাঁর 'ব্রাত্য' আর 'অন্ত্যজে'র দিকে—'সমস্তের ঘোলা গঙ্গাজলে' অবগাহনের জন্য।

আর সে জন্যই, বাগচী মহাশয় তো শিখণ্ডীমাত্র, আনন্দবাজারের কর্তাদের এতো আক্রোশ।

('কালান্তর', মে ২০, ১৯৮১)

রাজনৈতিক সংস্কৃতি

কিছুদিন থেকে লোকের মুখে মুখে, কাগজে-পত্রে একটা কথা চালু হয়েছে—'পলিটিকাল কালচার', অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা যে ভাষা, যে আচরণ, করি তার দ্বারাই আমাদের পলিটিকাল কালচার ধরা পড়ে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে স্বাধীনতার আগে পলিটিকাল কালচার কি ছিল, এবং পরেই বা কি হয়েছে ?

গোড়াতেই বলে রাখি, যাঁরা আমার মতো বয়স্ক লোক, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা মনে করেন, সবই আগে ভালো ছিল, পরে সবই খারাপ হচ্ছে—যুগটাই খারাপের দিকে এগোচ্ছে। তবে তারাও বলবেন, স্বধীনতার ব্যাপারটা আলাদা। স্বাধীনতা আগে ছিল না, পরে হয়েছে। সেটা ভালো। কিন্তু এছাড়া সবদিক থেকেই আমরা গোল্লায় যাচ্ছি, এ ব্যাপারে তাঁরা খুব নিশ্চিত।

এটাতে আমার মন কোনো দিনই সায় দেয় না। একটা গেলাসে যদি অর্ধেক জল থাকে, তা-হলে একদল মানুষ বলবে আধ গেলাস তো খালি। আর এক দল বলবে, তবু আধ গেলাস তো ভর্তি। অথচ সত্যটা তা একই। 'দি গ্লাস ইজ হাফ এম্পটি' মানেই 'গ্লাস ইজ হাফ ফুল'। এখন কেউ এই 'এম্পটিনেসে'র ওপর জোর দেবে, কেউ এর 'ফুলনেসে'র ওপর। এটা টেম্পারমেন্টের কথা।

হয়ত টেম্পারমেন্টালিই আমার ফুলনেসের দিকে ঝোঁক। আমার স্থির প্রত্যয় মানবজাতি এগোচ্ছে, প্রগতি হচ্ছে। তবে সোজা, সরলরেখা ধরে নয়—সেটাতে ঘুরপথ আছে। আগুপিছু আছে। কিন্তু আগুপিছু, ঘুরপথ সত্ত্বেও আমরা এগোচ্ছি, হয়তো এটা বিশ্বাসের কথা। তবে শুধু কি বিশ্বাসই ?

১৯১৩ সালে জন্মেছি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা। জীবনের প্রায় ৩৪ বছর কেটেছে পরাধীনতার ভেতরে। আমার বয়েস এখন ৭২। তাই ৪০ বছর ধরে স্বাধীনতাও দেখছি।

এই যে আমার বিশ্বাসের কথা—'এগোচ্ছে, প্রগতি ঘটছে, প্রগতি সম্ভব' সে কথা বাদ দিয়েও খানিকটা অবজেকটিভ দিক থেকে ব্যাপারটা বিচার করা যেতে পারে। একটা কথা মনে হয় যে স্বাধীনতার আগে যে সময়টা কেটেছে, তার পলিটিকাল কালচারের একটা সুবিধে ছিল। সেটা হলো বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সুবিধে। বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে আমরা 'সবাই এক হয়ে লড়াই করেছি। সেটা আমাদের সামনে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য রেখেছিল। সেই লক্ষ্য সিদ্ধির পথে আমরা লড়াই করেছি। তাতে দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনা অনেক ছিল, অনেক কষ্ট করেছে দেশের মানুষ। কিন্তু তারা কি করতে চায়, এ ব্যাপারে তাদের মনে কোনো সংশয় ছিল না। সেই একাগ্রতাই আমাদের পলিটিকাল কালচারকেও একটা স্থিরতা দিয়েছিল। তবু সে সময়ও একটা কথা আমাদের মধ্যে মহাজনব্যক্তিরা বারবার বলেছেন। আবার বলি রবীন্দ্রনাথের কথাই। তিনি বলেছিলেন, শুধু ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষই, যদি আমাদের সকলকে, ভারতবাসীকে মিলিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে যখন ইংরেজ থাকবে না, তখন আমাদের কে মেলাবে?

নিজেই সে প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন. ইংরেজ চলে যাবার পর যদি আমরা মেলাবার কোনো সার্থক বিকল্পের সন্ধান না পাই, তাহলে কিন্তু আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে হানাহানি করব। বিশেষ করে তিনি এটা বলেছিলেন হিন্দু মুসলমান, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের মধ্যে ভেদাভেদের, কনটেক্সটে। কাজেই এসব ভেবে বলেছিলেন, এখন থেকেই আমাদের দেশের মধ্যে এমন একটা মিলনসূত্র গড়ে তুলতে হবে যা শুধু বিদেশী শাসনের প্রতি আমাদের বিদ্বেষের ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠবে না। একটা সদর্থক, দেশব্যাপী কল্যাণের পথেরও আমরা খোঁজ পাবো, সেটাই হবে আমাদের প্রকৃত মিলনসূত্র।

দুঃখের বিষয় ঐ মহাজনের কথাতে আমরা খুব যে কর্ণপাত করেছি তা নয়। বিদেশী শাসকের হাতে লাঞ্ছনা, কষ্ট-দুঃখ ভোগ করেছি, তার মধ্যে দিয়েও মারধোর খেয়ে আমরা এগিয়েছি। তখন মাথায় দু'টো লাঠি পড়লে কি এসে যায়। ফাঁসিতে যে উঠেছে, সেও হাসতে হাসতেই উঠছে। কিন্তু ঐক্যসূত্রের সন্ধান না মেলায় শেষ পর্বে হলো কি দেশের লোকের হাতেই দেশের লোক মরতে লাগল। বেশ ব্যাপকভাবেই।

মনে আছে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট থেকে কলকাতায় যে দাঙ্গা শুরু হল তা'তে সাত হাজার লোক এক সপ্তাহের মধ্যে মারা পড়ল হানাহানি করে। বিজ্ঞব্যক্তিরা

বলবেন তার পেছনেও তো ইংরেজ। কিন্তু ওরা আমাদের লড়িয়ে দিচ্ছে বলেই আমরা লড়ে যাচ্ছি, কেন এমন হবে? সে তো আমাদেরই পাপ এবং আমাদেরই লজ্জা। এর ঊর্ধ্বে যে উঠতে পারলাম না, তার কারণ সেই যে মিলনসূত্র গড়া যে কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তা আমরা খুঁজে পাইনি।

তাই ঐ পর্বের শেষ দিকে, এবং নতুন পর্বের উপান্তে যখন আমরা পৌঁছেছি তখন ঐ সব কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটতে পেরেছে। আমাদের দেশে উদ্যমকে বহুলাংশে তেতো করে দিয়েছিল ঐ শেষের ব্যাপারটা।

১৯৪৭-'৮৫ সাল, এদিকেও তো প্রায় চল্লিশ বছর হতে চলল। এই সময়টুকুতে যা ঘটেছে, তা সংক্ষেপে বলা কঠিন। নানারকম জিনিস একই সঙ্গে ঘটেছে—ভালো এবং মন্দ। অনেক ভালো কাজ, অনেক নতুন জিনিস হচ্ছে, কিন্তু তা সব নয়। তার মধ্যে বিড়ম্বনা ঘটাচ্ছে বহু ধরনের জটিলতা বহু ধরনের অন্তর্বিরোধ। তারই ফলে বিসদৃশ ব্যাপারও ঘটছে বিস্তর। আর তারই সঙ্গে আগের থেকে পলিটিকাল কালচারের ক্ষেত্রেও অনেক তফাত ঘটে যাচ্ছে। আগেয় মতো ব্যাপারটা অতো সহজ সরল নেই। অনেক বেশি কঠিন, জটিল হয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকারের প্রসার নিশ্চয়ই ঘটেছে। তবে সহজ পথে নয়—অনেক সময়েই তার জন্যও রক্তপাত, অশ্রুপাতের প্রয়োজন পড়ছে।

আমাদের এই যে বহুজাতিক, বহুভাষিক, বহুআয়তনিক দেশে, মিলন সূত্র খুঁজে বের করার জন্যে আমাদের এই যে কঠিন সময়ের মধ্যে চেষ্টা করতে হচ্ছে, সংকট তারই দরুন চারিদিকেই যেন ফেটে পড়ছে। আমরা তারই সামাল দেবার চেষ্টা করছি। অথচ কতকগুলো জটিলতা ঘটার কারণ ছিল না। যখন আমরা লড়াই করছিলাম ইংরেজের বিরুদ্ধে তখন তো আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধী 'লিঙ্গুইস্টিক স্টেটে'র কথা বলেছিলেন। এবং তিনি কংগ্রেস কমিটিগুলি ভাগ করেছিলেন ভাষা-ভিত্তিক মাপকাঠিতে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, প্রধানত ভাষাগত ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে যে একটা বৃহৎ অঞ্চলের লোক বসবাস করে, আমরা যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাঁচতে চাই, তাহলে সেই ভাষাতেই কথাবার্তা বলতে হবে, কাজ চালাতে হবে।

গান্ধিজীই চালু করেন, কংগ্রেসের কাজকর্ম, বক্তৃতা, এমনকি চিঠিপত্রও যে যার নিজের ভাষায় লিখবে, করবে। স্বাধীনতার পর যাঁরা শাসনকর্তা হয়ে এলেন তাঁরা সবাই গান্ধিজীর অনুগামী। কিন্তু একটা লিঙ্গুইস্টিক স্টেটও

বিনা অশ্রুপাতে রক্তপাতে হয় নি, এটা খুবই দুঃখের কথা। কেরল হল, গুজরাট হল, মহারাষ্ট্র হল, সব কটার জন্যে আন্দোলন হয়েছে। এমনকি প্রস্তাব এসেছিল, বাংলা-বিহার মার্জারের মতো উদ্ভট ব্যাপারেরও।

সেই সময়ে আমাদের সংস্কৃতি জগতের একজন মস্ত বড় নেতা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হঠাৎ এই বাংলা-বিহার মার্জারের ব্যাপারটাকে সমর্থন করে বসলেন। সরাসরি সমর্থন করা খুব কঠিন ছিল। তাই বললেন এই মার্জারের ফলে অন্য দিকে কি হবে বলতে পারছি না, কিন্তু সংস্কৃতির কোনো ক্ষতি হবে না।

আমরা তো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে তখন আরও একজন মস্ত সংস্কৃতিবান নায়ক ছিলেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত। সেদিন দেশপ্রিয় পার্কের মিটিঙে অতুলচন্দ্র গুপ্ত বললেন, 'আজকের সকালে কাগজে দেখলাম আমাদের সংস্কৃতির জগতের এক মস্ত বড় নেতার কথা। একটা লোককে চেয়ারে দাঁড় করিয়ে তার গলায় দড়ি বেঁধে যদি সিংলিংয়ে টান টান করে বেঁধে দি, আর তারপরে যদি বলি তার পায়ের তলা থেকে চেয়ারটা সরিয়ে নিতে—তাহলে আর কি হবে আমি বলতে পারি না, কিন্তু তার বাঁকা টেড়িটি ভাঙবে না। একথা যে বলে, তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে কি আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি? সে মিটিংয়ে আমরা বিশ হাজার লোক ছিলাম। সবাই হাসছিলাম। তিনি কিন্তু হাসলেন না। অসম্ভব রাশভারী লোক ছিলেন। হাসি থামলে বললেন, আসুন এবার দেখি এবারে বাঁকা টেড়িটি ভাঙবে কি না? তারপরে তিনি প্রমাণ করলেন বাঁকা টেড়িটিও ভাঙবে, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক জগতে ক্ষতি হবে।

এই যে অস্পৃশ্যতা বা নানান সমস্যার মোকাবিলায় খুব ভালো আইন হয়েছে। মেয়েদের আইনও শুনেছি অনেকক্ষেত্রে খুব এ্যাডভান্সড। শুধু ডিভোর্সের ব্যাপারেই নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসী মেয়েরা ভোটাধিকার পেয়েছে। সে জায়গায় আমরা বরঞ্চ সে দিক থেকে কিছুটা সহজেই বেশ কিছু অধিকার পেয়েছি, কিন্তু আইন করলেই ব্যাপারটা হয় না। কাগজে কদিন অন্তর অন্তর তো নিয়মিত খবর—গৃহবধূ পোড়ানো বা হরিজন পোড়ানোর। হরিজন তো শুধু হরিজন নয়, হরিজন তো সমাজে সামাজিক এবং আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে দুর্গত মানুষ। কাজেই শ্রেণী, বা শ্রেণীসংগ্রামের কথাও এর সঙ্গে জড়িয়ে যায়। চোখের সামনে এসব ঘটছে,

এর সঙ্গে জন্ম নিচ্ছে অনেক জটিলতা।

এই যে মিলনসূত্রের কথা বলতে চেয়েছি, তার জন্যে একটা বড় প্ল্যাটফর্ম দরকার। যা ডেমোক্রেটিক, তা নিশ্চয়ই, এখন তো শুধু ডেমোক্রেসি নয়, আমরা অনেকেই সোসালিজমের কথাও বলছি। কিন্তু ডেমোক্রেসি, বা সোসালিজমকে তো সুনির্দিষ্ট করা দরকার। বি. জে. পি'ও তো গান্ধিয়ান সোসালিজমের কথা বলে। আর গৃহবধূ ও হরিজন পুড়িয়ে তো ডেমোক্রেসী হয় না। কাজেই সুনির্দিষ্ট ডেমোক্রেসি ও সোসালিজমের ধারণার উপরে রচনা করতে হবে ব্যাপকতম ফ্রন্ট।

স্বাধীনতার আগে একটি সুস্পষ্ট পরিস্থিতি ছিল। ওরা আর আমরা। ওরা বলতে বিদেশী শাসক, আমরা বলতে ভারতবাসী। ওদের অনুচররাও অবশ্য ছিল, তাদের বিরুদ্ধেও লড়ে যেতে হয়েছে।

ওরা চলে গেল। এখন যারা রয়েছে, তাদের মধ্যে লড়াই যে কার বিরুদ্ধে এটা সুনির্দিষ্ট করা দরকার।

অনেকেই বলেন তরুণদের ওপর জোর দিন। অনেকেই বলেন, আগেকার দিনে আমরা কি ছিলাম, আমরা সবাই ভীষণ রকম দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলাম। দেশাত্মবোধক গান গাইতাম, আর ফাঁসি যেতাম। আর এখনকার ছেলেদের মানবিক মূল্যবোধের কি অবক্ষয়।

আমি এ-ধরনের একপেশে কথা স্বীকার করি না। আমার চোখের সামনে দেখেছি সারা ভারতবর্ষে দশ বারো বছর আগে বেশ কয়েক হাজার তরুণ কিসের টানে চরম আত্মদান করলেন। তাদের পথটা ভ্রান্ত ছিল। কিন্তু আত্মদান তো ফেলবার জিনিস নয়।

আমাদের মতো মহাজাতি একটাই আছে, তা হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। এদের মধ্যে ঐক্য সম্ভব হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে। এত বিস্তীর্ণ অঞ্চল আর তার মধ্যে এতো ভাষা, এতো জাতি এমন আর কোনো দেশে নেই। এই যে সেদিন একজন কংগ্রেসী এম-পিকে হত্যা করা হল, কিছুদিন আগে দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর দেহরক্ষীর হাতে নিহত হলেন, এসব তো আপনা আপনি ঘটেনি। ট্রিগার টিপছে আমার দেশের মানুষ। কিন্তু তার যোগান দিচ্ছে কারা তা বোঝাই যাচ্ছে।

বিহারে হরিজন পোড়ানোর জন্যে জমিদাররা 'ভূমিসেনা' তৈরি করেছে। ফ্যাসিস্ট ব্রিগেডের মতো এরা হরিজনদের পোড়ায়, গুলি করে মারে। এই যে

অশুভ শক্তি—দেশের ভেতরে ফিউডাল শক্তি এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আর তাদেরই দেশী সাঙাৎ, একচেটিয়া পুঁজিপতির দল, এদের বিরুদ্ধে যে ব্যূহ রচনা করতে হবে তার ভিত্তি শুধু ডেমোক্রেটিক নয়, তাতে সোসালিজমের মূল্যবোধেরও স্বীকৃতি থাকবে ঢালাওভাবে।

আমি যে পরিবারে জন্মেছি তারা ব্রাহ্ম। কিংবদন্তী আছে এঁদের কথাবার্তা খুব মোলায়েম আর তাঁরা খুব স্পর্শকাতর। কিন্তু পুরানো ভারসাম্যের স্থানেও নতুন ভারসাম্য গড়ে ওঠে নি এসব সমাজে—পলিটিকাল কালচারের ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেবেই, তাতে ভয় পেলে বা স্পর্শকাতর হলে চলবে না। আবার পুরানো ভারসাম্যে ফেরার কথাও ভাবতে পারি না। এরই মধ্যে দিয়ে ইতিহাস এগিয়ে যাবে। বিদেশী শাসন নেই কিন্তু যে পলিটিকাল কালচার চাই তা তো আকাশ থেকে পড়বে না। ব্যাপকতম গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্ট রচনার পাশাপাশি সচেতনভাবে তৈরি করতে হবে নতুন পলিটিকাল কালচার। তার উপাদান এখনকার সমাজের মধ্যেই যোগাড় করতে হবে।

আমাদের গ্রামের কৃষকের একটা সাধারণ সৌজন্যবোধ আছে। শ্রমিকের মধ্যেও আছে। আদিবাসীদের মধ্যে তো আছেই। অনেক সময়ে তাদের মধ্যে কালচার বিষিয়ে ওঠার কারণ সমাজের উচ্চবর্গের, বিশেষ করে শিক্ষিত মানুষের স্বার্থবুদ্ধি ও অনাচার। তাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। সংঘাত বাড়ছে। এতে ঘাবড়ালে চলবে না। তাই যে সব অনাচার আজ ঘটছে, তাতে পীড়িতবোধ করলেও আমার মনে হয় তা উৎক্রান্তিরই লক্ষণ। অর্থাৎ একটা ভারসাম্য হারিয়ে আমরা অন্য ভারসাম্যের সন্ধানে যাচ্ছি। এই প্রক্রিয়াই প্রতিফলিত হচ্ছে এই উৎক্রান্তির লক্ষণগুলিতে।

দেশের বর্তমান অবস্থায় আমি নিশ্চয়ই বিচলিত। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, দেশের বহু জটিল সমস্যার সার্থক সমাধান করবে এ দেশেরই মানুষ—বাইরের কোনো শক্তি বা দেশের কোনো 'মহাপুরুষ' নয়।

('প্রতিক্ষণ', ১৭ই আগস্ট,—১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫)

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি প্রসঙ্গে

স্বাধীন ভারতবর্ষে সংস্কৃতি জগতে কি ঘঠছে তার প্রসঙ্গে আমি যদি ‘অগ্রগতি’র পরিবর্তে ‘বিকাশ’ শব্দটি ব্যবহার করি তবে তা এ-ক্ষেত্রে কোনো উন্নতিকে অস্বীকার করার জন্য নয়। কারণ সেটা হবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনস্বীকার্য শক্তিকেই খাটো করারই সামিল।

তবুও এ-ক্ষেত্রে, আমি ‘অগ্রগতি’র বদলে ‘বিকাশ’ শব্দটি প্রয়োগ করছি শুধু এ কারণেই যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিশ্চিতভাবেই প্রবল শক্তিশালী হলে এ’ও অস্বীকার করার জো নেই যে তার বেশ কতগুলি গুরুতর সীমাবদ্ধতাও ছিল। স্বাধীনতার চার দশক পরেও চারিদিকে তাকালেই আমরা বেশ টের পাই যে যথাসময়ে সেই সীমাবদ্ধতাগুলি কাটিয়ে উঠতে না পারার দরুন আজো আমাদের তার খেসারত দিতে হচ্ছে পুরোদস্তুর।

আমাদের সব অগ্রগতিকে বিড়ম্বিত করছে যে মৌল সীমাবদ্ধতা তার কথা রবীন্দ্রনাথ একদা উল্লেখ এইভাবে করেছিলেন তাঁর রাশিয়ার চিঠিতেই :-

> চিরকালই মানুষের সভ্যতায় এক দল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন ; তাদের মানুষ হবার সময় নেই ; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত।...তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায় তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আর রবীন্দ্রনাথ সেখানে লক্ষ্য করেছিলেন যে ‘রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে’। ভারতবর্ষ আজও সেখানে হাবুডুবু খাচ্ছে মিশ্র অর্থনীতির চোরাবালিতে।

শুধু তাই নয়—হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি গুরুতর সমস্যা প্রসঙ্গে ১৯২১ সালে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে চরখা নিয়ে বিতর্ককালে এক মস্ত গোড়ায় গলদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন :—

'...দেশকে যদি স্বরাজসাধনায় সত্যভাবে দীক্ষিত করতে চাই তা হলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্তি প্রত্যক্ষ গোচর করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অল্পকালেই সেই মূর্তির আয়তন যে খুব বড়ো হবে, এ কথা বলি নে; কিন্তু তা সম্পূর্ণ হবে, সত্য হবে, এ দাবি করা চাই। প্রাণবিশিষ্ট জিনিসের পরিণতি প্রথম থেকেই সমগ্রতার পথ ধরে চলে। তা যদি না হত তাহলে শিশু প্রথমে পায়ের বুড়ো আঙুল হয়ে জন্মাত; তারপর ধীরে ধীরে হত হাঁটু পর্যন্ত পা; তারপর ১৫/২০ বছরে সমগ্র মানব দেহটা দেখা দিত। শিশুর মধ্যে সমগ্রতার আদর্শ প্রথম থেকেই আছে তাই আমরা এত আনন্দ পাই'। ('স্বরাজসাধন')

স্বরাজের সমগ্র মূর্তি স্পষ্ট না থাকার, ঐ দ্বিতীয় মৌলিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য স্বাধীনতা অর্জনের কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা এক পরিকল্পনা অনুসারে দেশের উন্নয়নের পথ ধরি। তার পরিকল্পনা ব্যাপারটা স্বতঃই সামগ্রিক, আংশিক পরিকল্পনা আসলে পরিকল্পনাই নয়। আমরা যখন ভারী শিল্প গড়ে তোলার ভিত্তির উপরে আমাদের অর্থনীতির দ্রুত সিদ্ধান্ত করলাম তখন তার লক্ষ স্থির হয়েছিল আমাদের কোটি কোটি দেশবাসীর খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় এবং জীবনের অত্যাবশ্যক অন্যান্য উপাদানের যোগানের যাতে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি মেলে। আর তারই সঙ্গে কথা ছিল আমাদের জীবনযাপনের মান উন্নয়নেরও। প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা ড. গঙ্গাধর অধিকারী এ প্রসঙ্গে চমৎকার ছড়া কেটেছিলেন ঃ-

রোটি, কাপড়া ঔর মোকান
তন কি স্বাস্থ্য, মন কি শিক্ষা, ঔর বিজ্ঞান
ইস কা হকদার সারে ইনসান।

এমন ধরনের পরিপ্রেক্ষিত স্বতঃই দাবি করে বৈষয়িক অগ্রগতির পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের দ্রুত উন্নয়ন—নইলে বৈষয়িক উন্নয়নও বিড়ম্বিত হবে পদে পদে।

এইখানে আমাদের আবার মুখোমুখি হতে হয় তৃতীয় এক মৌলিক সীমাবদ্ধতার। পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার উপযোগী আমাদের দেশে এখনও কোন সুস্পষ্ট জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি—যা চলছে তা হল বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত খামখেয়ালী নানা প্রচেষ্টা। অথচ ১৯৭২ সালের জুন মাসেই (৩রা-১১ই) সিমলার 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এডভান্সড স্টাডিজে' ন' দিনব্যাপী এক সেমিনারে (যাতে প্রতিনিধিস্থানীয় বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী

যোগ দিয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে কিছু কিছু মার্কসবাদীও ছিলেন) পর একটি সর্বসম্মত বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে তেমন এক সাংস্কৃতিক নীতির লক্ষ্য হবে 'জনগণের গণতান্ত্রিক উদ্যোগের ধারাকে মুক্ত করা। তার প্রয়াস হবে স্বনির্ভরতা, সমতা, জাতীয় সংস্কৃতি আর আমাদের ঐতিহ্য এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগুলির জীবন্ত উপাদানগুলির সুসমন্বয়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মানবতাবাদের পরিপোষণ (It should aim at promoting self reliance, egalitarianism, national integration and humanism based on a synthesis of vital elements of our tradition and of modern science and technology)। বৈষম্যধর্মী, উচ্চমাত্রার ভোগ্য-সম্বল এক সমাজকে আদর্শ হিসেবে আমরা বর্জন করি। আমাদের সঙ্গতি দিয়ে যথাসম্ভব গড়ে তোলা হবে সমতাধর্মী সামাজিক কৃত্যক ও জনকল্যাণের ব্যবস্থাদি। আমাদের সমাজে সাংস্কৃতিক সারবস্তু ও গুণগত মানোন্নয়নের সেটিই হবে প্রধান উপাদান'।

জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি আমরা গ্রহণ করি তা'হলে আমাদের অবিলম্বে এই ধরনের কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হতে হবে:

১। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে নিরক্ষরতা অপসারণ এবং জনশিক্ষার প্রসার,

২। সমাজব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তরের লক্ষ্যসাধনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক নতুন শিক্ষা নীতি প্রবর্ত্তন,

৩। আমাদের প্রত্যেকটি জাতি উপজাতির ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ সাধন,

৪। 'নতুন ভাবনা, নতুন মূল্যবোধ ও নতুন জগৎ' সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ সাধন,

৫। আর এই সব প্রচেষ্টায় আমাদের সমস্ত গণমাধ্যমগুলির পরিপূর্ণ প্রয়োগ।

[১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আগ্রায় অনুষ্ঠিত 'গণনাট্য সংঘে'র জাতীয় সম্মেলনে গঠিত]

রবীন্দ্রনাথ কি আজও প্রাসঙ্গিক

প্রশ্ন উঠেছে, রবীন্দ্রনাথ কি আজও প্রাসঙ্গিক? ভাবখানা এই যে, একদিন হয়তো ছিলেন কিন্তু আজও কি আছেন?

যিনি একাধারে কবি, সুরকার, কথা-সাহিত্যিক, নাট্যকার, অভিনেতা ও চিত্রকর আবার প্রবন্ধকার, শিক্ষাবিদ এবং সমাজকর্মীও, তাঁর প্রাসঙ্গিকতা আজও আদৌ আছে কিনা, থাকলে ঠিক কতটা—এর নিখুঁত হিসেব হবে কোন্ মাপকাঠিতে? আর একই মাপকাঠিতে কি প্রাসঙ্গিকতা স্থির হবে একদিকে তাঁর মূলত সৃজনকর্মের আর অন্য দিকে মননশীলতাই যে ক্ষেত্রে প্রধান, সেই প্রবন্ধ, চিঠিপত্র অথবা তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজকর্ম ও মতামতের? 'তপোভঙ্গ' কবিতা,—'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি' গান, আশ্চর্য রহস্যময়ী সব নারী-মুখের ছবি আর 'স্বদেশী সমাজের' ২২ দফা কর্মসূচী ও বড়লাটকে লেখা ১৯১৯ সালের সেই ঐতিহাসিক চিঠির প্রাসঙ্গিকতা কি একই মানদণ্ডে বিচার্য ?

ইংরেজ কবি লিখেছিলেন সুন্দরের আনন্দ না কি নিত্যকালের। নিত্যকাল কি জানি না, আমরা নেহাতই খণ্ডকালের জীব। তবু তার চৌহদ্দির ভিতরের বাসিন্দা হিসেবেই বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের অজস্র গান, কবিতা, ছোট গল্প ও ছবির, বেশ কিছু উপন্যাস ও নাটকের আর তার অভিনয় ও প্রযোজনার প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের স্মৃতির আনন্দ নিশ্চয়ই দীর্ঘায়ু। আমাদের দৈনন্দিন আটপৌরে সমস্যা সমাধানে এসব কতটা উপযোগী, তার কেজো হিসেবে নয় আমাদের জীবনের প্রসারে ও গভীরতা-সাধনে, সুখেদুঃখে, ভালোবাসায় আবার সংঘাতে, সংগ্রামে, জয়পরাজয়ে, জীবনের প্রতি সন্ধিক্ষণে এদের মূল্য অপরিমেয়। সে বিচারে এর প্রাসঙ্গিকতা শুধু যে আজো আছে তাই নয়, নিশ্চয়ই থাকবে যতদূর আমাদের দৃষ্টি যায় উত্তরকালের গভীরে যদি না এই উম্মাদ পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণ একদিন নিঃশেষ হয়ে যায় পারমাণবিক যুদ্ধের তাণ্ডবে।

আর রবীন্দ্রনাথ যেখানে মূলত সৌন্দর্যস্রষ্টা নন, প্রধানত মননশীল লেখক,

শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী সেখানে প্রাসঙ্গিকতা বিচারের আটপৌরে কেজো মাপকাঠি অবশ্যই প্রযোজ্য, শুধু মনে রাখতে হবে আজকের পৃথিবী রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র—সারা পৃথিবী জুড়ে আর ভারতবর্ষেও বিপুল ও মৌলিক সব পরিবর্তন ঘটে গেছে তাঁর মৃত্যুর পর। হিরোশিমা-নাগাসাকি বিস্ফোরণে সূচিত পারমাণবিক যুগের আবির্ভাব তিনি দেখে যাননি যার একদিকে বিপুল সম্ভাবনা আর অন্যদিকে সর্বধ্বংসী ভয়াবহতা। তিনি দেখে যাননি সেই পৃথিবী যেখানে শতাধিক নতুন, নতুন ছোট বড় দেশ দেখতে দেখতে মাত্র দু'তিন দশকের মধ্যে পেয়ে গেল রাজনৈতিক স্বাধীনতার আস্বাদ। তিনি দেখে যাননি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন আর তারই সঙ্গে তার দ্বিখণ্ডীকরণ ও পরে ত্রিখণ্ডীকরণ। সে স্বাধীনতা লাভের আগে তাঁকে দেখতে হয়নি এই বাংলায় পঞ্চাশের মন্বান্তরে ৩৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু অথবা 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' আর পরের পর নোয়াখালি, বিহার, গড়মুক্তেশ্বর, দিল্লী, পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড, আর তারই সূত্রে দুই দেশের অন্তহীন উদ্বাস্তু মিছিল। এসব তাণ্ডবের মধ্যে দিয়ে যে বহুলাংশে নতুন পৃথিবী ও নতুন ভারতবর্ষ আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের নব নব জটিল ও কঠিন সব সমস্যা নিয়ে, তার সমাধান কি আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে আশা করব? এই মুহূর্তে পাঞ্জাব, আসামের জটিলতা বা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক অথবা দারিদ্র্যসীমার নিচে থেকে দ্রুত অধিকাংশ দেশবাসীকে তুলে আনার সমাধানসূত্র তাঁর কাছে খুঁজব? অবস্থা অনুযায়ী হয় ব্যবস্থা। তাই অবস্থান্তরের সঙ্গে ব্যবস্থান্তরও করতেই হবে, কিন্তু সে কাজ তো বর্তমান প্রজন্মের ভারতবাসীর। বহুলাংশে ভিন্নতর অবস্থায় বলা তাঁর কোন কোন নির্দিষ্ট বক্তব্য তাই কালাতিক্রান্ত তো হতেই পারে কালপ্রবাহে যেমন অনেক সময়ে ঘটেছিল তাঁর জীবদ্দশাতেই। মনে রাখতে হবে সে সব ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই তিনি তার পুরানো মতামতকে নির্দ্বিধায় বর্জন করে এগোতে কুণ্ঠিত হন নি নতুন পথের সন্ধানে।

তবু একটি কথা। ভারত-সমেত সমগ্র পৃথিবী আজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার জগতের তুলনায় বহুলাংশে নতুন, তবে সর্বাংশে নয়। এখনো অনেক দিক থেকে তা পুরানোরই জের টেনে চলেছে। তাই কোন কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য আজ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেও আবার অনেক মৌলিক ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য আজো আমাদের কাছে অম্লান। যেমন ধরা যেতে পারে যাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন 'সভ্যতার পিলসুজ' অথবা 'ক্ষুধাতুর

আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাত'—সে সমস্যার কি আজও নিরাকরণ হয়েছে সারা পৃথিবীতে অথচ সেটাই তো তাঁর মতে এ যুগের সব চাইতে 'বড় খবর'। তেমনি যুদ্ধ শান্তি, শোষণব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজমের অবিশ্রাম যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নিরস্ত্রীকরণের আন্তরিক প্রয়াস, সবল-দুর্বল জাতিদের সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক জটিলতা, জাতি অভিমান ও বর্ণবিদ্বেষ, জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বরূপ, ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ঐক্যসাধনা, হিন্দু মুসলমান, জাতপাত, পতিত দলিত, ধর্মমোহ, যুক্তিহীন সামাজিক আচার পালন, 'কর্তার ভূতের' ভয়, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলা, প্রকৃত জনশিক্ষা, সমবায় ও পল্লীসংস্কার, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন সংগঠন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের শিল্পায়ন এবং সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বহু মৌলিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সমাধানসূত্র নয়, তাঁর মৌল দৃষ্টিভঙ্গি আজও নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক।

আর সব থেকে প্রাসঙ্গিক দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় ইতিহাসের অগ্রগতির ছন্দের সঙ্গে তাঁর নিরন্তর পা-মেলানোর চেষ্টা আর তারই জন্য তাঁর ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করার অশ্রান্ত, অসমসাহসিক প্রয়াস।

('বেতার জগৎ', ১-১৫ মে, ১৯৮৫)

নওজোয়ানের কবি

বছরটা মনে নেই-১৯২৫-'২৬ সাল কি তারও কিছু পরে হবে—রাণীগঞ্জ শহরে একদিন বিষম সোরগোল পড়ে গেল। কি ব্যাপার ঠিক বোঝা গেল না, শুধু শুনলাম কলকাতা থেকে কে এক মস্ত লোক আসছেন। এতেও অবাক হবার কিছু পেলাম না আমরা। কারণ মফঃস্বলের কে না জানে যে, কলকাতা থেকে মস্ত লোকেরাই আসেন। তবু ইস্কুল থেকে আমরা হৈ হৈ করে বেরোলাম খানিকটা মজা দেখতে। সভা আরম্ভও হল—ঠিক আমরা যেমন ভেবেছিলাম তেমনিভাবে। "মিটিং, মিটিং" খেলার সময় বড়দের গম্ভীর মুখে যে-সব ভালো ভালো কথা বলতে হয়, তা ঠিকই বলা হল—বলার মাঝে মাঝে ও শেষে চটাপট হাততালিও দেওয়া গেল। সবই চলছিল ঠিক যেমনই ভেবেছিলাম, সে-রকম নিয়ম-মাফিকই। হঠাৎ মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের ডানদিক থেকে একটা লোক খামোখা ফস করে উঠে দাঁড়ালো। জোয়ান চেহারা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড় চুল, কালো রং, চোখে-মুখে প্রচণ্ড স্ফূর্তির জোয়ার। মুখে এক গণ্ডা পান ফেলে সে সমস্ত সভাকে চমকে দিয়ে শুরু করল কবিতা বলতে। গলা'তো নয় যেন সিংহ গর্জন। মোটেই মিহি বা মিষ্টি নয়, খানিকটা বরঞ্চ ভাঙা ভাঙাই। কিন্তু অদ্ভুত সুরেলা সে গলার জোর আমাদের চমকে দিল। আর সেই প্রচণ্ড গলার সঙ্গে কি আশ্চর্য্য মিল কবিতার ছন্দের! অভিভূত হয়ে শুনলাম—

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর॥
ঐ নতুনের কেতন ওড়ে, এল কালবোশেখীর ঝড়!

কথার সমস্ত মানে বুঝলাম না কিন্তু সে গলার আবৃত্তি শুনে বুকের রক্ত দুলে উঠল—স্পষ্ট বুঝলাম যে আমাদের যৌবনকে উদ্দেশ করে এই প্রশস্তি। বুকের ঢিপঢিপানি কমতে না কমতেই ফের আবার সেই গলা আমাদের দিকে ফিরে গর্জ্জে উঠল—

"আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল

মোদের পায়ের তলায় মূর্চ্ছে তুফান
উর্দ্ধে বিলীন ঝড় বাদল,
আমরা ছাত্রদল"।

আজো মনে পড়ে আমাদেরই নিয়ে এমন গান লেখা হয়েছে মনে করতে সে দিন কি রকম রোমাঞ্চ হয়েছিল সারা দেহে। তারপর চলল গান, গানের পর গান—"শিকল ভাঙার গান", "ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান।" হঠাৎ গান থামিয়ে সুরু হল আমাদের সঙ্গে গপ্প। চুলোয় গেল বড়দের কেতাদুরস্ত, মাপামাপা কথা, আদবকায়দা। গপ্প, গান, আড্ডা হৈ হৈ সব মিলিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই আসর জমে উঠল আমাদের নিয়ে। বড়রা, বিশেষ করে মাননীয় সভাপতি মশাই, পালাবার তাল খুঁজতে লাগলেন নিজেদের খানিকটা অবাস্তব বোধ করে। আমরা তখন আড্ডায় মশগুল।

শুনলাম, এঁর নাম নাকি নজরুল ইসলাম। চুল ঝাঁকিয়ে গপ্প শুরু করলেন "ছোটবেলায় ছিলাম এই শহরেই। পড়তাম শিয়ারসোল স্কুলে। তোমাদের মাষ্টার মশাই এঁরা শুনলে রাগ করবেন, তাই চুপিচুপি বলছি—মোটেই ভালো লাগতো না চারদেয়ালের মধ্যে পড়াশুনা করতে। তাই রোজই পালাতাম ইস্কুল—এধার ওধার ঘুরে অন্য ইস্কুল থেকে ডেকে নিতাম শৈলজাকে, (বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়) তারপর দু'জনে মিলে চলত কত গল্প, অফুরন্ত ঘুরে বেড়ানো, খুসীমত বই পড়া।"

তারপর কি হল আর বললেন না। শুধু আমাদের মনের কোণে নিত্যকালের যে হা'ঘরেটা আছে তা'কে জাগিয়ে তুলে আবার শুরু করলেন গান—

চল্ চল্ চল্!
চলরে নওজোয়ান,
শোনরে পাতিয়া কান—
মৃত্যু তোরণ দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।

বুঝলাম, এই আমাদের ক্ষ্যাপা কবি, ছোটদের কবি, ছাত্রদের কবি, নওজোয়ানের কবি।

ধীরে ধীরে নজরুল সম্পর্কে আরো অনেক খবর পেলাম। ভালো ছেলে হওয়া তাঁর ধাতে ছিল না। ছোটবেলার ঘরছাড়া অস্থিরতা তাঁকে ঠেলে পাঠালো

বাইরে, যেখানে প্রশস্ততর-জীবন হাতছানি দিয়ে হাঘরেদেরই ডাকে। পড়াশুনা ছেড়ে তিনি বাঙালী পল্টনের হাবিলদার হিসাবে ইরাণ, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি নানা জায়গায় ঘুরলেন। তীব্রভাবে অনুভব করলেন সাম্রাজ্যবাদের পেষণ আর ইরাণ, তুর্কি, মিশরের নবজাগরণের উন্মাদনা। এই সময়েই তাঁর কবিতার উৎস খুলে গেল। তাই, হয়ত এশিয়ার প্রাথমিক প্রচণ্ডতা, অন্ধ আবেগ, দুর্বলতা সব কিছুই সহজভাবে ধরা ছিল তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে। "চিরঞ্জীব জগলুল" "কামাল পাশা" "চিত্তরঞ্জন" সবাই নবজাতীয়তার উদ্যোক্তা হিসাবে পেলেন তাঁর কবিতার অর্ঘ্য।

তারপর কিছুদিন চালালেন পত্রিকা—'লাঙল' আর 'ধূমকেতু'। লিখলেন "সাম্যবাদীর গান"—অনুবাদ করলেন বিখ্যাত "ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীত।" এ সবের ফলে কপালে জুটল রাজরোষ—কারাদণ্ড, তাঁর বই-এর উপর এল নিষেধাজ্ঞা। সাধারণ মানুষের ছোট খাটো ভয়, সংশয় তাঁকে স্পর্শ করত না এতটুকু। তাই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় তিনি দমলেন না—লিখলেন,

কে কাহারে মারে, ঘোচেনি ধন্দ,
টুটেনি অন্ধকার,
জানেনা আঁধারে শত্রু ভাবিয়া
আত্মীয়ে হানে মার।

উদিবে অরুণ ঘুচিবে ধন্দ,
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ,
হেরিয়ে মেরেছে আপনার ভায়ে
বন্ধ করিয়া দ্বার।

ভারত ভাগ্য করেছে আহত
ত্রিশূল ও তরবার!

আর পরম আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন—

যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ পড়ে
মন্দির চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে
শত্রু দুর্গ গুঁড়া!

নওজোয়ানের কবি ব্যাধিগ্রস্ত—সেই আশ্চর্য্য প্রাণোচ্ছল স্ফূর্তিভরা চোখ আজ রোগযন্ত্রনায় ম্লান। তবু তাঁর 'ভাঙার গান' 'অগ্নিবীণা' 'প্রলয়শিখা' সমস্ত ব্যাধি জরা অতিক্রম করে চিরদিনই বাঙলার নওজোয়ানকে দুঃসাহসী ব্রত গ্রহণে প্রবৃত্ত করবে, 'কারার লৌহকপাট ভাঙবার', 'ধূলায় তাজমহল গড়বার', প্রেরণা জোগাবে।

('ইত্তেহাদ')

প্রেমচন্দ প্রসঙ্গে

'...এ কথা কারো না জানার জো নেই যে—তাঁর ছিল মস্ত এক দিল্। কেউ তাঁর সাহায্য চেয়েছে, পায়নি—এমনটা হতেই পারে না। ......সাহিত্য-সেবা ছাড়া আর কিছুতে তাঁর আগ্রহ ছিল না আর তাতে মেলে না টাকা! তবে এ কথা ঠিক যে খ্যাতি তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর আত্মপ্রসাদের পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন না সঞ্চয়ে। আত্মমর্যাদা বজায় থাকে এমন জীবনই তিনি চাই-তেন, তার বেশী কিছু নয়। অবশ্য তাঁর অহংবোধ কিছুটা ছিল, চান তো গর্বও বলতে পারেন, সব সাহিত্যসেবীরই তা থাকে'।

প্রেমচন্দ তাঁর শেষ অসমাপ্ত উপন্যাস 'মঙ্গল সূত্রে'র নায়ক সম্পর্কে লিখেছেন এই কথা। আসলে কিন্তু এটা তাঁরই self-portrait। তিনি জীবন শুরু করেছিলেন দারিদ্র্যের মধ্যেই। যখন তাঁর হাত থেকে 'বড়ে ঘরে কি বেটি' বা 'নমক কা দারোগার' মতো গল্প বেরোচ্ছে তখনো দেখা যায় তিনি তাঁর এক বন্ধুকে লিখতে বাধ্য হচ্ছেন: 'যদি খুব অসুবিধে না হয় তা হলে তিন, চার টাকা দামের একটা ঘড়ি আর সাড়ে চার টাকার মধ্যে এক জোড়া জুতো পাঠাতে পারলে কৃতজ্ঞ থাকব। আমার নিজের জুতোজোড়া ছোটক নিয়ে গেছে, তাই আমার এখন খালি পা।'

এই দুরবস্থা থেকে মুক্তির সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। বোম্বাইয়ের ফিল্ম কোম্পানির ডাক এসেছিল, এখনকার মাপে না হলেও তখনকার দিনের মাপে বেশ মোটা টাকার বদলে বছরে কয়েকটা 'সিনারিও' লেখার। সাড়াও দিয়েছিলেন গোড়ায়। কিন্তু শেষ অবধি পোষালো না। স্থূলরুচিওয়ালা মালিকদের মন যুগিয়ে চলতে পারলেন না। ইস্তফা দিয়ে ফিরে গেলেন পুরানো জীবনে। তবে শেষ দিকে টাকা-পয়সার দিক থেকে কিছুটা স্বাচ্ছল্য বোধ হয় এসেছিল সংসারে। সেটা মাথা না নুইয়ে, নিছক কলমের জোরেই।

প্রেমচন্দের ছোট ছেলে অমৃত রাই তার বইয়ে প্রেমচন্দের নামকরণ করেছে 'কলম কা সিপাহী'। মনে পড়ে গেল আমাদের মানিকবাবুও একবার লেখকের নাম দিয়েছিলেন 'কলম-পেষা মজুর'। প্রথম কথাটায় জোর পড়েছে লেখকের

সংগ্রামী চরিত্রের দিকে আর দ্বিতীয়টায় শ্রেণী আনুগত্যের উপরে। তবে কথাটা যে এক্ষেত্রে মূলত একই তা প্রেমচন্দ ও মানিকবাবুর সাহিত্য ও জীবনের দিকে তাকালেই ধরা পড়ে। দু'জনেই সংগ্রামী আর দু'জনেই মেহনতী মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত—তবে পার্থক্য তাঁদের ভঙ্গীতে এবং কিছুটা নিশ্চয়ই শক্তিতেও।

শক্তির কথা থাক, তবে ভঙ্গীতে শুধু গরমিল নয়, আবার মিলও চোখে পড়ে। প্রেমচন্দের শেষ দিকের গল্পেও উত্তর ভারতের কিষাণের অপরিসীম দারিদ্র্য, শোষণ ও নিগ্রহের তীব্রতা পরিস্ফুট; সম্পূর্ণ সংযত, নিরাভরণ, প্রায় নিস্পৃহ একটা ভঙ্গীতে ঠিক যেমনটা আমরা দেখতে অভ্যস্ত মানিকবাবুর লেখায়ও। সেদিন প্রেমচন্দের 'সদ্‌গতি' গল্পের চিত্ররূপ দেখে সে কথাটা আবার মনে হল—তবে এ'ও ঠিক যে সেখানে রূপকার স্বয়ং সত্যজিৎ রায়।

তারাশঙ্কর-স্মৃতি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রথম দেখি ১৯৪০ সনের শেষে অথবা ১৯৪১ সনের গোড়ায়। তার কিছুটা আগে থেকেই অবশ্য 'শনিবারের চিঠি' ও 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক পড়তাম তাঁর 'ধাত্রীদেবতা' ও 'কালিন্দী' উপন্যাস। মনে হচ্ছে 'চৈতালী ঘূর্ণি'ও পড়েছিলাম ঐ সময়েই। 'গণদেবতা', বিশেষ করে 'পঞ্চগ্রামে'র পরিপূর্ণতায় না পৌঁছলেও বলা বাহুল্য ঐ তিনটি উপন্যাসই তখন প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল আমাদের তরুণ, রোমান্টিক মনকে।

তখনই কিন্তু আমার কাছে আরো উপাদেয় মনে হত নানা পত্রিকায় প্রকাশিত সমুজ্জ্বল তাঁর সব ছোটগল্প। নাম মনে নেই কিন্তু একটি গল্পের বিষয়টা মনে পড়লে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার পথ দিয়ে পথিক চলেছে। অতর্কিতে এক ঠ্যাঙাড়ে তার দু'পায়ের মধ্যে এমন কৌশলে ছোট একটা লাঠি ছুঁড়ে দেয় যে সে হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে। চকিতের মধ্যে তার ঘাড়ের উপর সেই লাঠিটা চেপে ধরে ঠ্যাঙাড়ে দেখতে দেখতে পথিকের শরীরটা উল্টে তার ঘাড় মটকে দেয়। এই হল ঠ্যাঙাড়ের ব্যবসা। একদিন ঠিক এমনি ভাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে একজনের দেহটা উল্টে দিয়েই ঠ্যাঙাড়ে টের পেল যে সে যাকে টাকার লোভে মেরেছে সে তারই ছেলে।

কিন্তু যে ছোট গল্পটির সূত্রে তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে পথম পরিচয় তার নাম 'নুটু মোক্তারের সওয়াল'। আমরা তখন 'Youths' Cultural Institute' ('Y. C. I.') নামে তরুণদের এক সমিতির উদ্যোগী সদস্য। অভিনয়ের জন্য আমরা সে সময়ে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি বেশ ভালো একটি কালোপযোগী বাংলা নাটক। আমার দুই বন্ধু সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় ও সরোজ কুমার দত্ত কোন এক পত্রিকায় ঐ গল্পটি পড়ে আমাকেও সেটি পড়তে বলেন। গল্প পড়ে স্থির হল যে ঐ গল্পকেই নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করা হবে। ফলে অনতিবিলম্বে আমরা একদিন হাজির হলাম আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের সেই

ছোট বাড়িটিতে যার পাশের বাড়িতেই তখন থাকতেন যামিনী রায় এবং যেখানে তারপর থেকে অন্তত বছর সাত আট আমাকে বিস্তর হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে নিয়মিত। নানা কারণে সে নাটক অভিনয় করা আর আমাদের হয়নি কিন্তু ঐ 'নুটু মোক্তারের সওয়ালের'ই নাট্যরূপ 'দুই পুরুষ'ই তারাশঙ্করবাবুর প্রথম সার্থক নাটক। মাসের পর মাস সে নাটক অভিনীত হয়েছিল তখনকার দিনের 'নাট্যভারতী' রঙ্গমঞ্চে।

এরপর থেকে তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ১৯৪২ সনের ডিসেম্বরে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে আমরা যে 'ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক সম্মেলনে'র অনুষ্ঠান করি তাতে তিনি আমাদের লেখক সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীটে আমাদের সংঘের দপ্তরে তখন তিনি সপ্তাহে অন্তত তিন চার দিন আসতেন। শুধু সাহিত্য আলোচনার আসরে নয়, সংঘের খুঁটিনাটি কাজকর্মে, এমন কি হিসেবপত্রের মতো নীরস ব্যাপারেও তাঁর দেখা যেত সমান আগ্রহ।

আলোচনার আসরে আমরা ছোটবড় সবাই তখন প্রাণখুলে তর্ক করতাম। মনে পড়ে ফরাসী চিন্তাবিদ, রোজার গারোদি ও বিখ্যাত ফরাসী কবি, লুই আরাগঁর বিতর্কের সূত্র ধরে আমরা কি রকম সংঘ দপ্তরে উদ্দীপ্ত আলোচনা চালিয়েছিলাম তিন দিন ধরে। এ সব আলোচনায় মাঝে মাঝে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখেছি। সাংগঠনিক ব্যাপারেও কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে আমাদের মতান্তর ঘটেছে। কিন্তু সে-সব ব্যাপার তিনি বড় একটা মনে পুষে রাখতেন না। দপ করে জ্বলে উঠে পর মুহূর্তেই পড়ে যেত তাঁর রাগ—তারপর আবার শুরু হত সেই সহৃদয় আলাপন। বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ছিল বন্ধুত্ব। আর কর্মীদের মধ্যে সুভাষ, সুধীবাবু (শ্রীসুধী প্রধান) ও আমি ছিলাম তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন। মনে পড়ে একবার তিনি আমায় তাঁর 'মন্বন্তর' উপন্যাসখানি উপহার দিয়েছিলেন এই কথাগুলি লিখেঃ ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক সংঘের সম্পাদক, আমার কমরেড শ্রীমান চিন্মোহন সেহানবীশকে।

ফ্যাশিস্টবিরোধী সংগ্রামে কারান্তরাল থেকে জাতীয় নেতাদের মুক্ত করার সংগ্রামে, মন্বন্তরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা সেদিন সর্বদাই তারাশঙ্কর বাবুকে পেয়েছি আমাদের এক শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে।

১৯৪৫ সনের মার্চ মাসে 'মহম্মদ'আলি পার্কে আমরা যে লেখক সম্মেলনের

অনুষ্ঠান করি তার অন্যতম সভাপতি হিসেবে তারাশঙ্কর বাবু যে উদাত্ত আহ্বান দিয়ে তাঁর ভাষণ শেষ করেন সেই কটি কথা দিয়েই এই স্মৃতিচারণ শেষ করি: 'দেশের গণচেতনায় নব স্পন্দন সূচিত হচ্ছে। মুহ্যমান আশা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কোটি কোটি মানুষ শিক্ষায় দীক্ষায় অধিকারে নূতন স্তরে উঠে এসে এক অভূতপূর্ব গণমিছিলে অভিযানের স্বপ্ন দেখছে। বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার শিক্ষিত অশিক্ষিত সমগ্র জনসাধারণ সমগ্র ভারতের কৃষক-শ্রমিক শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে নবজীবনের পথে যাত্রা করবে।

তার জীবনরূপ, তার কথা, তার কাহিনী বাঙালী সাহিত্যিক রচনা করবে বৈকি। সময় আসছে, সময় হয়েছে, বাঙালী সাহিত্যিকবৃন্দকে আমিও আহ্বান জানাচ্ছি—রচনা কর, রচনা কর নবজীবনের গান'।

('কালি ও কলম', অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন

১৯৪২ সাল। ফ্যাসিজমের বিশ্বজয়ের চেষ্টা কতটা গুরুতর, কিইবা তার তাৎপর্য এই নিয়ে আমাদের দেশের চিন্তাশীল মানুষ বিষম দোটানায় পড়েছেন। কিছুদিন আগেও প্রগতি লেখক মহলে যথেষ্ট আনাগোনা ছিল এমন একজন নামজাদা গল্পলেখকের তখন সবেমাত্র গোত্রান্তর ঘটেছে। তিনি ঐ সময়ে কমিউনিস্ট-মেধ যজ্ঞে তিলাঞ্জলি শুরু করলেন একটি ছোটো গল্প ফেঁদে। গল্পটির নাম বা কোন্ পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়েছিল আজ আর তা মনে নেই। শুধু মনে পড়ে যে কমিউনিস্টদের ধনতন্ত্রবিরোধ যে আসলে মেকি তা প্রমাণ করার জন্য ঐ গল্পে আমদানি হয়েছিল এক বিদঘুটে ধনিক কমিউনিস্ট চরিত্রের।

আমাদের মতো ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের কমিউনিস্ট কর্মীদের কাছে এটা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। কারণ পৃথিবীব্যাপী তোলপাড়ের মুহূর্তে সব দেশেরই কিছু কিছু দুর্বল হৃদয় যে টলবে আর ন্যূনতম প্রতিবন্ধকতার প্রকৃষ্ট পন্থা হিসেবে সস্তা কমিউনিজম-বিরোধিতার স্রোতে গা ভাসাবে, এতে আশ্চর্যের কি আছে?

আশ্চর্য হলাম যখন এর কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ নজরে পড়ল একটি গল্প, যার চরিত্রগুলি, মায় তাদের নাম পর্যন্ত ঐ আগের গল্পের সঙ্গে হুবহু এক অথচ যার তীব্র শ্লেষের শিকার হল কমিউনিজম নয়, কমিউনিজম-বিদ্বেষ। গল্পটির নাম 'হ্যাংলা'—যদিও কোথায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল আজ তা বেমালুম ভুলে গেছি। এতে একই নামের চরিত্র মারফত লেখক শুধু কমিউনিজম ও ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের মৌলিক দ্বন্দ্বের কথাই নয়, অত্যন্ত নিপুণভাবে এ'ও দেখিয়েছিলেন যে গোত্রান্তরিত লেখক কমিউনিজমকে হেয় করার উদ্দেশ্যে 'ধনিক কমিউনিস্টের' বিরুদ্ধে যে সব গলাবাজী করেছেন আসলে তা অম্লরসে পরিপূর্ণ দ্রাক্ষাফলের আকর্ষণের মতোই নিছক হ্যাংলামি।

আরো বিস্ময়কর ঠেকল যখন দেখলাম এ গল্পের লেখক স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বা 'প্রাগৈতিহাসিক'-গল্পের আমরা তখন অনুরাগী পাঠক। তবু তাঁর মত জটিল ও সূক্ষ্ম মানব

মনের কারবারী যে আমাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের' ধারে কাছে আসতে পারেন এমন 'অঘটনের' প্রত্যাশা আমি অন্তত করিনি। কারণ শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিজমের বিপর্যয়কর তাৎপর্য সত্ত্বেও আমাদের দেশের অনেক শিল্পী সাহিত্যিকের চোখেই ফ্যাসিজমের মতোই ফ্যাসিজমবিরোধিতাও ছিল নিছক রাজনীতি আর তাই আমাদের 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'ও একান্তভাবেই 'রাজনীতি-ঘেঁষা' অতএব পরিত্যজ্য।

স্বভাবতই আমরা তাই উৎসুক হয়ে উঠলাম মানিকবাবুর গল্প পড়ে। এমন সময়ে আমাদের ঔৎসুক্যে ইন্ধন যোগাবার জন্যই যেন প্রকাশিত হল মানিকবাবুর আর একটি ছোটো গল্প—'প্রতিবিম্ব'। এতে তিনি কয়েকটি কমিউনিস্ট চরিত্রের অবতারণা করেন। আমাদের সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক সদিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিল এ গল্পের ছত্রে ছত্রে। তবু এতে প্রকট হয়ে উঠেছিল প্রগতি সম্পর্কে তাঁর এতদিনকার আধা-নৈরাজ্যবাদী ধারণার জের ও তাই অধিকাংশ চরিত্রই আমাদের কাছে কিছুটা অস্বাভাবিক বোধ হয়েছিল। সব মিলিয়ে গল্পটি উৎরোয়নি মোটেই।

তবু এ গল্পের সূত্র ধরেই মানিকবাবুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটে। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে' যোগ দেন ১৯৪৩ সালের গোড়ায়। এর কিছুদিনের মধ্যেই একদিন একান্তে পেয়ে তাঁকে সভয়ে জানিয়েছিলাম 'প্রতিবিম্ব'-সম্পর্কে আমাদের মতামত। 'সভয়ে' কারণ বড় লেখকের উত্তুঙ্গ আত্মাভিমানের পরিচয় তখন আমরা পাচ্ছি পদে পদেই। মানিকবাবু কিন্তু আমাকে দ্বিতীয়বার অবাক করলেন এই বলে: 'অর্থাৎ গল্পটা কিছুই হয়নি এই বলতে চান'তো? তা কি করে হবে বলুন? কতটুকু জানি আপনাদের? যখন আপনাদের ঠিকমত চিনব দেখবেন তখন গল্প উতরোয়, কি উতরোয় না!'

এক মুহূর্তে আমরা মানিকবাবুর নাগাল পেয়ে গেলাম। কারণ তাঁর কথার সেদিন সহজ আত্মাভিমানশূন্যতার পাশাপাশি যে প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের সুরও বেজে ছিল, আমাদের বুঝতে এতটুকু দেরী হল না, যে সেই সুরই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে আমাদের ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকে 'কেন লিখি' নামে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়,

প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাস, অন্নদাশংকর রায়, বিষ্ণু দে প্রমুখ পনোরো জন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের জবানবন্দী হিসেবে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় তার মধ্যেকার মানিকবাবুর রচনাটি 'পরিচয়ে'র এই সংখ্যাতেই আবার, প্রকাশিত হচ্ছে। তাতেও তিনি লিখেছিলেন ঃ

'কলমপেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ হলে আপশোষ জাগে যে খাঁটি লেখক কবে হব।'

এ হেন মানুষের প্রতি আত্মীয়তাবোধ সহজেই গভীর হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই চারিদিক থেকে গুঞ্জন উঠল—মানিকবাবু একেবারে দলীয় হয়ে গেছেন। এর জবাব দিয়েছিলেন মানিকবাবুই ১৩৫৪ সালের ফাল্গুন মাসের 'পরিচয়ে' ঃ

'...দুটো দল হয়ে গেছে, উপায় কি? ব্যক্তিগতদের ব্যক্তিপ্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতিপ্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।'

অর্থাৎ অভিযোগ অস্বীকারের চেষ্টা নয়, স্পষ্ট দ্বিধাহীন স্বীকৃতি !

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে মহম্মদ আলি পার্কে যখন আমাদের সংঘের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (এখানেই সর্বভারতীয় সংঘের সঙ্গে নাম মিলিয়ে আমাদের সংঘেরও নামকরণ হল 'প্রগতি লেখক সংঘ') তখন মানিকবাবু সভাপতিমণ্ডলীর একজন সদস্য নির্বাচিত হন। এর পর থেকে সংঘ যতদিন সক্রিয় ছিল ততদিনই মানিকবাবু তার নায়কতা করেছেন। সে নায়কতা শুধু সম্মেলনের ভাষণ বা আনুষ্ঠানিক কাজকর্মেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আমাদের সংঘের ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ দপ্তরের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কাজে, বয়স বা সাহিত্যিক গুণাগুণ নির্বিশেষে সংঘের কর্মীদের সঙ্গে প্রাণখোলা, সকৌতুক আলাপে, 'পরিচয়ের' শুক্রবাসরীয় বৈঠকে—সর্বত্রই তা' সমান ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠত।

সব থেকে জমত তখন আমাদের সংঘের বুধবারের বৈঠকগুলি। আমাদের রেওয়াজ অনুসারে এখানে লেখকেরা তাঁদের সদ্যরচিত গল্প, কবিতা বা নাটক পড়ে শোনাতেন অথবা সুরকারেরা তাঁদের সদ্যরচিত গান গাইতেন। এইখানেই বিজন ভট্টাচার্য পরের পর তাঁর 'আগুন', 'জবানবন্দী' ও বিখ্যাত 'নবান্ন' নাটক অভিনয়ের মত করে পড়ে শোনান। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র গেয়ে

শোনান তাঁর 'নবজীবনের গান' ও 'মিছিলের গান'। সুকান্ত আবৃত্তি করেন 'রাণার', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' ও 'ফসলের ডাক'। তুলসী লাহিড়ী ও শম্ভু মিত্র পাঠ করেন তাঁদের 'দুঃখীর ইমান', 'উলুখাগড়ার' প্রাথমিক পাঠ, গোলাম কুদ্দুস শোনান তাঁর 'হিসাব নিকাশ' এবং সুলেখা সান্যাল উপস্থিত করেন তাঁর প্রথম গল্প লেখার প্রয়াস। এই বুধবারের বৈঠকেই 'পরিচয়'-এর বর্তমান সম্পাদক, ননী ভৌমিক আসর মাত করেন একটি ছোটো গল্প শুনিয়ে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কোনো সদ্যরচিত কবিতা এখানে পড়েছিলেন কিনা মনে নেই, তবে তাঁর 'বজ্রকণ্ঠে তোল আওয়াজ' আমরা তখন গেয়ে বেড়াতাম পথেঘাটে, সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে—সর্বত্রই।

মানিকবাবুও বুধবারের বৈঠকে একাধিক সদ্যরচিত গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন। স্বভাবতই সে সব দিনে শ্রোতাদের ভিড় আমাদের অফিস ছাপিয়ে সিঁড়ি অবধি পৌঁছত। মন্বন্তরের সময়কার দু'একটি গল্প ছাড়া 'পেটব্যাথা'র মত নির্মম অত্যাচারের কাহিনীও তিনি এইখানেই শোনান। সব থেকে আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে 'হারানের নাতজামাই' গল্পটি পড়ার স্মৃতি। সময় সম্ভবত ১৯৪৬ সালের শেষ অথবা ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিক। দাঙ্গার দুস্বপ্নকে মুছে ফেলে দিয়ে সারা বাংলা দেশ জুড়ে তখন চলছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ তেভাগা আন্দোলন। চারিদিকে প্রবল উত্তেজনা। গোলাম কুদ্দুসের মত সাহিত্যিক-সংবাদদাতারা জেলায় জেলায় সফর করে আন্দোলনের জ্বলন্ত ছবি আঁকছিলেন 'স্বাধীনতার' পাতায়। এমন সময়ে এল মানিকবাবুর 'হারানের নাতজামাই'। মানিকবাবু যখন গল্প পড়া শেষ করলেন তখন আমি ভাবছিলাম সাহিত্য সত্যই কত ধারালো হাতিয়ার হতে পারে সংগ্রামের! কিষানী ময়নার মা-র চরিত্র-মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়েছিলাম আমরা সবাই কিন্তু তার গোঁয়ার জামাইও কি ফেলবার? এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা।

বুধবারের বৈঠকগুলিতে রচনা-পাঠের পর বেশ দিলখোলা আলোচনার রেওয়াজ ছিল। সে আলোচনায় শুধু মানিকবাবুর মত নামজাদারাই যোগ দিতেন না, আনকোরারাও নির্ভয়ে গুরুগম্ভীর সমালোচনা করতে ছাড়তেন না—এমন কি মানিকবাবুর গল্পের ভালোমন্দ নিয়েও। হয়ত বা অনেক কাঁচা কথাই বলা হত সেখানে। তবু একমুখ হাসি নিয়ে মানিকবাবু বসে বসে

শুনতেন আলোচনা, থেকে থেকে জোরালো সমর্থন বা প্রবল প্রতিবাদ করতেন কোনো মন্তব্যের, মাথা ঝাঁকি দিয়ে মেতে উঠতেন প্রচণ্ড উৎসাহে ও উত্তেজনায়। কিন্তু কখনও তাঁকে অধৈর্য হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

উত্তেজনার কথা বলতে মনে এল নৌবিদ্রোহ, রসিদ আলি দিবস বা ২৯শে জুলাই-এর অগ্নিগর্ভ দিনগুলির কথা। এসব দিনে মানিকবাবুকে দেখেছি কখনও মজুরদের মিছিলের সঙ্গে একাগ্রমনে চলেছেন, কখনও ছাত্রদের সঙ্গে জুটে রাস্তায় বসে, কখনও সংঘ অফিসে অথবা কমিউনিষ্ট পার্টির দপ্তরে তুমুল আলোচনা করছেন, কখনও বা পথচারীর কাছে জেনে নিচ্ছেন সংগ্রামের টাটকা খবর। আর এইসব টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা তাঁর হাতে কখনও রূপ পেয়েছে 'চিহ্নে'র, কখনও জ্বলন্ত বিবৃতির (১৩৫৫ সনের মাঘ মাসের 'পরিচয়ে' প্রকাশিত ছাত্র-মিছিলের উপরে পুলিসী তাণ্ডবের প্রতিবাদ, 'মানবতার বিচার' দ্রষ্টব্য) কখনও বা বড়ো উপন্যাসের উপাদানের।

১৯৪৭ সালে পুজোর আগে প্রগতি লেখক সংঘ ও 'আর্টিষ্টস এসোসিয়েশন', কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সঙ্গে একযোগে এক অভূতপূর্ব দাঙ্গাবিরোধী মিছিলের ব্যবস্থা করে। সম্ভাব্য দাঙ্গার আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান নর-নারীর কাছে সেদিন বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিকেরা দলমত নির্বিশেষে উপস্থিত হয়েছিলেন নবজীবনের বাণী নিয়ে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বিশেষ করে যে-সব অঞ্চলে দাঙ্গার আশঙ্কা বেশি, সেই সব এলাকায় সেদিন মানিকবাবু, তারাশঙ্করবাবু, গোপালবাবু, জ্যোতির্ময় রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন শান্তির প্রতি তাঁদের অবিচল আস্থা—সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন চৌধুরী, সন্তোষ সেনগুপ্ত প্রমুখেরা গেয়েছিলেন জাতীয় সঙ্গীত। কলিকাতাবাসীর সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা!

'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে মানিকবাবুর যোগ বহুদিনের। সুধীন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখনও 'পরিচয়ে' মানিকবাবুর 'অহিংস' উপন্যাস ও একাধিক ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। আর হাল আমলে তো তিনি এর পরিচালকবর্গের অন্যতমই ছিলেন। পত্রিকার শুক্রবাসরীয় আড্ডারও তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী পাণ্ডা। বেশ কয়েকটা ছোটোগল্প ছাড়াও এই সময়ে তাঁর 'জীয়ন্ত' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়ের'

পাতায়। এ-প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে; 'ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউসে'র পক্ষ থেকে আমরা তখন সবেমাত্র 'পরিচয়'-পরিচালনার ভার পেয়েছি। ফি মাসেই তখন পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটত। কারণ ঐ মানিকবাবুর 'জীয়ন্ত'। বাংলাদেশের পত্রিকাপরিচালকমাত্রই বোধ করি হাড়ে হাড়ে জানেন মানিকবাবুর হাত থেকে প্রেসের 'কপি' বার করা কি দুরূহ ব্যাপার ছিল। আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়েই তিনি ঘোষণা করতেন—'কাল নিশ্চয়ই দেব'—তারপর কিছুতেই পেরে উঠতেন না কথা রাখতে। আমাদের তাগাদার পেয়াদা তাঁর কাছ থেকে বার তিনেক ঘুরে আসার পর আমি মরিয়া হয়ে একবার মানিকবাবুকে এই মর্মে চিঠি লিখি: 'জীয়ন্ত'র এবারকার দফার কপি কাল বেলা বারোটার মধ্যে যদি আপনি প্রেসে পৌঁছে না দেন তা হলে আমি নিজেই সেটা লিখে দিতে বাধ্য হব। তাতে হয়তো দেখতে পাবেন আপনার নায়ককে বাঘে খেয়েছে, নায়িকা পাগলিনী হয়েছেন, উপনায়ক, উপনায়িকারা আত্মহত্যা বা ঐরকম কিছু একটা কাণ্ড করে বসেছেন। মোট কথা, এমন একটা অঘটন আমি ঘটাব যার রসাতল থেকে স্বয়ং তলস্তয়, বালজাক বা গোঁকিও উপন্যাসকে পুনরুদ্ধারের কোনো পথই পাবেন না। বলা বাহুল্য আগের সংখ্যাগুলির মতোই এবারেও ঔপন্যাসিক হিসাবে আপনারই নাম থাকবে শিরোনামায়—কাজেই ঝুটো মানিক ধরা পড়বে না নাম থেকে। শেষবারের মতো আপনাকে বিবেচনা করতে বলি ব্যাপারটা সত্যিই কি ভালো হবে'?

পরদিন বেলা বারোটার মধ্যে সাচ্চা মানিকেরই 'কপি' পাওয়া গিয়েছিল আর তার সঙ্গে ছোট্ট একটি চিঠি—'আচ্ছা জব্দ করলেন মশাই!'

অবশ্য এমনটা সম্ভব হয়েছিল মানিকবাবু মানিকবাবু ছিলেন বলেই। ১৯৪৮ সালে আমাদের উপরে নামল সরকারী দমননীতির খাঁড়া। গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হলেন। সেই হট্টগোলের মধ্যে 'প্রগতি লেখক সংঘে'র পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়—মানিকবাবুর সভাপতিত্বে। দমননীতির প্রকোপে আমাদেরও তখন সুর খুব চড়া। সেই উত্তেজনার আবহাওয়ায় আমি সম্মেলনের সামনে 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' নামে একটি প্রবন্ধ দাখিল করি। তাতে যথেষ্ট বেপরোয়া ঢালাও কথাবার্তা ছিল এই ধরনের: 'শিল্পী বা সাহিত্যিকের উচিত ট্রেড ইউনিয়ন

বা কিষাণ সমিতির কর্মী হিসাবে মজুর বা কিষাণের মধ্যে কাজে নামা। তার ফলে·যদি লেখা বা শিল্প সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় তাতে ক্ষতি নেই। যে অভিজ্ঞতা তাঁরা অর্জন করবেন তার ফলে ভবিষ্যতে নতুন শক্তিশালী শিল্প সাহিত্য গড়ে উঠবেই ইত্যাদি'।

মনে আছে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সেদিন মানিকবাবু আমায় সমর্থন জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই প্রবন্ধের সুরেই বাঁধতে হবে আমাদের ঘোষণাকে। তবে আমার মনে হয় সেদিনও হয়তো আমরা তাঁকে হৃদয়াবেগের তোড়েই ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম—আসলে তাঁর শিল্পী-মন কখনও সায় দেয়নি আমার বেপরোয়ানায়। তাই তিনি সাহিত্যিকের স্বধর্ম',' 'কলম পেষার পেশা' ছাড়েননি একদিনের জন্যও। দুবছর পরে জেলখানায় বসে 'পরিচয়ে'র পাতায় পড়লাম তাঁর 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' প্রসঙ্গে লেখা। তা'তে তিনি আমার প্রবন্ধের উল্লেখ করে তার যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করেছিলেন একে একে।

মনে পড়ে জেলে যাবার কিছুদিন আগে একদিন মানিকবাবুকে পীড়াপীড়ি করেছিলাম পুলিসী সন্ত্রাস-জর্জরিত বড়া কমলাপুরে যাবার জন্যে। কিছুটা উদ্ধতভাবেই বলেছিলাম 'লেখক হিসেবে না হয় নাই গেলেন কমিউনিস্ট হিসাবেই যান। তারপর একদিন জেলখানার পাঁচিল পেরিয়ে এল 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। সন্ত্রাসের ছমছমে আবহাওয়া মূর্ত হয়ে উঠেছিল ঐ আশ্চর্য গল্পটিতে। মনে মনে সেদিন মাপ চেয়েছিলাম মানিকবাবুর কাছে।

আরও প্রায় দেড় বছর পরে একদিন বক্সা ক্যাম্পের কাঁটা তারের বেড়া পেরিয়ে হাতে এল 'পরিচয়'। তাতে পড়লাম মানিকবাবু লিখেছেন ঃ

'সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, চিন্মোহন সেহানবীশ, পারভেজ শাহিদী, সুনীল বসু, দ্বিজেন নন্দী প্রমুখ লেখক, কবি, শিল্পী ও সংস্কৃতি-কর্মীদেরও বক্সায় পাঠান হয়েছে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিচর্চা একান্তভাবেই প্রকাশ্য ব্যাপার। গোপন ষড়যন্ত্রের এতটুকু স্থান নেই। ছবি আঁকি, গল্প কবিতা, প্রবন্ধ লিখি, গান গাই, অভিনয় করি, বক্তৃতা দিই—গোপনে করা দূরে থাক, পাঠক শ্রোতা দর্শক পর্যন্ত বেছে নেবার উপায় নেই। সোজাসুজি খোলাখুলি আমার দেশের সকল মতের সকল রুচির সকল মানুষের সামনে তুলে ধরে দিতে হবে আমার সকল রকম সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা। দেশের মানুষই

তাই শিল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার একমাত্র বাহক এবং বিচারক : দেশবাসীর গ্রহণ ও বর্জনই এক্ষেত্রে একমাত্র প্রয়োগযোগ্য আইন। শিল্পী সাহিত্যিক-সংস্কৃবিদেরা যখন সম্পূর্ণরূপে গণমত ও গণবিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, গোপন কার্যকলাপের কিছুমাত্র সুবিধা যখন তাঁদের বিশেষ পেশায় নেই এবং শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণটাই যখন নির্ভর করে শিল্পী সাহিত্যিক সংস্কৃতিবিদদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার উপর—তখন বাংলার প্রিয়তম শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীরা বক্সা ক্যাম্পে আটক কেন?"

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে এল আমাদের। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে দেখলাম অসম্ভব সে চেষ্টা—ছেলেমানুষের মতো অধীর আগ্রহ নিয়ে মানিকবাবু আমাদের জেলখানার গল্প শুনতেই ব্যস্ত।

জেল থেকে ফিরে এসে দেখলাম আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার অপরাধে ইতিমধ্যে বহু প্রকাশকের দরজা মানিকবাবুর কাছে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এমন কি সাময়িক পত্রিকায় সর্বভুক পূজাসংখ্যাগুলি পর্যন্ত অপরিসীম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বেশ নিয়মিতভাবেই লেখা চাইতে ভুলে যাচ্ছে বাংলাভাষার এই শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর কাছ থেকে। অন্যদিকে আমরাও এদিক দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে পারলাম না তেমন করে। সে দায় আমাদেরই।

দিনের পর দিন এই কোনঠাসা, দম-আটকানো অবস্থা চলতে লাগল একটানা। অতীতের রাহু আবার তাঁকে গ্রাস করল তারই সুযোগে।

হয়তো একেবারে শেষের দিকে অবস্থান্তর ঘটেছিল কিছুটা। প্রকাশক ও পত্রপত্রিকার রুদ্ধ দরজা আবার কিছুটা খুলেছিল ধীরে ধীরে। সমাজের জ্ঞানী গুণী মানী ব্যক্তিরা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন হাত। কিন্তু তখন বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে।

তবু মানিকবাবুর মৃত্যু আজ আমাদের সকলকেই মিলিয়েছে এটাই মস্ত সান্ত্বনা।

পুলিসের গুলিতে মরণাহত 'চিহ্ন'র সেই ছাত্রটির কথা কেন জানি মনে হচ্ছে—মিছিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে যে ক্রমাগত বলছিল : "ওরা এগোচ্ছে না কেন? ওরা কি আর এগোবে না?"

('পরিচয়', পৌষ, ১৩৬৩)

কবিবন্ধু পরভেজ শহীদী

পরভেজের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটি মনে পড়ে। ১৯৪৯ সালের আগস্ট বা সেপ্টেম্বরের এক দুপুর। প্রেসিডেন্সি জেলের সাত খাতার আঠারো নম্বর ওয়ার্ড। আমার মাথার দিকে মস্ত এক গরাদ-দেওয়া দরজা। তাই দিয়ে খেলার মাঠ আর তারই এক পাশের পুকুর দেখা যায়। দুপুর বেলা ও-দিকে তাকিয়ে থাকলে মাঝে মাঝেই দেখতাম ওয়ার্ডারের সঙ্গে নতুন নতুন রাজবন্দী আমদানি হচ্ছেন—পরিচিত মুখ দেখলে আমরা বনেদি রাজবন্দীরা উল্লাসধ্বণি দিয়ে উঠি—'তা হলে আপনিও এলেন শেষ পর্যন্ত!' আর অপরিচিতদের জন্য কয়েক মিনিট অপেক্ষা করি পরিচয়ের আশায়।

সেদিন তেমনি পরভেজ এলেন চারজন ছাত্রবন্দীর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় আমার তো ছিলই না, আমি তাঁর নামও শুনিনি তখন অবধি। শুনলাম তিনি নাকি অধ্যাপনা করতেন মেদিনীপুরের কোন এক কলেজে, ফার্সি ও আরবির। তিনি জানালেন, সত্যিই তিনি কোন কিছুর মধ্যে নেই, শুধু বই পড়তেন আর দেবেন দাসের মত দু-একজনকে চিনতেন। আমি জানতে চাইলাম, 'আপনার ছাত্র সঙ্গীদের কেন আনল'? তিনি বললেন, 'ওরে বাবা! ওরা তো শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে কোন এক বিখ্যাত নেতার গাড়ী লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়েছিল—হাতে হাতে ধরা পড়েছে অকুস্থলেই। ওদের অনেকদিন রাখবে।'

পরভেজের জোর বিশ্বাস এক মাসের মধ্যে তিনি ছাড়া পাবেন কারণ তিনি কিছুই করেননি। আমি বললাম, ঠিক ঐ রকম বিশ্বাস শুধু আমার নয়, আমাদের প্রায় সকলেরই ছিল, কারণ নিয়ম হল এক মাসের মধ্যে হয় চার্জশীট, নয় তো মুক্তি। তাই আমি যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, এমন বিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকেরই ছিল ঐ এক মাস অবধি আর তার পরই পেয়েছিলাম সেই অবশ্যম্ভাবী প্রেমপত্র 'Governor is pleased to detain you'।

সত্যিই পরভেজ মাথা ঝাঁকিয়ে তবু বলতেন, 'না না, বিশ্বাস করুন, আমি

একেবারে নিরাপরাধ।' এক মাস পূর্তির দিন কিন্তু গভর্নরের 'pleasure' যেরূপে এল, তা সত্যিই কিন্তু আমাদের কাছে হৃদয়বিদারক ঠেকল। পুজোর ঠিক আগেই সেই ভয়ংকর চার ছাত্র ২৫০ (জেলে ঢুকলেই গদি, বালিস, চাদর ইত্যাদি কেনার জন্য ২১০ + মাসিক ভাতা ৪০) টাকার পুজোর বাজার করে ড্যাঙ ডেঙিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেল আর আমাদের 'সম্পূর্ণ নিরপরাধ' পরভেজ সাহেব পেলেন গভর্ণরের সেই চিরপরিচিত প্রেমপত্র তাঁর নানাবিধ দুষ্কর্মের এক লম্বা ফিরিস্তি সমেত—তিনি নাকি নিয়মিত ট্রাম শ্রমিকদের নিয়ে চক্রান্ত আঁটতেন সরকার-ধ্বংসের ইত্যাদি ইত্যাদি। তালিকা পড়ে পরভেজ অনেকক্ষণ গুম মেরে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'বিশ্বাস করুন, ট্রাম শ্রমিকদের দেখেছি শুধু ট্রামে চড়ার সময়ে। এবার থেকে না হয় খালি বাসে চড়ব, নয়ত হাঁটব। আর এ জানলে তো শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে জুতো ছুঁড়তেও পারতাম'।

ঐ ছিল পরভেজের কথা বলার ধরন। অথচ তারপর তিনি দমদম জেলে ও বক্সা দুর্গে আমাদের সহবন্দী; বারবার অনশন করেছেন আমাদের সঙ্গে—একবার তো একটানা ৫৫ দিন—মাথা ফাটিয়েছেন জেল ওয়ার্ডারদের লাঠিতে। তবু আমরা যখন একদিন একসঙ্গে ছাড়া পাই বক্সা থেকে তখন সন্ধ্যেবেলা মশাল-হাতে রক্ষীদের পাহারায় বাঘ-ভালুকের জঙ্গল পেরিয়ে সাঁতরাবাড়ি পৌঁছে, ২৯ মাইল ষ্টেশন ওয়াগন চড়ে রাজাভাতখাওয়া, তারপর রাত ২টোয় ট্রেন ধরে, সারা রাত, সারা দিন কাটাবার পর বিকেল নাগাদ শকড়িকলিঘাট, তারপর আধ মাইল বালি পেরিয়ে ষ্টিমার, ওপারে অবশেষে লালমনিঘাটে পৌঁছে ফের ট্রেনে উঠলাম। পরভেজ তখন খুবই উদ্বিগ্ন মুখে আমার কাছে জানতে চাইলেন, 'এ-ট্রেনটা কি সোজা কলকতা যাবে? না, এর পরেও আবার ঘোড়া বা হাতি চড়া, এরোপ্লেন বা গরুর গাড়ির পালা আছে কি'? 'যতদূর জানি আর কিছু নেই'—আমার এই আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি পরম আরামে সিগারেট ধরিয়ে স্বগতোক্তি করলেন, 'আর কোন শালা বক্সায় আসে!'

এই হলেন আমাদের পরভেজ শহীদী।

সৌভাগ্যক্রমে শুধু এই ন'ন তিনি। সুভাষ লিখেছে... . 'এই মানুষটি যখন কবিতা পড়তে ওঠে, তখন শ্রোতার দল চঞ্চল হয়ে ওঠে, হাততালি থামতে চায় না।

'যখন তার ভারী গলায় গম্‌গম্‌ করতে থাকে—
নববধূ শান্তির হাতের লাল কাঁকনের রিণি রিণি শব্দ শোনো
বাজুবন্দে তার মুখরিত লাবণ্যগাথা।
কামনার উদ্যান ভুর ভুর করছে মিষ্টি গন্ধে,
সিঁথিতে তার পুজোয় বসেছে ছায়াপথ।
আকাঙ্খা তার একাগ্র, যৌবনোদ্দীপ্ত তার অভিলাষ
অসঙ্কোচ চিরবসন্ত তার শোভা—
জিম্‌ ক্রো-র চক্রান্তে বিহ্বল হবে না সে।...

'কিম্বা
কুতূহলী সেখানে প্রত্যেকটি চোখ,
ভালবাসায় ভরা প্রত্যেকটি হৃদয়।
যেদিকে তাকাও দেখবে আরক্তিম আভা,
যেখানেই যাও বসন্ত।'

পরভেজের কবিতা শেষের দিকে মনে হয় একটা বাঁক নিয়েছিল—আরো হয়তো জটিল কিন্তু নিশ্চয়ই আরো পরিণত ও গভীর। তাঁর ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে যে কবিতাটি তিনি আমায় শুনিয়েছিলেন তার থেকে এ-কথাই আমার মনে হয়েছিল।

মনে আছে হঠাৎ এক রাতে খবর এল পরভেজ না কি আর নেই। খবর পেয়েই আমি, আমার স্ত্রী ও আমার বন্ধু নিরঞ্জন সেনগুপ্ত—বয়সে বড় হলেও আমাদের সবার সাথেই ছিল তাঁর অন্তরঙ্গতা—আমরা সবাই যখন রাত দশটায় তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম সমস্ত পাড়া যেন নিঝুম, এমনকি চায়ের দোকান, বিড়ি সিগারেটের দোকানের সবাই মাথা নীচু করে বসে আছেন, হয় একেবারে চুপ, নয়তো কথা বলছেন নীচু গলায়। কবির প্রয়াণ নাড়া দিয়েছে তাঁদের সকলেরই অন্তরের গভীরে।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-অনেক অভিযানের সাথী

সুরকার ও কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সৃষ্টি প্রতিভা পরিমাপের অধিকারী আমি নই, যদিও সেই বিচারেই হয়তো তার প্রকৃত পরিচয়। সুতরাং তার বিষয়ে কোন কথা আমার মুখে মানাবে, তাই ভাবছি। তার সঙ্গে আমার গভীর অন্তরঙ্গতার কথা? সে কথা কি ছাপার অক্ষরে অন্যের কাছে অর্থবহ হবে? এমন কি কিছুটা পরোক্ষ আত্মবিজ্ঞাপনের মতো ঠেকবে না দশজন পাঠকের কাছে? সে ঝুঁকি নিয়েও তবু কয়েকটা কথা বলি এখানে।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ সেন্ট জেভিয়ার্স' কলেজের খেলার মাঠে। সে আমার থেকে বয়সে দু'বছরের বড়, পড়তোও দু'ক্লাস ওপরে। সে সময় তার স্বপ্ন ছিল ফুটবল খেলোয়াড় হওয়ার। তখন সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা অভিনয় বা গান নিয়ে সে খুব যে একটা মাথা ঘামাত মনে হত না, যদিও বটুক যে বাড়ী থেকে এসেছিল সেখানে ছিল সঙ্গীত ও সাহিত্যের চর্চা, আবার তারই সঙ্গে একটা স্বাদেশিকতার ভাবও।

কলেজ ছাড়ার পর বেশ কয়েক বছর আমাদের মধ্যে কোন যোগ ছিল না। তারপর ১৯৩৮ সালে আমি আর কয়েকজন বন্ধু মিলে 'অগ্রণী' নামে একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করি। এই সূত্রে আমাদের মধ্যে আবার কিছুটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্র সে সময় নিজের নামে লিখত না, 'অগ্রনী'তে কবিতা লিখত 'ত্রিশঙ্কু' ছদ্মনামে। অর্থাৎ তখনো সে পুরোপুরি পুরানো ধ্যান-ধারণা বা মতাদর্শকে ছেড়ে নতুন সাম্যবাদী আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে নি, তাই অকপটেই সে তার তখনকার অবস্থাকে অভিহিত করেছিল 'ত্রিশঙ্কু' নামে।

ঐ সময় নাগাদ কার্জন পার্কে আমাদের একটা আড্ডা গড়ে ওঠে। সেই আড্ডায় গোপাল হালদারের মতো প্রবীণ, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও যেমন আসতেন, তেমনি আসতেন আমাদের সমবয়সীরাও। সন্ধ্যে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ওখানে আমাদের আড্ডা চলত। রাজনীতির কথা উঠতো, গান হত, সাংস্কৃতিক নানা প্রসঙ্গ ধরেও আলোচনা হত। সেখানে জ্যোতিরিন্দ্র প্রায় রোজই আসত। আপনারা যাঁরা পুরানো 'পরিচয়ে'র কথা জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে সেই সময়ের 'পরিচয়' পত্রিকার একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল তার গ্রন্থ সমালোচনা। সেখানেও জ্যোতিরিন্দ্রর বেশ কিছু লেখা বেরিয়েছে, কবিতা তো ছিলই।

এর পরের ঘটনা আমাদের অনেকেরই জানা: 'Anti-Fascist Writers'

and Artists' Association', 'Indian People's Theatre Association' প্রভৃতি সংস্থার কাজকর্ম। এই সময়কার কথা ধারাবাহিকভাবে না হলেও টুকরো টুকরো ভাবে তার এবং আমাদের অনেকের লেখাতেই ছড়িয়ে রয়েছে। এই সময়কার একটা কথা খুব মনে পড়ে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্ব ভারতীয় সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্যে আমরা বম্বে গিয়েছিলাম। হাওড়া স্টেশন থেকে '১৬ জন বসিবেক'-লেখা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আমরা ২৩ জন দল বেঁধে উঠেছি। দলে জ্যোতিরিন্দ্র, বিজন, শম্ভু, সুভাষ, জর্জ (দেবব্রত বিশ্বাস) সকলেই ছিল। সমস্ত পথই দল বেঁধে নানা স্বদেশী ও জনযুদ্ধের গান গাইতে গাইতে যাওয়া হল। জ্যোতিরিন্দ্র, জর্জ আর বিনয় রায়ের মিলিত গণনাট্যের গানে সমস্ত আবহাওয়া জমজমাট। একেকটা স্টেশন আসছে আর লোকে অবাক হয়ে দেখছে—'কি ব্যাপার? এরা গান গাইতে গাইতে কোথায় চলেছে'।

এর কিছু পর থেকেই শুরু হয় 'নবজীবনের গান'—তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'নবজীবনে'র গানের রচনা ও সুর আরোপের কাজ চলত সর্বত্রই ঃ নিজের বাড়ীতে, জর্জ বিশ্বাসের আড্ডায়, ৪৬নম্বর ধর্মতলায়। এখানে ওখানে একটু সুযোগ পেলেই গান লেখা হচ্ছে, সুর বাঁধা চলছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে চলছে নতুন গান শোনানোর পালা। রাত ১২টাতেও বটুক চলেছে তানপুরা ঘাড়ে—'নতুন গানে সুর দিয়েছি কেমন হয়েছে বল তো'?—প্রশ্ন করেছে চার পাশের মুগ্ধ শ্রোতাদের—এটাই তার সুরকার জীবনের সোনালী ফসলের যুগ।

ও'দিকে গণনাট্য আন্দোলন চলেছে পুরোদমে। শুনে হয়তো অবাক হবেন যে গান বা অভিনয় থেকে আমার অবস্থান কয়েক যোজন দূরে হলেও কি করে জানি সময়ের গুণে আমিও হয়েছিলাম I. P. T. A-র founder member। আমার ভূমিকা ছিল স্টেজ বাঁধার, অভিনেতাদের চা, পান যোগানোর, টিকিট বিক্রীর, শ্রোতাদের 'কেমন লাগল' জিজ্ঞেস করার এবং সাধারণ ভাবে হৈ চৈ করে বেড়ানোর। এজন্য কিন্তু আমায় মনে কোন হীনমন্যতা ছিল না যে আমি শিল্পী নই। আসল কথা একটা বড় যৌথ কর্মকাণ্ডের আমরা সকলেই ছিলাম অংশীদার—তা সে বটুক-জর্জের মতো প্রথম শ্রেণীর শিল্পীই হোক, আর আমার মতো তল্পিবাহকই হোক। এ-সব ইতিহাসের খুঁটিনাটির মধ্যে আর যাব না। সেই সময়কার মেজাজটাকে ধরে রাখবার জন্যে আমি '৪৬ নং' বলে একটা চটি বই লিখেছিলাম-এ সংকলনের গোড়াতেই মোট পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এখন লেনিন

সরণি, তখনকার ধর্মতলা স্ট্রীটের ৪৬ নম্বর বাড়ীতেই ছিল আমাদের কার্যালয়। তারই নম্বরটি নিয়ে আমার পুস্তিকার নামকরণ এবং বর্তমান বইয়েরও। এখানেই একসঙ্গে প্রগতি লেখক সংঘ বা তার আগে ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ ও অন্যান্য সংস্থার কাজ চলতো।

গণনাট্য সংস্থার একটা মজার ঘটনা মনে পড়েছে। নবজীবনের গানের সঙ্গে নাচ হবে, স্থির হয়েছে। তারই মহড়া চলেছে। বটুক নিজেও মেতে উঠে নাচছে। আমার কাজ ছিল এদের চা যোগানোর। হঠাৎ মনে হলো যে দরজাটা যেন একটু ফাঁক হয়েছে আর ওপাশ থেকে একজন মেম সাহেবকে দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী আর হৃদয়বিদারক। দেখি মেম সাহেবের গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে আর তাঁর হাতে একটা স্যুপ প্লেট। স্যুপ প্লেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন, "দেখ, তোমাদের এই নাচের রিহ্যার্শাল আমার কি দশা করেছে!" উনি থাকতেন তিন তলায় আর আমাদের মহড়া চলছিল চার তলায়। গণনাট্যের নটরাজদের নাচের দাপটে তিন তলার প্লাস্টার খসে পড়েছে মেম সাহেবের স্যুপ প্লেটে। এর পর আমরা তাঁর কাছে বহু মাপটাপ চাইলাম। বললাম যে এরকম আর হবে না, শুধু আজকের দিনটা আমাদের মাপ করে দিন। গণনাট্যের প্রসারে সে দিন আমাদের প্রতিবেশীরা এরকম অনেক ত্যাগই স্বীকার করেছিলেন।

ইদানীং, দিল্লী প্রবাসের শেষে কলকাতা ফেরার পর, বটুকের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা আরো নিবিড় হয়ে ওঠে। আমাদের একটা যৌথ শখ ছিল। উদ্দেশ্য-বিহীন ভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো আর পারলে পথ হারানো। কিন্তু চেষ্টা করে আমাদের পক্ষে কলকাতায় পথ হারানো ছিল বেশ কঠিন ব্যাপার, বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতায়।

বটুক তার দ্বিতীয় কবিতার সংকলন, "যে পথেই যাও" (যাতে তার দিল্লী প্রবাসের সময়ে লেখা কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে) আমাকে দিয়ে লিখেছে 'অনেক অভিযানের সাথী, সহকর্মী ও সহমর্মী বন্ধুবর চিন্মোহন সেহানবীশকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র'। তার মতো গুণী আমার মতো একান্ত মামুলী জনকে এই গৌরব দান করে আসলে নিজেরই বিশাল হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে গেছে।

['সংস্কৃতি সংসদ' নিবেদিত 'জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য স্মরণ সংখ্যা' ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'প্রতিশ্রুতি' পত্রিকার ৯ম বর্ষ, ৯ সংখ্যায় প্রকাশিত দু'টি লেখা একত্রে জুড়ে।]

দেবব্রত বিশ্বাস প্রসঙ্গে

ব্যক্তিগত কথা দিয়েই শুরু করতে হবে। তবে কথাটা ব্যক্তিগত থাকবে না শেষ অবধি।

দেবব্রত বা জর্জকে চিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ। বয়সে সে আমার চাইতে প্রায় বছর দু'এক বড়—ইস্কুল কলেজেও পড়ত দুক্লাস ওপরে। তার সঙ্গে পরিচয় ও পরে ঘনিষ্ঠতার প্রথম সূত্র—আমাদের দু'জনারই ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম; দ্বিতীয়ত আমরা দশ বছর ধরে একত্র চাকরি করেছি হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে।

প্রথম কবে জর্জের গান শুনি আজ মনে নেই—হয়ত মাঘোৎসবের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বা কোন বন্ধুর বাড়িতে অথবা ব্রাহ্ম বাড়ির বিয়ে বা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে। যেখানেই শুনে থাকি তারপর পরিচয় অতি দ্রুত পরিণত হয়েছিল ঘনিষ্ঠতায়, এমন কি অন্তরঙ্গতায়ও। তার মৃত্যুর খবর শুনে তাই মনে হয়েছিল আমাকে 'তুই' বলার লোক বড় আর কেউ রইল না।

কিন্তু ঐসব ব্যক্তিগত যোগাযোগ কিভাবে মুক্তিলাভ করেছিল ব্যাপকতর পরিসরে, সে কথাই বলার জন্যই এই লেখা। হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সে কাজ করার সময়ে জর্জের সঙ্গে রাজনীতির আলাপ হত, তার কাছ থেকে চাঁদাও নিতাম পার্টির জন্য—এর বেশি কিছু নয়। বেশি কিছু ঘটল যখন ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি আমরা **Youth's Cultural Institute** (বা সংক্ষেপে **Y. C. I.**) নামে একটি তরুণ সংঘ প্রতিষ্ঠা করলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সেরা ছাত্রকে নিয়ে। নিখিল চক্রবর্তী, জ্যোতি বসু, রেণু রায়, সুনীল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে আমিও গোড়ার থেকেই যুক্ত ছিলাম এ-প্রচেষ্টার সঙ্গে। আসলে এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতিকূল পরিবেশে তরুণ সমাজে কিছুটা সুস্থ, প্রগতিশীল, মানবিক এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করার এক প্রয়াস।

Y. C. I.র কাজ ছিল সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ে নানা আলোচনার আয়োজন করা। কিছু পরে ঐ তরুণদেরই

লেখা কিছু ইংরেজী নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থাও শুরু হল। শেষের দিকে সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পটিকে নাট্যরূপ দিয়ে সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'কেরানি' নামে বাংলা নাটকও মঞ্চস্থ করেছিল Y. C. I.।

ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যেই কেউ—হয়ত নিখিলই সম্ভবত আগনেস স্মেড্‌লির 'Battle Hymn of China' পড়ে আমাদের জানাল যে চীনে বিপ্লবী সংগ্রামের একটা মস্ত হাতিয়ার নাকি Community Singing বা সমবেত সঙ্গীত। কারণ গান জিনিসটা শুধু ছন্দবন্ধ নয়, সুরবন্ধও বটে, ফলে একবার সে সুর (আর তার সঙ্গে কথাও) কারো মনে গেঁথে বসাতে পারলে তাকে উপড়ে ফেলা যায় না। বরঞ্চ মুখ থেকে মুখে তার ছড়িয়ে পড়ারই সম্ভাবনা ষোল আনা।

কথাটা আমাদের মনে ধরল আর অনতিবিলম্বে আমরা ঐ Community Singing আন্দোলনের অদ্বিতীয় নেতা আবিষ্কার করলাম আমাদের বহুদিনের বন্ধু জর্জ বিশ্বাসের মধ্যে।

জর্জ ও আমার এক বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গোরার (সত্যরঞ্জন দাশ) ৩৮নং বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ির (যে বাড়িতে এখন রুমা গুহঠাকুরতারা থাকে) তিন তলার ছাদে জর্জ শুরু করল নতুন গানের আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের স্বদেশী ও জোরালো গানগুলি ও আমাদের গলা খুলে গাইতে শেখাত আর সবার গলা ছাপিয়ে শোনা যেত তার দরাজ, সুরেলা গলা।

৩৮নং বালিগঞ্জ প্লেসের ছাদে আমরা সবাই গান গাইতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তাতে নিয়মিত যোগ দিতে আসতেন Y. C. I.-র তরুণ সদস্যরা ছাড়াও একদিকে সপরিবারে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের মতো মানুষ আবার অন্যদিকে এমন কিছু ছেলেমেয়ে যাদের একজন জলি কাউলের লেখা 'মজদুর, মজদুর, মজদুর হ্যায় হাম' গান শুনে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল 'মজদুর কাকে বলে'? অর্থাৎ ঐ খোলা গানের আসরে সমাবেশ ঘটত বেশ ব্যাপক ও বিচিত্র ধরনের মানুষের। আর তারপর মুখে মুখে সে-গান কিছুটা ছড়িয়ে পড়ত সভা-সমাবেশে, ট্রামে বাসে ও কলকাতা ও মফস্বলের পথেঘাটে, হাটেবাজারেও।

তবে সেটা বিশেষ করেই ঘটেছিল কিছুদিন পরে, যখন সোভিয়েত ভূমির উপরে নাৎসীবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের ফলে সারা পৃথিবী মুখোমুখি হয় এক নতুন, কঠিন ও জটিল বাস্তবের। আমাদের তখন মনে হয়েছিল যে নতুন

বাস্তবের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হলে আরো অনেক হাতিয়ারের পাশাপাশি চাই এর উপযোগী নতুন নতুন গানের। শুরু হল নতুন জনযুদ্ধের গান বাঁধা ও গাওয়ার আন্দোলন।

এই দ্বিতীয় পর্বেরও নেতা ছিল জর্জ, তবে এবার তার পাশে গোড়ার থেকেই ছিল বিনয় রায় ও সামান্য একটু পরে বটুক। হেমাঙ্গ, নির্মল এল আরো পরে আর তারো পরে সলিল।

তাই শুধু মস্ত শিল্পী নয়, এক বিশিষ্ট সংস্কৃতি আন্দোলনের সার্থক নেতাও ছিল আমাদের জর্জ।

(কালান্তর', শারদীয়, ১৩৮৭)

বিজন ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে

নাট্যকার, অভিনেতা ও প্রযোজক হিসেবে বিজনের অশেষ গুণপনা আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধের মতো, তবে তার সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের অধিকারী আমি নই। গণনাট্য আন্দোলনের চার মহারথী—বিজন, বটুক, শম্ভু ও বিনয় সকলেই ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই সূত্রেই এই লেখা।

বিজনের পরের পর 'আগুন', 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' অভিনয়ের আমি শুধু প্রথম সন্ধ্যার সাক্ষী নই, আমি ঐ তিন নাটকেরই প্রথম পাঠেরও শ্রোতা। নাটক লেখা শেষ করে সে আগে সেটা পড়ে শোনাত যে ঘনিষ্ঠ মহলে আমারও স্থান বাঁধা ছিল সেখানে। তার নাটক পাঠের উপর আমি এতো জোর দিচ্ছি এ কারণে যে সে পড়ত তার প্রত্যেক কুশীলবের সঙ্গে একেবারে একাত্ম হয়ে। তার ফলে তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যেত সে কি বলতে চায় যা নিছক ছাপার অক্ষরে পড়লে হয়তো অনেকটাই আবছায়া থেকে যেতে পারত। সে দিক থেকে তার প্রত্যেকটি নাটকই, আমার মনে হয়, অভিনয়ের নাটক, শুধু একান্তে বসে মনে মনে পড়ার নাটক নয়।

অভিনয়ের ক্ষমতা ছিল বিজনের সহজাত। ৪৬ নং-এ, কার্জন পার্কের আড্ডায়, সত্যেনদার (সাংবাদিক-প্রবর, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন তার মামা) সদানন্দ রোডের বাড়ি, অরুণবাবুর (কবি অরুণ মিত্র) দোতালার ঘরটিতে, প্রায় সর্বত্রই সে আমাদের হাসাত নেতাদের কথাবার্তার ঢং ও ভাবভঙ্গীর আশ্চর্য নকল করে। তার থেকে আমরা তার বন্ধুবান্ধবেরাও অবশ্য রেহাই পেতাম না। এক দিনের কথা বলি হীরেনবাবু (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), বিজন, আমি (সম্ভবত অমল দাসগুপ্ত ও সাধনা রায়চৌধুরী এবং আরো কেউ কেউ ছিলেন) নৈহাটি না চুঁচুড়া কোথায় যেন যাচ্ছিলাম এক জনসভায় যোগ দিতে। ট্রেনে বিজন আমাদের পরের পর শোনাচ্ছিল বঙ্কিমবাবু কিভাবে বাঁ হাতের চেটোর উপর মুষ্ঠিবদ্ধ ডানহাত চাপড়িয়ে অথবা কোঁচা ঝাপটিয়ে দু'হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরে বজ্রনির্ঘোষে গর্জে ওঠেন 'শ্যামাপ্রসাদ তাঁর পিতৃপুণ্যের দোহাই পেড়ে' ইত্যাদি অথবা ভবানী-বাবুর যশুরে টানে বলেন 'যে সাঁষ দিয়া বুৎ তাড়াতি হবে সেই সাঁষর মধ্যিই

বাঁদ বুৎ থাকে' ইত্যাদি। এসব শোনার পর হীরেনবাবু একটু সভয়ে জানতে চাইলেন : 'আপনি কি আমাকেও নকল করেন না কি'? বিজন সলজ্জে জিব কেটে জানাল—না, ছি, ছি, অমন আচরণ সে ভাবতেও পারে না! আমরা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলাম : 'ও আলবৎ করে, আপনি ও পাশে গেলেই আপনাকে নকল করবে'। হীরেনবাবুর খুব কৌতূহল, আমরাও খুব চেপে ধরলাম। শেষ অবধি বিজন দেখালো বক্তৃতা পঞ্চমে ওঠার সময়ে হীরেনবাবুর ডান কাঁধটা একটু ওপরে উঠে যায় আর তারই সঙ্গে শোনালো তাঁর চোস্ত উচ্চারণ।

সে সন্ধ্যায় হীরেনবাবুর বক্তৃতা তেমন জমে নি। ফেরার সময়ে ট্রেনে ইঙ্গিতে সে-কথাটা বলতেই হীরেনবাবু চটে উঠলেন 'কি করে জমবে? বক্তৃতার সময়ে কোনো কোনো মুহূর্তে নিজেকে ছেড়ে দিতে হয়। তা ছাড়ব কি—তখনই মনে হচ্ছে ঐ-বুঝি ডান কাঁধ উঠল। এ রকম করে কি বক্তৃতা দেওয়া যায়'?

শুধু নাটক নয়, একবার তার উপন্যাস পড়ার কথাও মনে পড়ছে। আসর বসেছে অরুণবাবুর ঘরে, বিজন পড়ে শোনাচ্ছে তার সদ্য লেখা এক উপন্যাসের খসড়া। পড়ার সময়ে বাধা পড়লে বিজন স্বভাবতই চটে উঠত। উপন্যাস-পাঠের সময়ে দেখি আমার পাশে বসে অরুণবাবু নিবিষ্ট মনে কি যেন লিখছেন। আমি দেখছি দেখে অরুণবাবু একটু হেসে নিঃশব্দে এক টুকরো কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। দেখি তাতে লেখা আছে :

পৃষ্ঠব্রণ গেলে দিলে বিসর্প নির্ঘাত,
অতএব দামিনীরে সাবধান করুন
—কালিচরণের গায়ে ঐ-ভাবে হাত
আর যেন কখনও না দেন ঠাকরুন।

বিজনের নায়িকা, দামিনী তার নায়ক, কালিচরণের পিঠের ব্রণ গেলে দেবার দৃশ্যটি আমার কল্পনা করতে মোটেই ভালো লাগছিল না, এমন সময়ে অরুণ-বাবুর কবিতায় আমি একটু হেসে চিরকুটটা নিঃশব্দে চালান করলাম আমার পাশে স্বর্ণকমলবাবুর হাতে। স্বর্ণদা পড়ে ও একটু হেসে সেটি আবার দিলেন তার পার্শ্ববর্তী বন্ধুকে। আমাদের সকলের চাপা হাসাহাসি ও ফিসফিসানিতে বাধা পেয়ে বিজন চটে উঠল 'এখানে হাসির কি আছে'?' তখন অরুণবাবুর কবিতা শুনিয়ে তাকে অনেক কষ্টে ঠাণ্ডা করা গেল এই যুক্তিতে যে তার উপন্যাস নয়, অরুণবাবুর অমন সরস মন্তব্যেই আমরা হাসছি।

উপন্যাস তো লেখা হল, তারপর বিপত্তি বাধল উপন্যাসের নাম নিয়ে। বিজনের ইচ্ছে নাম দেয় 'জনপদ'। কে যেন বলল ঐ নামে তো এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের উপন্যাস আছে। তখন বিজন বলল, তা হলে হোক 'পদচিহ্ন'। আরেক জন খবর আনল, ও নামেও আর এক জনের উপন্যাস রয়েছে। তখন বিজনের সেই নামকরণের জটিল সমস্যার মীমাংসা করতে আমি সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে যেই বিজনকে বেশ বুঝিয়ে বলতে গেছি "তোমার প্রস্তাবিত দু'টি নাম— 'জনপদ' আর 'পদচিহ্ন' থেকে বোঝা যাচ্ছে যে 'পদ' শব্দটি তোমার বিশেষ পছন্দ। লেখকের পছন্দ আর নামবিভ্রাট—লেখক মনের এই বিহ্বল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপন্যাসের নাম হোক 'কি বিপদ'"—অমনি বিজন ছেলে মানুষের মতো চটে উঠেই হেসে ফেলল।

বিজনের শেষ দিককার নাটকগুলি পাঠের সময়ে আমি সব সময়ে উপস্থিত থাকতে পারি নি, তাঁতে লোকসান নিশ্চয়ই আমারই। তবে তার শেষ যে নাটক পাঠ শুনেছিলাম সেদিনকার বৃত্তান্ত দিয়ে এ-লেখা শেষ করছি। তবে তার আগে আরো কয়েকটা কথা বলা দরকার।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রখ্যাত নেতা ভবানী সেনের সঙ্গে বিজনের যোগাযোগ সেই চল্লিশের দশকের 'নবান্নের' যুগ থেকে। ষাটের দশকে ভবানীবাবু যখন আমাদের বাড়িতে থাকতেন তখন সেটা আরো পাকা ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এর পরে ভবানীবাবু যেতেন বিজনের রাজেন্দ্র রোডের বাড়িতে ঘনঘন বা নিয়মিত নয়, হঠাৎ ন মাসে ছ মাসে। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সপ্তাহ' পত্রিকায় তার এক সরস কাহিনী লিখেছেন সম্পাদক মহাশয়। বিজন নিরঞ্জনবাবুকে যথারীতি কণ্ঠ ও উচ্চারণ নকল করে শুনিয়েছিল, কাঠফাটা দুপুর রোদে ভবানীবাবু কি ভাবে রাস্তা থেকেই হাঁক দিতেন, 'বিজনবাবু, আছেন না কি'? আর দোতলার জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে তাঁকে দেখে বিজন জবাব দিত, 'এই যে, রাজা যে! তা প্রজার বাড়িতে কি মনে করে'? ভবানীবাবু হেসে বলতেন, 'রাজাই বটে! তা রাজাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন না কি'? আর এ ধরনের রসিকতা বিনিময়ের পর দোতলার সেই বিখ্যাত ঘরে ময়না, শালিখ, ঘুঘু আর কাঠবেড়ালির খাঁচার পাশে বসে চায়ের সঙ্গে দেখতে দেখতে জমে উঠত দু'জনের আড্ডা।

সে কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গ প্রায় সর্বব্যাপী—যাত্রা থিয়েটার কোথায় কেমন চলছে থেকে দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কুশীলবদের বিচিত্র প্যাঁচ কষাকষি, সর্বোপরি

বাংলার কৃষক সমাজের খুঁটিনাটি কথা। আমার বাড়িতেও বিজন মাঝে মাঝে এসেছে দেশের রাজনৈতিক ঘোরালো পরিস্থিতি বোঝার জন্য ভবানী-বাবুর সঙ্গে আলাপ করতে। আর দেখেছি তখন ভবানীবাবুও প্রবল উৎসাহী বিজনের নাটক প্রসঙ্গে।

ভবানীবাবুকে একবার আমি বললাম, 'বিজন একটা দারুণ নাটক লিখেছে—'দেবীগর্জন'। কাহিনীটা শুনেই তিনি জানতে চাইলেন 'নাটকটা একটু শোনা যায় না?' আমি বললাম, 'শুনতে হয় তো শুনুন বিজনের মুখে। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার!' ভবানীবাবু তখনই স্থির করলেন 'দেবীগর্জন' পড়া হবে বিপিন গাঙ্গুলী স্ট্রিটে—পার্টি দপ্তরে।

সে সন্ধ্যার কথা এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। বিজন সেদিনও নাটক পাঠের সময়ে যথারীতি সব ক'টি ভূমিকায় অবতীর্ণ—কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে, কখনো গান গেয়ে উঠছে, কখনো গর্জন করছে, কখনো বা গালাগাল দিচ্ছে প্রাণ ভরে। যে সব কমরেডরা নানান কাজে পার্টি দপ্তরে ঢুকছেন তাঁরা তো হতচকিত। এ-কালের যেসব কমরেডরা বিজনকে চিনতেন না তাঁরা দেখছেন একটা লোক পাগলের মত হাসছে, কাঁদছে, গান গাইছে অথচ তাই হাঁ করে শুনছেন, দেখছেন ভবানী সেন, সুরেন ধরচৌধুরীর মতো বিশিষ্ট নেতারা। পরিচয় জেনে তাঁরাও একপাশে বসছেন ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় জানার কৌতুহলে। আর বসেছেন তো একেবারে মসগুল হয়ে শুনেছেন ঝাড়া দু'ঘণ্টা ধরে। এমনি ছিল বিজনের নাটক পড়ার যাদু।

হঠাৎ শুনলে অবাক লাগে এক প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতা আর অন্য দিকে এক বেশ বড়ো মাপের শিল্পী—এই দুইয়ের মিল কোথায়? আমার মনে হয়, এদের ঘনিষ্ঠতা উভয়েরই এক ব্যাপারে আন্তরিক টানেই—বাঙলার কৃষক সমাজ। ভবানী সেন কমিউনিস্ট ও কৃষক আন্দোলনের মস্ত নেতা। তিনি ব্যাপারটাকে দেখতেন শুধু মার্কসবাদী তত্ত্বের আলোয় নয়, কৃষক আন্দোলনের জয় পরাজয়ের অজস্র অভিজ্ঞতার নিরিখেও। আর বিজনের ছিল কৃষকের আটপৌরে জীবন, তার সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, যন্ত্রণার ব্যাপারে প্রগাঢ় সহৃদয় অনুভূতি।

গ্রামের ও কৃষক জীবনের খুঁটিনাটিতে প্রবল আগ্রহ দুজনেরই, কৃষক জীবনের শোষণ বঞ্চনার দিকেই শুধু নয়, কৃষকের গ্রাম্যতা, লোভ ও কূপমণ্ডুকতার

পাশাপাশি অশেষ জীবনযন্ত্রনা সত্ত্বেও তাদের অফুরন্ত রঙ্গরস আর সর্বোপরি তাদের গৌরবমণ্ডিত নির্ভীক সংগ্রামের দিকেও।

দু'জনে অনেকটা তাই ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক, বাঙালী জীবনের বৃহত্তম সত্যের প্রতি উভয়েরই অবিচল আনুগত্যের স্বতোৎসারিত টানে।

[বিজন সম্পর্কে নানা পত্রিকায় লেখা জুড়ে জুড়ে]